মন্দ মেয়ের উপাখ্যান

প্রফুল্ল রায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ —১৩৫৭

প্রকাশক :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

তৃতীয় খণ্ড

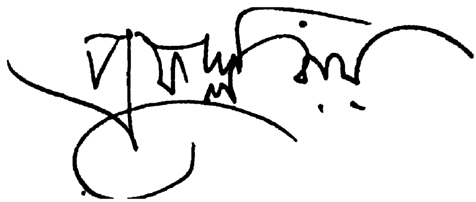
মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

হিরণ্ময় কার্লেকর
সহৃদয়েষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

দুই দিগন্ত
উত্তরার উপাখ্যান
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
বিন্দুমাত্র
আলোয় ফেরা
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
আকাশের নীচে মানুষ
দায়বদ্ধ
শ্রেষ্ঠ গল্প
চতুর্দিক
আমাকে দেখুন
(১ম ২য় ৩য় ৪র্থ পর্ব)
আমাকে দেখুন অখণ্ড সংস্করণ
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
নোনা জল মিঠে মাটি
বাঘবন্দী
স্বর্গের ছবি
সম্পর্ক
জন্মভূমি
শীর্ষবিন্দু
সুখের পাখি অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
আক্রমণ
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
এক নায়িকার উপাখ্যান
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া
(১ম ২য় পর্ব)
একাকী অরণ্যে
সিন্ধুপারের পাখি
যুদ্ধযাত্রা
স্বনির্বাচিত গল্প
শান্তিপর্ব
সাধ আহ্লাদ
হীরের টুকরো
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে

বারবনিতাদের নিয়ে আমি বেশ কিছু গল্প এবং উপন্যাস লিখেছি। সুখী ভদ্র গৃহস্থ মানুষের পৃথিবী থেকে বহুদূরে নরকের খাসতালুকে পড়ে-থাকা এই সব মেয়ের মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি, বরং কোনো কোনো মুহূর্তে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তার অসামান্য স্ফুরণ ঘটে আমি তারই সন্ধান করেছি। পাঁকে মুখ গুঁজে থাকলেও সেই মুহূর্তগুলোতে মনে হয় এরা একেকজন মহিমান্বিত নারী, শ্রদ্ধার বিস্ময়ে তখন মন আপ্লুত হয়ে যায়। আমার এ জাতীয় রচনা থেকে কয়েকটি গল্প এবং একটি উপন্যাস বেছে নিয়ে 'মন্দমেয়ের উপাখ্যান'-এ সংকলিত হয়েছে। আশা করি এই কাহিনীমালা পাঠকদের ভাল লাগবে।







রাজপুত

নাজিমপুরা 'টৌন' বা টাউনের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় মেয়েপাড়া। এ অঞ্চলের লোকজন প্রবল ঘৃণায় নাক সিঁটকে বলে 'রেণ্ডিটুলি'। দুনিয়ার সবচেয়ে ওঁচা পঁচিশটি মেয়েমানুষের এই হতচ্ছাড়া কলোনির চেহারাটা এরকম। একটা চৌকো চবুতরের তিন দিক ঘিরে ভাঙাচোরা পুরনো টালির চালের মোট ছাব্বিশটি ঘর। মাথা পিছু একটা করে পঁচিশজনের পঁচিশটা, বাকি ঘরটা মেয়েপাড়ার মালকিন চম্পার। ফুলের নামে যার নাম তার ধাতটা ফুলের মতোই মোলায়েম হবে, এটা যদি কেউ ভেবে থাকে তবে তা নেহাতই দুরাশা। অতি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ চম্পা। তার দাপটে পঁচিশটি মেয়ের কারও পান থেকে চুন খসার জো নেই।

চবুতরের যে দিকটায় ঘরটর নেই সেখানে নোনাধরা নিচু পাঁচিলের গায়ে ঘুণে-কাটা সদর দরজা। সেটার পাশে ক'টা খাটা পায়খানা, চানের জন্য ঘেরা জায়গা, আর একটা মস্ত কুয়ো। মেয়েপাড়ার লাগোয়া যে হেলে-পড়া টিনের চালাটা কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে সেটারও মালকিন চম্পা। ওখানে থাকে হীরালাল আর তার ঘোড়া মোতিয়া। এ জন্য ফি মাসে হীরালালকে নগদ চল্লিশটা করে টাকা ভাড়া গুনতে হয়। মেয়েপাড়ার পঁচিশটি বাসিন্দার মতো হীরালালও চম্পার খাসতালুকের একজন।

সময়টা ফাল্গুনের মাঝামাঝি।

এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। দিগন্তের তলা থেকে সূর্য সবে মাথা তুলতে শুরু করেছে। ষষ্ঠ ঋতুর নরম সোনালি আলোয় ভরে যাচ্ছে চারদিক। আশপাশের গাছপালার মাথায় রাজ্যের পাখিরা খাদ্যের সন্ধানে ঝাঁক বেঁধে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাদের একটানা কিচিরমিচির আর পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ সকালের ঝিরঝিরে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এই সময় ঘুমটা ভেঙে যায় হীরালালের। অন্যদিন জেগে ওঠার পরও বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে সে। জীবনে এটুকুই তার একমাত্র বিলাসিতা। কিন্তু আজ আর শুয়ে থাকার উপায় নেই। দশটার ভেতর এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে পাহাড়ের যে রেঞ্জটা রয়েছে সেখানে ঘোড়া অর্থাৎ মোতিয়াকে নিয়ে তার পৌঁছতেই হবে। বোম্বাই থেকে একটা সিনেমা কোম্পানি এসেছে। তার লোকজনেরা হীরালাল এবং মোতিয়ার জন্য পাহাড়ের তলায় অপেক্ষা করবে। ওরা

কাল বার বার বলে দিয়েছে, হীরালালরা গেলে তবেই ওদের তসবির খিঁচা (শুটিং) শুরু হবে। নইলে সব বরবাদ।

অগত্যা ধড়মড় করে উঠে পড়ে হীরালাল। তেলচিটে বিছানাটা গুটিয়ে, দলা পাকিয়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে হাই তুলতে তুলতে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ঘরের সঙ্গে সরু বারান্দা, টিনের চাল তার মাথা পর্যন্ত টানা। বারান্দার তলায় খানিকটা পাকা জায়গা। সেখানে কাঠের খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে মোতিয়া। হীরালালকে দেখে প্রাণীটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সমানে মাটিতে পা ঠুকতে থাকে। তার গলার ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা মিহি আওয়াজ বেরিয়ে আসে—চিঁহিহি, চিঁহিহি। মালিককে দেখে সে যে বেজায় খুশি এটা তারই প্রকাশ।

হীরালালের চটকা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সমানে হাই উঠছিল তার। মুখের কাছে ডান হাতটা এনে তুড়ি দিতে দিতে জড়ানো গলায় বলে, 'থোড়া সবুর, আসছি—' সকালে খানিকক্ষণ আদর না করলে মোতিয়ার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেটা হীরালালের ভালই জানা আছে।

এ বাড়িতে জলের ব্যবস্থা নেই। মেয়েপাড়ার কুয়োটাই হীরালালের ভরসা। তার এবং মোতিয়ার নাহানা, রান্না, খাওয়া, কাপড় কাচা—সবই ওটার জলে সারতে হয়। কাল রাতে তিনটে প্লাস্টিকের বড় বালতি ভর্তি করে দাওয়ার কোণে রেখে দিয়েছিল। এখন সোজা সেদিকেই চলে যায়। দ্রুত চোখেমুখে জল দিয়ে নেমে আসে মোতিয়ার কাছে। তার পিঠে, গলায়, কানে, কপালে কখনও হাত বুলোতে বুলোতে, কখনও সুড়সুড়ি দিতে দিতে সমানে বকে যায়, 'আরে উল্লু, আরে পাঠ্ঠে, আরে গাধ্ধে—সুবে উঠে তোমাকে তোয়াজ করা ছাড়া আমার দুসরা কামকাজ কিছু নেই? শালে নবাবকা ছৌয়া—' এটাই তার আদর করার নিজস্ব পদ্ধতি।

একটি মানুষ আর একটি প্রাণী, দু'জনেই পরস্পরের ভাষা বোঝে। আরামে সুখে দুই চোখ বুজে আসে আসে মোতিয়ার, ল্যাজ ঘন ঘন নড়তে থাকে। তার গলার চিঁহিহি আওয়াজটা আরও গাঢ়, আরও দীর্ঘ হয়।

হীরালাল থামে না, 'আজ অ্যায়সা খেল দেখাতে হবে যেন সিনেমাবালাদের শিরপে চক্কর লেগে যায়। সমঝা?'

মোতিয়া বলে, 'চিঁহিহি—' অর্থাৎ বিলকুল সমঝেছে।

'দুনিয়ার সব আদমি সিনেমায় তোর তসবির দেখবে। সেটা মনে রাখবি।'

'চিঁহিহি—'

এইভাবে তাদের বিচিত্র কথোপকথন চলে কিছুক্ষণ। বোঝা যায় আজকের শুটিংয়ের ব্যাপারে তারা ভীষণ উত্তেজিত।

এবার ওদের দিকে একটু ভাল করে তাকানো যাক। হীরালাল আর মোতিয়ার

নামের মধ্যে হীরামোতির যতই ঝলকানি থাক, আসলে তারা গরিবের চাইতেও গরিব। হীরালালের বয়স ত্রিশ বত্রিশ। নাকমুখ বেশ ধারালো কিন্তু সে খুবই রোগা, সারা গায়ে অপুষ্টির ছাপ। দু বেলা বারো মাস ভরপেট খেতে পেলে সে যে একটি টগবগে সুপুরুষ হয়ে উঠত, সেটা তাকে দেখামাত্র আন্দাজ করা যায়।

নিজে খেতে পাক আর না-ই পাক, মোতিয়ার দানাপানি কিন্তু ঠিকই জুগিয়ে যায় হীরালাল। প্রাণীটাকে খুবই যত্ন করে সে। ফলে চেহারায় রুগ্‌ণতার চিহ্ন নেই। সাদা আর বাদামিতে মেশানো মোতিয়ার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মসৃণ গা থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ে।

দুনিয়ায় পার্থিব সম্পত্তি বলতে খানকতক কুর্তা, পা-চাপা খেলো কাপড়ের চুস্ত এবং এই ঘোড়াটা ছাড়া আর কিছুই নেই হীরালালের। জীবনে তার একটাই স্বপ্ন, একখানা জমকালো ফিটন গাড়ির মালিক হওয়া। সে জন্য খেয়ে, না খেয়ে টাকা জমিয়ে যাচ্ছিল। বছরখানেক আগে নাজিমপুরার এক বুড়ো কোচোয়ান ফকিরার কাছ থেকে ঝোঁকের মাথায় তিন শ টাকায় মোতিয়াকে কিনে নেয় সে। তখন প্রাণীটার হাল খুবই খারাপ। দিনরাত ধুঁকত, পাঁজরার হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, পাঁচটা দিনও টিকে থাকবে কি না তেমন ভরসা আদৌ ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হীরালালের যত্নে আর তোয়াজে বেঁচেই গেল না মোতিয়া, তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠল।

ঘোড়াই শুধু কিনতে পেরেছে হীরালা কিন্তু ফিটনের গাড়িটা কেনার মতো পয়সা এখনও জমিয়ে উঠতে পারেনি। সেদিক থেকে তার স্বপ্ন আধাআধি সফল। মোতিয়া তাজা হয়ে ওঠার পর ইদানীং মাসকয়েক বিয়ে বা তৌহর অর্থাৎ পরবের মরসুমে তাকে ভাড়া খাটাচ্ছে হীরালাল। ওটার পিঠে চড়ে নাজিমপুরা এবং আশেপাশের ছোটখাটো সব শহরের মারোয়াড়ি আর রাজপুত দুলহারা বিয়ে করতে শ্বশুরবাড়ি যায়। তৌহরের সময় ফুলের ছত্রি দিয়ে সাজানো হয় মোতিয়াকে। সেই ছত্রির তলায় রামসীতা বা অন্য দেবদেবীর মূরত বসিয়ে জুলুস বার করা হয়। তা ছাড়া এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে যে পাহাড়ের রেঞ্জ এবং নদী রয়েছে সেখানে কলকাতা আর বোম্বাই থেকে আজকাল প্রায়ই সিনেমাওলারা শুটিং করতে আসছে। তাদের অনেকেরই ঘোড়ার দরকার হয়, তখন হীরালাল আর মোতিয়ার ডাক পড়ে। যেমন আজও পড়েছে। মোতিয়া অকৃতজ্ঞ জানোয়ার নয়, সে নিজের জন্য তো বটেই, সেই সঙ্গে হীরালালের পেটের দানাও জোগাড় করে চলেছে। কিন্তু বিয়ে, তৌহর বা সিনেমা বছরে আর ক'দিন? বাকি সময়টা বড়ই কষ্টেসৃষ্টে কাটে হীরালালদের। মোতিয়াকে ভাড়া খাটানোর আগে পর্যন্ত নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে পেট চালাত হীরালাল। কখনও ঠিকাদারদের কাছে কাজ জুটিয়ে পাথর ভাঙত, রাস্তা বানাত, কখনও বা ধানচালের আড়তে গিয়ে মাল বইত।

তার পদবিসুদ্ধ পুরো নাম হীরালাল সিং। সে রাজপুত ক্ষত্রিয়। কিন্তু তার রক্তে পূর্বপুরুষের ক্ষাত্রতেজ এতটুকু অবশিষ্ট নেই। সে ভীরু, দুর্বল। তার ওপর এক জঘন্য বেশ্যার চালা ভাড়া নিয়ে থাকে। রাজপুত জাতির সে ঘোর কলঙ্ক। নাজিমপুরা শহরে যে রাজপুতেরা আছে, লজ্জায় ভয়ে এবং কুণ্ঠায় তাদের কাছে তার নিজের পরিচয় দেয় না হীরালাল। ওরা জানতে পারলে তার মুখে তিন বার থুক দেবে। জগৎ সংসারে কেউ নেই তার, একা একা শহরের এই কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে সে।

বেশি আদরের আশায় মোতিয়া মুখটা হীরালালের দিকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

এদিকে আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্য বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছিল। রোদের তেজ এর মধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। হীরালাল আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে, 'আর তোয়াজ করতে পারব না। বেলা চড়ে গেছে। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। তার আগে অনেক কাজ বাকি। দু'জনে খাব, তোকে সাজাব। তারপর—'

হীরালালের কথা শেষ হওয়ায় আগেই চম্পার বাজখাঁই গলা ভেসে আসে, 'আউর কেত্তে দের করনা—আঁ? জলদি নিকালনা। এরপর বেরুলে মন্দিরের সামনে আমাদের ঘেঁষতে দেবে।'

চম্পার গলাটাই ওরকম, সবসময় সাত পর্দা চড়েই আছে। ঝগড়ার সময় তার ঝাঁঝ আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তখন এ অঞ্চলের একটি কাক-চিলেরও টিকি চোখে পড়ে না, সব ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উধাও হয়ে যায়।

হীরালাল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মেয়েপাড়ার প্রায় সমস্তটাই চোখে পড়ে। দেখা গেল, ওখানকার চবুতরে সবগুলো মেয়েমানুষ জড়ো হয়েছে। তাদের বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে। শীতগ্রীষ্ম বারো মাস একটানা রাতজাগা আর আওরতটুলিতে অন্তহীন নরকবাসের যাবতীয় ছাপ পড়েছে মেয়েগুলোর চোখেমুখে। ওদের ভাঙাচোরা শরীরে শুধুই ক্ষয়ের চিহ্ন।

এই সকালবেলাতেই মেয়েমানুষগুলো নাহানা চুকিয়ে ফেলেছে। সবার পরনে পরিষ্কার কাচা শাড়ি, পিঠময় ভেজা চুল ছড়ানো। সব মিলিয়ে একটু শুধ্ শুধ্ (পবিত্র) আবহাওয়া।

অন্য দিন এ দৃশ্য কখনও দেখা যায় না। নাহানা দূরের কথা, বেলা অনেকটা না চড়লে ওখানে কারও ঘুমই ভাঙে না। কিন্তু হীরালাল জানে, আজকের দিনটা একেবারেই আলাদা।

মেয়েমানুষের জটলাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল চেহারার চম্পা। তার হাত-পা থামের মতো। গায়ের কুচকুচে কালো চামড়ায় এমন জেল্লা, মনে হয় পালিশ

করা। মেয়েমানুষটার সারা গা জুড়ে চাঁদির জবড়জং গয়না। চম্পার পাশে রয়েছে বিলাখী—ঢ্যাঙা, হাড়-বার-করা মুখ, চোখের তলায় তিন পোঁচ ভুষো কালি। তার বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। বিলাখীর পর কুন্তা। কুন্তা বিলাখীর মেয়ে।

কুন্তার বয়স আঠারো উনিশ। নরকের এই খাসতালুকে জন্মের পর এতগুলো বছর কাটালেও তার চেহারা ভারি নিষ্পাপ। বড় বড় চোখ দুটিতে সারল্য মাখানো। কুন্তার ডিম্বাকৃতি মুখ, কোমর-ছাপানো চুল, নিটোল চিবুক, সাজানো মোতির মতো দাঁতের সারি, পাকা গেঁহুর মতো গায়ের রং। ওর দিকে তাকালে চোখে পলক পড়ে না।

কুন্তার পরনে নতুন রঙিন শাড়ি, হাতে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের রেকাবিতে আস্ত ক'টি ফল, তেল, মেটে সিঁদুর, আতপ চাল, পেতলের প্রদীপ।

পাশাপাশি থাকার কারণে মেয়েপাড়ার নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে হীরালাল। সে জানে এতটা বয়স পর্যন্ত কুন্তাকে দু হাতে যখের ধনের মতো আগলে আগলে রেখেছে বিলাখী। কিন্তু গিধের পাল যেখানে দিনরাত নখ আর দাঁত শানিয়ে মেয়েদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য হানা দেয় সেখানে তার পক্ষে খুব বেশিদিন কুন্তাকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব হত না, যদি না কয়েক বছর আগে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ঠিকাদার ধনেশ্বর চৌবের চোখ তার ওপর এসে পড়ত। শুধু ঠিকাদারই নয়, লোকটা স্বনামে বেনামে চার শ একর জমির মালিক। অঢেল পয়সা তার, প্রচুর বন্দুকবাজ আর পহেলবান পোষে সে। তার দাপটে গোটা নাজিমপুরা সর্বক্ষণ তটস্থ।

চৌবে অর্থাৎ চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হলেও ধনেশ্বরের নজর বড় নিচু। বেশ্যাই হোক আর অচ্ছুতই হোক, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই সে তাকে রাখনি বা রক্ষিতা করে রাখে। কুন্তাকে দেখার পর এক বন্দুকবাজ পাঠিয়ে বিলাখীকে জানিয়ে দিয়েছিল, মেয়েটা যুবতী হয়ে উঠলে সে তাকে নিয়ে যাবে। হুঁশিয়ার, অন্য কোনও হারামজাদকা ছৌয়া যেন কুন্তার কাছে না ঘেঁষে। মুহূর্তে খবরটা চারদিকে চাউর হয়ে যায়। ধনেশ্বর চৌবে যাকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে মার্কা মেরে দিয়েছে তার দিকে হাত বাড়াবার মতো বুকের পাটা কারও নেই। যে লুচ্চার দল এখানে আসে তারা কুন্তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

কুন্তা কবে পুরোপুরি যুবতী হয়ে ওঠে, সে জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে গেছে ধনেশ্বর। পরশু সে খবর দিয়েছে আজ বিকেলে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে কুন্তাকে নিয়ে যাবে। তার জন্য নতুন একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে দামি দামি আসবাবে সাজিয়ে রেখেছে।

এই বেশ্যাপাড়ার মেয়েদের নিজস্ব কিছু রীতিনীতি আছে। পেশাদার জীবন শুরু করার আগে সবাই মিলে রামসীতা মন্দিরে পুজো দিয়ে আসে। কুন্তার জন্য আজ

তারই তোড়জোড় চলছে।

কিন্তু হীরালাল জানে, মেয়েপাড়ার জীবনযাপন পদ্ধতি একেবারেই পছন্দ নয় কুন্তার। বাপের বয়সী ধনেশ্বর চৌবের রাখনি হয়ে থাকতে তার ঘোর আপত্তি। এই কদর্য গ্লানিকর পরিবেশ থেকে সে মুক্তি চায় কিন্তু কিভাবে তা জানে না।

মায়ের কাছে প্রচুর কান্নাকাটি করেছে কুন্তা, কতদিন না খেয়ে থেকেছে। বিলাখী বুঝিয়েছে, এটাই তাদের নিয়তি। তবু তো অন্য মেয়েদের মতো শিয়াল-শকুনেরা ঝাঁক বেঁধে তাকে ছিঁড়ে খাবে না। একটি পয়সাওলা ক্ষমতাবান লোকের কাছেই সারা জীবন অঢেল আরামে এবং সুখে প্রায় বিয়াহী আওরতের (বিয়ে করা স্ত্রী) মতো থাকতে পারবে। তেমন সৌভাগ্য এ পাড়ায় ক'টি মেয়েমানুষের হয়? বোঝানোতে কতটা ফল হয়েছে কে জানে, তবে কান্নাটা থেমেছে কুন্তার।

একটা ব্যাপার মনে পড়ছে হীরালালের । এতদিন যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকত দেওয়ালের ওপার থেকে কুন্তা পলকহীন তাকে দেখত। জল আনতে মেয়েপাড়ায় গেলে কিছু একটা বলতে চাইত কিন্তু বিলাখীর পাহারাদারি এমনই কড়া যে তার নজর এড়িয়ে কোনও দিনই বলতে পারেনি।

কুন্তাকে দেখতে দেখতে মন যখন ভারি হয়ে ওঠে, সেই সময় চম্পার গলা আবার শোনা যায়। কণ্ঠস্বর আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে সে তাড়া লাগায়, 'আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি? সুরয কোথায় উঠে এসেছে, হুঁশ আছে তোদের?'

এদিকে আদর থেমে যাওয়ায় মোতিয়াও চেঁচিয়ে ওঠে, 'চিঁহিহি—চিঁহিহি—'

পরের দুঃখে কাতর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো পর্যাপ্ত সময় হীরালালের নেই। তাকেও খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। মোতিয়ার মাথায় আলতো দুটো চাপড় মেরে বলে, 'থোড়ে ঠহ্‌র যা। বহোত দূর যানে হোগা। দু'জনে কিছু খেয়ে নিই, কি বলিস?'

সমঝদারের মতো ঘাড় কাত করে মোতিয়া বলে, 'চিঁহিহি—চিঁহিহি—'

ঘরে ঢুকে কৌটোবাটা ঝোলাঝুলি হাতড়ে তার বা মোতিয়ার জন্য একদানা খাদ্যও খুঁজে পায় না হীরালাল। মজুত খাবারদাবার কখন শেষ হয়ে গেছে, তার খেয়াল ছিল না। এক পলক ভাবে সে। না, এতটা পথ পেটে ভুখ নিয়ে হাঁটা যাবে না। দ্রুত ক'টা টাকা পকেটে পুরে বেরিয়ে আসে। মোতিয়ার উদ্দেশে বলে, 'কুছ চানাউনা খরিদ করে আনি। পন্দ্র বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব।'

মেয়েপাড়ার পাশ দিয়ে খোয়া-ওঠা একটা বড় রাস্তা. শিরদাঁড়ার মতো খাড়া উত্তরে চলে গেছে। তার দু ধারে করাত কল, সুরকি কল, আটা চাক্কি, ধানকল, লেদ মেশিনের কারখানা, কাঠগোলা, ধানচালের বিরাট বিরাট আড়ত। এ সব পেরিয়ে গেলে গমগমে বাজার,বাজারের পর শ্বেতপাথরের তৈরি বিশাল রামসীতা মন্দির।

মন্দিরের পর থেকে নাজিমপুরার পয়সাওলা লোকেদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব বাড়ি। এই পাড়াটা উত্তর দিকে যেখানে শেষ হয়েছে তারপর মাইল দেড়েক পাথুরে জমির পর চমৎকার একটা নদী, নদীর পর উঁচু পাহাড়ের লম্বা রেঞ্জ। ওখানেই সিনেমাওলারা শুটিং করতে আসে।

উত্তর বিহারের এই শহরে এর মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে ধর্মের ষাঁড় টহল দিতে শুরু করেছে। প্রচুর লোকজন, বয়েল গাড়ি আর সাইকেল রিকশাও বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু কোনও দিকে লক্ষ্য নেই হীরালালের। লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা চলে আসে বাজারে। মোতিয়ার জন্য আস্ত চানা, আর নিজের জন্য চানার ছাতু কিনে যখন সে ফিরে যাচ্ছে সেই সময় রাস্তায় মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কুন্তাকে মাঝখানে রেখে পঁচিশটি মেয়েমানুষ মিছিল করে রামসীতা মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে। সবার আগে আগে রয়েছে চম্পা।

কাছাকাছি আসতে বিষণ্ণ চোখে হীরালালের দিকে একবার তাকায় কুন্তা। তাকাতে তাকাতেই সঙ্গিনীদের সঙ্গে পা ফেলতে থাকে।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় হীরালাল। বুকের ভেতর কোথায় যেন চিনচিনে কষ্ট অনুভব করে। পরক্ষণে আগের মতোই জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। সিনেমাওলারা তার এবং তার ঘোড়ার সারাদিনের মজুরি নগদ চারশো টাকা দেবে। এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারও জন্য মন খারাপ করার মতো সৌখিনতা তার মতো মানুষের মানায় না।

চালায় ফিরে এসে মোতিয়াকে খাইয়ে হীরালাল নিজেও গোগ্রাসে খাওয়া চুকিয়ে নেয়। খানিক আগে কুন্তার জন্য কিছুটা মুষড়ে পড়লেও চারশো টাকার ভাবনাটা তাকে রীতিমত চনমনে করে তোলে।

চনমনে হওয়ার অন্য কারণও রয়েছে। আজ সিনেমার যে শুটিং হবে তাতে হিরো মোতিয়ার পিঠে চড়ে ভিলেনদের টিট করতে যাবে। কিন্তু বোম্বাইয়ের যে হিরোটি এসেছে সে ঘোড়ায় চড়তে পারে না। তার মতো সাজপোশাক পরে বন্দুক হাতে হীরালালকেই ঘোড়া দাবড়ে দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে যেতে হবে। এমনভাবে নাকি তসবির তোলা হবে, সিনেমার পর্দায় তাকে চেনাই যাবে না, বিলকুল হিরোর মতো মনে হবে। মোতিয়াকে তাই সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে সিনেমাওলারা। অবশ্য সাজসজ্জা পছন্দ না হলে ওরাই তার ব্যবস্থা করবে।

দু টাকা পাঁচ টাকা করে জমিয়ে মোতিয়ার জন্য রেকাব, জিন, গলায় ঝোলাবার পেতলের ঘুন্টি ইত্যাদি কিনেছিল হীরালাল। ঘর থেকে সেগুলো বার করে এনে তাকে সাজাতে সাজাতে বলে, 'আজ বহোত বড়িয়া দিন। আমি হিরো বনব, তু ভি। সমঝা—' তার পলকা দুর্বল শরীরে প্রবল উত্তেজনা চারিয়ে যাচ্ছিল।

ঘোড়া সাজানো হলে আবার চালার ভেতর ঢোকে হীরালাল। পুরনো টিনের বাক্স খুলে বহুকাল আগের কেনা নকশা-করা রেশমি কুর্তা আর সিল্কের চুস্ত বার করে, সেগুলো অবশ্য অনেক জায়গায় পিঁজে পিঁজে গেছে। কিন্তু কী আর করা যাবে, এর চেয়ে দামি পোশাক তার আর নেই। সুসজ্জিত মোতিয়ার পিঠে কি আর ছেঁড়া পাজামা টাজামা পরে চড়া যায়?

এবার ঘরের দরজায় শেকল তুলে মোতিয়াকে নিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে আসে হীরালাল। যদিও রোগা এবং দুর্বল, ঘোড়ায় চড়াটা সে অনেক আগেই শিখেছিল। রেকাবে পা রেখে এক লাফে মোতিয়ার পিঠে উঠে পড়ে। রাস্তা বরাবর উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে একবার আকাশের দিকে তাকায়। সূর্য আরও খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে, রোদের ঝাঁঝও বেড়েছে, তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ঠিক সময়েই পাহাড়ের তলায় পৌঁছনো যাবে।

চলতে চলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায় হীরালাল। চোখের সামনে কুন্তার ভয়ার্ত মুখ আবার ফুটে ওঠে। কিন্তু সে ভীরু, গরিবের চাইতেও গরিব, কমজোর, কী-ই বা সে করতে পারে?

রাস্তায় চেনাজানা যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, মজার গলায় বলে, 'কা রে হীরোয়া, এত্তে জগমগ চুস্ত-কুর্তা চড়িয়ে ফিলমকা হিরো বননে চললি নাকি?'

কেউ বলে, 'বোম্বাইসে যো হিরো-ইন আয়ী, উসিকো মাত ছোড়না। ঘোড়ায় তুলে ভাগিয়ে আনবি, তবে বুঝব তুই রাজপুতকা ছৌয়া।'

এই নগণ্য ছোট্ট শহরের প্রায় সবাই হীরালালের খবরাখবর রাখে। সে এখন কোথায়, কী উদ্দেশ্য চলেছে সে সব তথ্য তাদের জানা। হীরালাল ওদের ঠাট্টা টাট্টার জবাবে অস্পষ্টভাবে হুঁ হাঁ করে যায়।

আরও কিছুটা এগোতে রামসীতা মন্দিরের দিক থেকে প্রচণ্ড হইচই শোনা যায়। চমকে সামনে তাকাতে হীরালালের চোখে পড়ে মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে উত্তর দিকে ছুটছে। সবাইকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ওদের মধ্যে কুন্তা, চম্পা, বিলাখী এবং আরও ক'টি মেয়েমানুষকে দেখা গেল না।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে ওদের কাছাকাছি চলে আসে হীরালাল। এতগুলো মেয়েমানুষের এ জাতীয় চেঁচামেচির সঠিক কারণটা বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। যারা শুদ্ধ মনে রামসীতা মন্দিরে মিছিল করে পুজো দিতে এসেছিল, হঠাৎ কী এমন অঘটন ঘটল যাতে তারা এমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে?

উদ্বিগ্ন মুখে হীরালাল জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে মৌসিরা, তোমরা এমন ছুটছ কেন?' মেয়েপাড়ার সবাইকে সে মাসি ডাকে।

মেয়েমানুষগুলো সমস্বরে উত্তর দেয়, 'কুন্তা ভাগ গয়ী—'উত্তর দিকে আঙুল

বাড়িয়ে দেয় তারা, 'উঁহা—উধর—'

কিছুক্ষণ আগে ছাতুটাতু কিনতে এসে কুন্তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু এমন একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড যে এই মেয়েটা ঘটাতে পারে তখন তার এতটুকু আঁচ পাওয়া যায়নি। মেয়েমানুষগুলোর উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা হঠাৎ তার মধ্যেও যেন চারিয়ে যায়। হীরালাল কাঁপা গলায় জানতে চায়, 'কী করে ভাগল?'

জাঁন্‌কী নামের একটি মেয়েমানুষ বলে, 'মন্দিরের ভেতর তো আমাদের ঢুকতে দেয় না। পুজোর জিনিসগুলো যে থালায় ছিল, বাইরে সড়কের ওপর সেটা নামিয়ে রেখে আচানক দৌড়ুতে শুরু করে কুন্তা। আমরা থ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সবাই ওর পিছা ধাওয়া করলাম। চম্পা মৌসি, বিলাখী, আরও দো-চার আওরত সামনে এগিয়ে গেছে।'

আরেকটি মেয়েমানুষ যার নাম ছিবলি, বলে, 'তোর ঘোড়াকে তুরন্ত হাঁকিয়ে দে। দ্যাখ, ছোকরিকে ধরতে পারিস কিনা—'

ঘোড়া ছোটাতে গিয়েও জরুরি কথাটা মনে পড়ে যায় হীরালালের। বলে, 'কুন্তা ভাগল কেন?'

ছিবলি নাকমুখ কুঁচকে কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে। তোড়ে কিছুক্ষণ খিস্তিখেউড় চালাবার পর বলে, 'রেণ্ডির বেটি সীতা বনবে, সাবিত্তিরি বনবে! এত্তে বড়ে আদমী ধনেশ্বরজি, বরাম্ভণ (ব্রাহ্মণ)—কোথায় তার প্যারা রাখনি হয়ে আরামে থাকবে, তা ওর মনে ধরল না, তাই ভেগেছে। যা হীরা, যা। দ্যাখ ওকে ধরতে পারিস কিনা। ওই ভূচ্চরের ছৌরীটাকে না পেলে ধনেশ্বরজি ভাববে আমরাই ফন্দি করে ওকে সরিয়ে দিয়েছি। তখন আমাদের টৌলির কাউকে আর জানে বাঁচতে হবে না।'

কুন্তা পালিয়েছে জেনে একটু যেন আরামই বোধ করছিল হীরালাল কিন্তু যেই মনে হল ধনেশ্বর চৌবে এই খবরটা পাওয়ামাত্র তার পোষা পহেলবান আর বন্দুকবাজদের মেয়েটার পেছনে লেলিয়ে দেবে, তখনই চিনচিনে ব্যথার মতো একটা কষ্ট বুকের ভেতর ফিরে আসে। কিন্তু আর দাঁড়ালে চলবে না। কুন্তার জন্য নয়, সিনেমাওলাদের জন্য এখনই ঘোড়া হাঁকানো দরকার।

মোতিয়ার পেটের দু ধারে গোড়ালির আলতো একটু গুঁতো দিতেই সেটা নতুন উদ্যমে দৌড় শুরু করে দেয়।

বাজার আর রামসীতা মন্দিরে পেছনে ফেলে নাজিমপুরার পয়সাওলা মানুষদের এলাকাটা আধাআধি পেরুবার পর চোখে পড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে চিৎকার করে কী বলতে বলতে ছুটে চলেছে বিলাখী, তার পেছনে চম্পা এবং আরও তিন চারটে মেয়েমানুষ।

বিলাখীর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে না পেলেও সে যে নিজের মেয়ের উদ্দেশে

একনাগাড়ে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না হীরালালের। তাকে দেখতে পেয়ে গলার স্বর চড়িয়ে কী যেন বলল বিলাখী, কিন্তু মোতিয়া এমন উল্কা গতিতে ছুটছে যে তার নামটা ছাড়া আর কিছুই কান পর্যন্ত পৌঁছল না। তবে কুন্তাকে খুঁজে দেবার জন্য যে কাকুতি মিনতি করেছে সেটা আন্দাজ করা গেল।

এক সময় নাজিরপুরার চৌহদ্দি পার হয়ে একটা পাথুরে রাস্তায় চলে আসে হীরালাল। রাস্তাটা উঁচু হতে হতে দূরের পাহাড়ি রেঞ্জটার দিকে চলে গেছে। তার একধারে দেওদার, কড়াইয়া আর শিশুগাছের লাইন। আরেক ধারে পাহাড়ি নদী। নদীটা দূরের রেঞ্জ থেকে নেমে এসে নানা আকারের নানা রঙের পাথর আর নুড়ির ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে। নদীটির পায়ে যেন কয়েক জোড়া অদৃশ্য ঘুঙুর বাঁধা। আবহমান কাল ধরে একটানা ঝুম ঝুম আওয়াজ করে চলেছে। তার ওপারে সবুজ কার্পেটের মতো বহুদূর জুড়ে ঘাস, মাঝে মাঝে ক্যাকটাস আর উঁচু উঁচু সব গাছ যা এই পৃথিবীর চোখজুড়ানো অলঙ্কারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের মাথা থেকে এতটা দূর পর্যন্ত জায়গায় নানা স্পট বেছে নিয়ে সিনেমাওলারা শুটিং করে থাকে।

পাথুরে রাস্তা দিযে খানিকটা এগোবার পর পাহাড়ের তলায় অনেকগুলো তাঁবু চোখে পড়ে। এখান থেকে সেগুলোকে ছোট ছোট ফুটকির মতো দেখায়। ওখানেই সিনেমাওলারা ক্যাম্প করেছে। যতদিন শুটিং চলবে, হিরো-হিরোইন-ভিলেন সুদ্ধু সমস্ত ইউনিট তাঁবুতেই থাকবে।

আরও কিছুটা যাবার পর আচমকা একটা ভীরু গলা ভেসে আসে, 'ঘোড়া রুখো, ঘোড়া রুখো—'

হীরালাল ভীষণ চমকে ওঠে। জায়গাটা একেবারে নিঝুম। কোথাও কেউ নেই। অনেক উঁচুতে আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক'টা চিল বাতাসে ডানা ভাসিয়ে রেখেছে। নদীর ঝুম ঝুম শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। ওটা বাদ দিলে সব কিছুই যেন অতল নৈঃশব্দের আরকে ডুবে আছে। এখানে কে ডাকতে পারে তাকে?

চারপাশে তাকাতে তাকাতে চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে যায় হীরালালের। রাস্তার ডান ধারে যে কড়াইয়া গাছগুলো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে তার আড়াল থেকে যে বেরিয়ে আসে তাকে এখানে দেখবে এটা ছিল একেবারেই অভাবনীয়। বিমূঢ়ের মতো হীরালাল বলে, 'কুন্তা, তুমি!'

কুন্তা ঝাপসা গলায় বলে, 'হাঁ। আমি—আমি—'

ঘোড়া থামিয়ে দিল হীরালাল। সে লক্ষ করে মেয়েটার দুই ঠোঁট ভীষণ কাঁপছে। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড ভয় আর দুশ্চিন্তার ছাপ।

হীরালাল কী বলবে যখন ভেবে পাচ্ছে না, কুন্তা ফের বলে ওঠে, 'আমি পালিয়ে

এসেছি।'

'জানি। তোমার মা আর চম্পা মৌসিরা তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে।'

'করুক। তুমি এই সড়ক ধরে সিনেমাবালাদের কাছে যাবে, তাই কড়াইয়া গাছগুলোর ভেতর লুকিয়ে ছিলাম। আমাকে বাঁচাও—'

হীরালালের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা খেলে যায়। দিশেহারার মতো সে বলে, 'আমি তোমাকে বাঁচাব!'

'হাঁ হাঁ—' ভাঙা ভাঙা রুদ্ধ স্বরে কুন্তা বলে, 'রক্‌ষা (রক্ষা) না করলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি তো সব কুছ জানো—'

'লেকেন তোমার মা আউর ওহী চৌবেজি—' বলতে বলতে থেমে যায় হীরালাল।

এবার জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে ব্যাকুলভাবে কুন্তা বলে, 'ওদের কথা শুনতে চাই না। তুমি আমাকে কিরপা (কৃপা) কর, কিরপা কর—' দু হাতে প্রাণপণে হীরালালের ঘোড়ার রেকাব আঁকড়ে ধরে সে। এটাই যেন তাব জীবনের শেষ ভরসা, কোনওভাবেই তা হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে শুরু হয় অঝোরে কান্না। কুন্তার দু চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অবিরল জল ঝরতে থাকে।

ত্রিশ বত্রিশ বছরের জীবনে এমন বিপন্ন আর কখনও হয়নি হীরালাল। কী করবে কী বলবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না।

কুন্তা আবার কিছু বলতে যাচ্চিল, শহরের দিক থেকে অনেকের চিৎকার ভেসে আসে। চমকে সেদিকে মুখ ফেরায় সে। বিলাখী, চম্পা এবং আরও ক'টি মেয়েমানুষ শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে চলে এসেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কুন্তা বলে, 'ওহী লোগন আ গয়ী। বাঁচাও—বাঁচাও—কিরপা কর—'

চম্পারা গলায় রক্ত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে। তাদের লক্ষ করতে করতে হীরালাল টের পায়, তার মধ্যে কোথায় যেন প্রচণ্ড ভাঙচুর চলছে। মনে হতে থাকে, কুন্তার জন্য এই মুহূর্তে কিছু একটা করা খুবই জরুরি। হঠাৎ নিজের অজান্তে দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্বল এই যুবকটির ভেতর থেকে একটি পরাক্রান্ত মানুষ বেরিয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে কুন্তাকে এক টানে ওপরে তুলে নিজের পেছনে বসায়। তারপর মোতিয়ার কাঁধে চাপড় মারতেই তীরের ফলার মতো সেটা সামনের দিকে ছুটতে থাকে।

খানিকটা যাবার পর সড়ক দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকেরটা পাহাড়ের তলায় যেখানে সিনেমাওলারা ক্যাম্প করে আছে সেখানে গিয়ে থেমেছে। ডান দিকেরটা গেছে ষাট মাইল দূরের ডিস্ট্রিক্ট টাউনে। আপাতত কুন্তাকে নিয়ে সেখানেই যাবে হীরালাল। তারপর কী করা দরকার সেটা পরে ভাবা যাবে।

চিরকালের ভীরু কমজোর হীরালাল জীবনে এই প্রথম রাজপুত হয়ে ওঠে।

জুহু বিচের সেই মেয়েটা

জুহু 'বিচে'র বাদামি বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন অবনীশ। পৃথিবীর এই 'লঙ্গেস্ট বিচ' অর্থাৎ দীর্ঘতম বেলাভূমি চার-পাঁচ মাইল দূরে ভারসোবা পর্যন্ত চলে গেছে। কোথাও একটু না থেমে অবনীশ সোজা ভারসোবা পর্যন্তই যাবেন। সেখানে আধ ঘণ্টা জিরিয়ে আবার বিচের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসবেন।

অবনীশ কলকাতার একটা বিরাট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ফিনান্স ডিরেক্টর। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। টান টান সমুন্নত চেহারা, নাক মুখ ধারালো, গায়ের রং টকটকে। জুলপি এবং ঘাড়ের কাছে কয়েকটা চুলকে রুপোর তার করে দেওয়া ছাড়া সময় তাঁর ওপর আর কোনও আঁচড় কাটতে পারে নি। হঠাৎ দেখলে তাঁকে যুবক বলে মনে হতে পারে।

অবনীশ অবিবাহিত। তিনি সিগারেট খান না, মদ-টদ স্পর্শ করেন না। পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগের ন্যায়-নীতি ব্যক্তিগত জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। সেদিক থেকে তাঁকে পুরনো আমলের চরিত্রবান মানুষ বলা যেতে পারে।

কোম্পানির নানা দরকারে অবনীশকে প্রায় ফি মাসেই বম্বে আসতে হয়। বম্বে এসে তিনি আর কোথাও ওঠেন না। জুহুতে তাঁর একটি প্রিয় হোটেল আছে, এয়ারপোর্ট থেকে সোজা সেখানে চলে আসেন। তাঁর কাজকর্ম কিন্তু সবই এখান থেকে পনের ষোল মাইল দূরে প্রপার বম্বে সিটিতে। তবু যে তিনি এত দূরে জুহুতে এসে থাকেন তার একমাত্র কারণ এখানকার বিচ। বাদামি বালির এই আশ্চর্য সুন্দর বেলাভূমি দুরন্ত আকর্ষণ তাঁকে জুহুতে টেনে আনে।

যে ক'দিন অবনীশ এখানে থাকেন সূর্যোদয় হবার আগেই বিচে চলে আসেন। খানিকক্ষণ বেড়িয়ে টেড়িয়ে হোটেলে ফিরে যান। তারপর স্নানটান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে সোজা প্রপার বম্বেতে। সারাদিন নানারকম কাজ আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চুকিয়ে সন্ধের আগে হোটেলে ফিরেই আবার বিচ।

খুব জোরেও না, আবার আস্তেও না, মাঝারি গতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন অবনীশ।

বিচটার একদিকে আরব সাগর। আরেক দিকে অগুনতি নারকেল গাছ কোস্ট লাইন ধরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে বিরাট বিরাট একেকটা হেটেল—'হলিডে ইন', 'কিংস', 'হরাইজন', 'সান এ্যান্ড স্যান্ড' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বিচের ওপর সারি সারি ইডলি-দোসা, ভেলপুরী, নারিয়েল পানি, আইসক্রিম

এবং অজস্র রকমের ভাজিয়া-ভুজিয়ার স্টল।

আরব সাগরে এখন সন্ধে নামতে শুরু করেছে। সন্ধে নামলেও অন্ধকার গাঢ় হয়নি, দিনের আলোর শেষ আভাটুকু এখনও আকাশে এবং সমুদ্রে আবছাভাবে লেগে রয়েছে। সামনের দিকে তাকালে মনে হয়, আরব সাগর যেন সারা গায়ে একটা উলঙ্গ বাহার শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে।

বীচে এখন প্রচুর ভিড়। সমুদ্রতীরের বাতাস থেকে টাটকা 'ওজোন' ফুসফুসে টেনে নেবার জন্য হাজার হাজার মানুষ এখানে চলে এসেছে। আর আছে স্প্যানিশ চেক স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান আমেরিকান এবং ফার-ইস্ট মিডল-ইস্টের অগুনতি বিদেশি টুরিস্ট।

ভিড় পেছনে ফেলে, বড় বড় হোটেলগুলো ডাইনে রেখে অবনীশ ফাঁকা মতো একটা জায়গায় এসে পড়লেন। কিছুটা অন্যমনস্কের মতোই তিনি হাঁটছিলেন। হঠাৎ মনে হল, পাশ থেকে কেউ যেন ফিসফিসিয়ে উঠল।

সমুদ্র থেকে ঝড়ের মতো হাওয়া উঠে এসে এধারের নারকেল বনে ভেঙে পড়ছিল। অবনীশ ভাবলেন, ওটা হয়তো বাতাসেরই শব্দ। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ভুলটা ভাঙল। গলার স্বর এবার আরেকটু স্পষ্ট, 'প্লিজ একটা কথা শুনবেন—'

কোনও মেয়ের গলা। একটু চমকই লাগল অবনীশের। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি এবং বাঁ দিকে ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলেন একটু দূরে তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি যুবতী দাঁড়িয়ে আছে।

পেছন দিকের একটা বিরাট কুড়ি-বাইশ তলা হোটেল থেকে খানিকটা আলো এখানে এসে পড়েছিল। সে জন্য মেয়েটাকে মোটামুটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার গায়ের রং বেশ ফর্সা, মুখ ডিমের মতো লম্বাটে, লালচে চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, চোখদুটো ঘন পালকে-ঘেরা এবং ভাসা ভাসা। তবে স্বাস্থ্য ভালো নয়, বেশ রোগা সে। এই বয়সেই তার শরীর ভেঙে যেতে শুরু করেছে। তাকে দেখলে প্রথমে যে কথাটা মনে পড়ে তা হল 'জীবনযুদ্ধ'।

মেয়েটার পরনে খেলো কাপড়ের স্কার্ট আর ব্লাউজ। ঠোঁটে গালে নখে সস্তা দামের রং, পায়ে আধপুরনো স্লিপার। গলায় বীডের হার ছাড়া সারা গায়ে আর কোনও গয়না-টয়না নেই। তাকালেই টের পাওয়া যায় মেয়েটা গোয়াঞ্চি পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার কৃশ্চান।

তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত এক পলক দেখে নিয়ে রুক্ষ গলায় অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?' ইংরেজিতেই বললেন তিনি, কেননা মেয়েটা ওই ভাষাতেই কথা বলেছে।

মেয়েটা উত্তর দিলে না। ঘাড় নিচু করে ভীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, আর স্লিপারের

ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে বীচের বালি আঁচড়াতে লাগল।

গলার স্বর আরও রুক্ষ করে এবার ধমকে উঠলেন অবনীশ, 'কী হল, চুপ করে রইলে যে?

মেয়েটা চমকে উঠল যেন। তারপর ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার পঞ্চাশটা টাকা চাই।

ভুরু কুঁচকে চোখের দৃষ্টি মেয়েটার ওপর স্থির করলেন অবনীশ। আগের স্বরেই বললেন, 'তোমাকে টাকা দেব কেন?'

মেয়েটা ভালো ইংরেজি জানে না। তার প্রতিটি কথায় গণ্ডা গণ্ডা ভুল। তবু সে যা বলতে চায় মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। মেয়েটা এবার বলল, 'টাকাটা আমার খুব দরকার।'

'তোমার দরকার বলে আমাকে দিতে হবে?'

'টাকাটা একেবারে খালি হাতে আমি নেব না। তার বদলে আমিও কিছু দিতে পারি।'

'কী দেবে তুমি?'

মেয়েটা অবনীশের দিকে তাকাতে পারছিল না। নিজের পায়ের কাছে চোখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'একটু আনন্দ।'

অবনীশ ঝাপসাভাবে কিসের একটা সংকেত পাচ্ছিলেন। বললেন, 'তার মানে?'

মেয়েটা বলল, 'আমার এই শরীরটা রয়েছে। এটা—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল।

এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটা অবনীশের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাঁর শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কিছু একটা নেমে গেল যেন। তিনি শুনেছেন জুহু বিচে' অগুনতি কল গার্ল বা এই জাতীয় মেয়েরা জীবাণুর মতো থিকথিক করতে থাকে। তবে বছরে দশ বার করে গত দশ বছরে কম করে এক শো বার তিনি এই বিচে' এসেছেন কিন্তু এরকম কোনও মেয়েকে আগে আর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেন নি।

এদের সম্পর্কে অবনীশ যা শুনেছেন তার সঙ্গে এই মেয়েটির প্রায় কিছুই মেলে না। মেয়েটা খুব নম্র আর ভিতু। খুব সম্ভব লাইনে নতুন এসেছে। অবনীশ চাপা গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে পুলিশে হ্যাণ্ড ওভার করব।'

মেয়েটা শিউরে উঠল যেন। তারপর বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করছি। নিশ্চয়ই আপনি পুলিশ ডাকতে পারেন। কিন্তু—'

সন্ধেবেলার বেড়ানোতে বাধা পড়ায় অবনীশ বিরক্ত হচ্ছিলেন, অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন এবং খুবই রেগে যাচ্ছিলেন। তবু মেয়েটাকে এক ধরনের নোংরা পোকার মতো গা

থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। বললেন, 'কিন্তু কী?'

মেয়েটি বলল, 'আমার কথা শুনলে আপনার দয়াই হবে। তখন আর পুলিশে দিতে ইচ্ছা করবে না।'

কিছুক্ষণ কি ভাবলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'এই প্রফেশান কদ্দিন এসেছ?'

'আজই।'

'ও। আমি তোমার প্রথম শিকার বুঝি?'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

হঠাৎ কী হয়ে গেল অবনীশের, এত দিনের নীতিবোধ-টোধের কথা আর মনে থাকল না। দারুণ এক কৌতূহল আচমকা তাঁকে পেয়ে বসল যেন। বললেন, 'এস আমার সঙ্গে, আমি তোমার কথা শুনব।'

মেয়েটি ভীত সুরে বলল, 'কোথায় যাব?'

'গেলেই বুঝতে পারবে।'

'আপনি কি আমাকে সত্যি সত্যি পুলিশের হাতে দেবেন?'

'সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

একরকম জোর করেই চরিত্রবান এবং দুর্দান্ত নীতিবাগীশ অবনীশ জুহু বিচের একটা বাজে মেয়েকে নিয়ে সোজা তাঁর ফাইভ-স্টার হোটেল চলে এলেন।

রিসেপশানিস্ট থেকে শুরু করে হোটেলের স্টুয়ার্ড-বয়-বেয়ারা অবনীশের সঙ্গে একটা মেয়েকে দেখে চমকে উঠল। দশ বছর এই হোটেলে তিনি নিয়মিত আসছেন কিন্তু কোনওদিন তাঁর সঙ্গে কোনও মেয়েকে দেখা যায়নি। সবাই জানে, এসব ব্যাপারে তিনি ভয়ানক পিউরিটান।

অবনীশ কোনও দিকে তাকালেন না, মেয়েটাকে নিয়ে সোজা লিফট্ বক্সে ঢুকে পড়লেন। একটু পর থারটিনথ ফ্লোরে তাঁর স্যুইটে।

মেয়েটা ভীষণ কাঁপছিল। বোঝা যাচ্ছে এরকম 'পশ' হোটেলে আসার অভ্যাস নেই তার।

একটা ডিভান দেখিয়ে অবনীশ বললেন, 'বোসো—'

ডিভানটা কাচের জানালার ধার ঘেঁষে। তার পাশেই সোফা-টোফা সাজানো রয়েছে। মেয়েটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ডিভানের ওপর জড়সড় হয়ে বসল। আর অবনীশ তার মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন।

এখান থেকে দূরে ঝাপসাভাবে রাতের আরব সাগর দেখা যাচ্ছে। আর জানালার নিচের দিকে তাকালে হোটেলের সুইমিং পুল চোখে পড়বে।

অবনীশ সমুদ্র বা সুইমিং পুল কোনও দিকেই তাকালেন না। স্থির নিষ্পলকে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটা বলল, 'জুনি।'

'তখন তুমি বললে আজই এই প্রফেশনে এসেছ—'

'হ্যাঁ।'

'এই ডার্টি জঘন্য প্রফেশনে এলে কেন?'

'না এসে উপায় ছিল না।'

'বাজে কথা। যে যে কাজ করে, তা যত খারাপই হোক, তার একটা কৈফিয়ৎ ঠিক খাড়া করে রাখে।'

মেয়েটা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'আপনার কি ধারণা আমি শখ করে এই নোংরা কাজ বেছে নিয়েছি?'

মেয়েটার কথার ভেতর কোথাও একটা খোঁচা ছিল, অবনীশের চোখ কুঁচকে গেল। বললেন, 'এ ছাড়া অন্য কিছু করা যেত না?'

'হয়তো অনেক কিছুই করা যেত। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'কেন?'

'আমি টু-থ্রি স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়েছি। ঐ কোয়ালিফিকেশনে ভদ্র কোনও চাকরি হয় না।'

অবনীশের মতো অত বড় কোম্পানির একজন ফিনান্স ডিরেক্টর এভাবে একটা বাজে টাইপের প্রস্টিটিউটের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলেন না। কিন্তু তাঁর কেমন যেন জেদ চেপে গিয়েছিল। বললেন 'কেন তুমি এ লাইনে এলে সেটা আমি জানতে চাই।'

জুনি এবার বলল, 'তাতে আপনার কী লাভ? আপনাকে বিরক্ত করেছি, সেজন্য ক্ষমা চাইছি। দয়া করে আমাকে যেতে দিন। যেমন করে হোক কিছু টাকা আমাকে জোগাড় করতেই হবে। এখনও বিচে গিয়ে চেষ্টা করলে ওটা হয়তো পেয়ে যাব।'

'যতক্ষণ না বলছ, আমি ছাড়ব না। যদি আমাকে বোঝাতে পার নিরুপায় হয়েই এ লাইনে এসেছ, টাকাটা আমিই তোমাকে দেব।'

জুনি দ্বিধান্বিতের মতো একটুক্ষণ বসে থাকল, তারপর বলল, 'আমার ছেলে ডেথ বেডে, বাঁচবার আশা খুব কম। এদিকে আমার হাতে একটাও পয়সা নেই। তাই ওকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা—'বলতে বলতে তার গলা ধরে এল।

অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ম্যারেড?'

'হ্যাঁ—' জুনি আস্তে করে মাথা নাড়ল।

'তোমার হাজব্যাণ্ড বেঁচে নেই?'

'জানি না।'

'তার মানে?'

জুনি এবার যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। গোয়ার ক্যাপিটাল পাঞ্জিম থেকে

পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা গ্রামে তাদের বাড়ি। ওখানকারই এক বড়লোকের ছেলে—পাঞ্জিমে তাদের বিরাট 'শেল'-এর (শঙ্খ, কড়ি, টার্বো, ট্রোকাস ইত্যাদি) ব্যবসা—ফুঁসলে বম্বেতে নিয়ে আসে। রেজিস্ট্রি করে বা চার্চে গিয়ে তারা বিয়ে-টিয়ে করে নি। তবে স্বামী-স্ত্রীর মতো বছর দুযেক থেকেছে। ফুর্তিটুর্তির পর নেশা ছুটে গেলে ছোকরা তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। জুনির ফেরার উপায় ছিল না, কেন না ততদিনে তার একটা বাচ্চা হয়ে গেছে।

বাচ্চাটাকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত একটা ঝোপড়পট্টিতে এসে ঠেকেছে জুনি। হাতে দু-চারটে যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে আর যেটুকু গয়না-টয়না ছিল তা বেচে এত দিন চালিয়েছে। এখন আর কিচ্ছু নেই। তার ওপর ক'দিন ধরে ছেলেটা মৃত্যুশয্যায়। তাই কোনও রাস্তা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সেই আদিম অন্ধকার ব্যবসাতেই নামতে চেয়েছে।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করল জুনি।

অবনীশ বললেন, 'বানানো গল্প, আমি বিশ্বাস করি না।'

জুনি বলল, 'আমি মিথ্যে বলি না।'

'তুমি যে সত্যি বলছ তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ পেতে হলে আমি যে নরকে থাকি সেখানে আপনাকে যেতে হয়।'

অবনীশ বললেন, 'নরক-টরক বলে আমাকে ঠেকাতে পারবে না। আমি যাব। কোথায় থাকো তুমি?'

জুনি বলল, 'কিংস সার্কল স্টেশনের দিকে যেতে রেল লাইনের গায়ে যে ঝোপড়পট্টি রয়েছে সেখানে।'

'ঠিকানা ঠিক তো?'

'আপনাকে আগেই বলেছি, আমি মিথ্যে বলি না।'

'যুধিষ্ঠির!' বলে একটু থামলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'তোমার ছেলে তো বললে ডেথ বেডে?'

'হ্যাঁ।' জুনি মাথা নাড়ল।

'তাকে কোথায় রেখে এসেছ?'

'ঝোপড়পট্টিতে এক মাদারি খেলোয়াড় আছে, তাঁর বউ-এর কাছে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জুনি, 'রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি আর থাকতে পারব না।'

দু-তিন সেকেণ্ড কি ভাবলেন অবনীশ; তারপর উঠতে উঠতে বললেন, 'একটু দাঁড়াও—' বলেই ভেতরের অন্য একটা ঘর থেকে পঞ্চাশটা টাকা এনে জুনিকে দিলেন।

টাকাটা যে সত্যি সত্যি পাওয়া যাবে, জুনি ভাবে নি। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর মাথা নুইয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনি টাকাটা দিলেন, বদলে আমারও আপনাকে কিছু দেবার আছে। যদি তাড়াতাড়ি—'

অবনীশের রক্তের ভেতর দিয়ে জোরালো বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'গেট আউট বিচ, গেট আউট—'

জুনি ভয় পেয়ে প্রায় দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে অবনীশ আরেক বার চেঁচালেন, 'মনে রেখো, তোমাদের ঝোপড়পট্টিতে আমি যাবই। যদি দেখি মিথ্যে বলেছ, তোমাকে ছাড়ব না।

পর দিন সকালে জুহু বিচে অভ্যাসমতো ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে ফিরে এলেন অবনীশ। তারপর স্নানটান সেরে ব্রেকফাস্ট যখন শেষ করে এনেছেন সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ক্রেডল থেকে ফোনটা তুলে কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলতেই রিসেপশানের পার্শি মেয়েটার গলা ভেসে এল, 'স্যার, একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

অবনীশ বললেন, 'আমার স্যুইটে পাঠিয়ে দাও—'

'কিন্তু স্যার, লোকটাকে মনে হচ্ছে খুব বাজে টাইপের—শ্যাবিলি ড্রেসড—পাঠাব কি?'

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে নিলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, ওখানেই ওকে অপেক্ষা করতে বল। আমি আসছি।'

কিছুক্ষণ পর নিচে আসতেই রিশেপশানিস্ট মেয়েটা লোকটাকে দেখিয়ে দিল।

একধারে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বয়স ষাট বাষট্টির মতো হবে। কালো কুঁজো হতচ্ছাড়া চেহারা, মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি পিনের মতো ফুটে আছে। পরনে তালি-মারা পাজামা আর ঢলঢলে জোব্বা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে টায়ার-কাটা চপ্পল।

এরকম চেহারার একটা লোক তাঁর নাম কী করে জানল, কেনই বা তাঁর কাছে এসেছে, অবনীশ ভেবে পেলেন না। কপাল কুঁচকে রুক্ষ গলায় তাকে বললেন, 'কী চাই?'

লোকটা আরও খানিকটা কুঁজো হয়ে গেল যেন। দুই হাত জোড় করে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বলল, 'আমি বোস সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করব।'

'আমিই বোস সাহেব—বল।'

'জুনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।'

জুনি অর্থাৎ কালকের সেই মেয়েটা। লোকটাকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'

লোকটা বলল, 'আমি একজন মাদারি খেলোয়াড়। জুনি যে ঝোপড়পট্টিতে থাকে

আমিও সেখানে থাকি।'

অবনীশের মনে পড়ল, কাল জুনি কে এক মাদারি খেলোয়াড়ের কথা বলেছিল। এ-ই তা হলে সে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'জুনি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে কেন?'

'আপনি নাকি বলেছিলেন আমাদের ঝোপড়পট্টিতে যাবেন—'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'মেহেরবানি করে হুজুর যদি আমার সঙ্গে যান—'

লোকটার ধৃষ্টতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন অবনীশ। একটা থার্ড ক্লাস মাদারি খেলোয়াড় তাঁকে কিনা তার সঙ্গে বস্তিতে যেতে বলছে! কী উত্তর দেবেন অবনীশ ভেবে পেলেন না। শুধু বললেন, 'তোমার সঙ্গে ঝোপড়পট্টিতে যাব!'

লোকটা ঘাড় কাত করল, 'জি। নইলে জুনির সঙ্গে আর দেখা হবে না। ও এখান থেকে চলে যাবে। আর আপনি যা জানতে চান জানতে পারবেন না।'

হঠাৎ দারুণ এক আকর্ষণ অনুভব করলেন অবনীশ। লোকটাকে বললেন, 'চল।'

কিংস সার্কেল স্টেশনের কাছাকাছি রেল লাইনের গায়ে যে ঝোপড়পট্টি রয়েছে, কিছুক্ষণ পর সেই লোকটার পিছু পিছু অবনীশ সেখান এলেন।

জুনি বলেছিল নরক। এই ঝোপড়পট্টিগুলো তার চাইতেও বোধহয় জঘন্য। দু'ধারে পিচবোর্ড টিন চট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সারি সারি সুড়ঙ্গের মতো ঘর। মাঝখানে দিয়ে সাপের মতো আঁকাবাঁকা অন্ধকার রাস্তা। এই রাস্তা যুগপৎ পায়ে চলার পথ এবং নর্দমা। পানের পিক, থুতু, কফ এবং কাচ্চা-বাচ্চাদের যাবতীয় প্রাকৃত কর্মের চিহ্ন সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। রাস্তাটা থেকে কুৎসিত দুর্গন্ধ উঠে আসছিল।

নাকে রুমাল চেপে লোকটার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন অবনীশ। এখানে ছোটখাটো ভিড় জমে আছে। দেখেই বোঝা যায় এরা বস্তিরই লোকজন।

অবনীশের মতো সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন লোককে দেখে ভিড়টা দু-ভাগ হয়ে পথ করে দিল। আর তখনই সামনের দিকে চোখ পড়ল অবনীশের, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চমকে উঠলেন তিনি।

ঘরের সামনে ছোট্ট বারান্দায় জুনি মূর্তির মতো বসে ছিল। তার সামনে একটা মৃত শিশুর দেহ শোয়ানো রয়েছে। নিশ্চয়ই জুনির ছেলে।

সেই লোকটা একটু এগিয়ে গিয়ে জুনিকে বলল, 'সাহেব এসেছেন—'

জুনি অবনীশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম। এ ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না।' বলে একটু থামল সে। তারপর মৃত বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল,

‘কাল বলেছিলাম আমার ছেলে ডেথ বেডে। রাত্তিরে ফিরে এসে দেখি সে আমাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেছে। এতক্ষণে ওকে গোরস্থানে নিয়ে যাবার কথা, কিন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নিজের চোখেই দেখুন, আমি মিথ্যে বলিনি, আপনাকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা আদায় কবতে চাই নি।’

অবনীশ কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। গলার কাছে অসহ্য এক যন্ত্রণা ডেলার মতো পাকিয়ে যেতে লাগল।

জুনি হঠাৎ উঠে পড়ল। ঘর থেকে কালকের সেই পঞ্চাশটা টাকা এনে অবনীশকে বলল, ‘আপনার টাকাটা নিন—’

অবনীশ ভাঙা গলায় বললেন, ‘টাকাটা ফেরত নেবার জন্যে তো দিইনি।’

‘যে জন্যে দিয়েছিলেন সে কাজে লাগল না, অকারণে আপনার কাছে ধার রাখব কেন?’ একরকম জোর করেই টাকাটা অবনীশকে ফিরিয়ে দিল জুনি।

অবনীশ বললেন, ‘এবার তুমি কী করবে?’

‘ভাবি নি।’ বলে একটু থামল জুনি। পরক্ষণে আবার বলল, ‘আশা করি আপনি যে প্রমাণ চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেছেন। আমাকে নিশ্চয়ই আর ধাপ্পাবাজ ভাবছেন না।’

অবনীশ উত্তর দিতে পারলেন না।

জুনি আবার বলল, ‘এই নরকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট করবেন না, দয়া করে চলে যান।’

মুখ নামিয়ে আচ্ছন্নের মতো অন্ধকার সরু গলিটা দিয়ে এগুতে লাগলেন অবনীশ।



তিন

নরক

দুপুরবেলা নেকীপুর টৌন বা টাউন থেকে সাগিয়া যখন বেরিয়ে পড়েছিল, আকাশের গায়ে দু-এক টুকবো নিরীহ ভবঘুরে মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। চারপাশে নরম মায়াবী রোদের তখন ছড়াছড়ি।

ভাদ্রমাসে শেষ হয়ে এল। গোটা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে আজকাল আকাশ আশ্চর্য নীল হয়ে উঠেছে। মনে হয়, মাথার ওপর এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত অলৌকিক একখানা আরশি কেউ আটকে রেখেছে। একটু আধটু কালচে মেঘ যে রোজ চোখে না পড়ে, এমন নয়। কিন্তু সেগুলো ঘন হতে না হতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

সেদিক থেকে আজকের দিনটা একেবারে আলাদা। দুপুরের সেই মেঘের টুকরোগুলো হাওয়ায় তো উড়ে গেলই না, বরং এক কোণে জমাট বাঁধতে লাগল।

শুধু তাই না, দিগন্তের তলা থেকে নিরেট পাথরের চাংড়ার মতো আরও অজস্র মেঘ দ্রুত উঠে এসে ভাদ্রের উজ্জ্বল নীলাকাশকে ক্রমশ ঢেকে ফেলতে শুরু করল।

সাগিয়া আসছে নেকীপুর টৌন থেকে, যাবে আরেক টৌন জনকপুরে। নেকীপুর থেকে খাড়া দক্ষিণে যে সরু পাকা সড়ক অর্থাৎ পাক্কিটা চলে গেছে সেটা ধরে মাইল চারেক হাঁটলে নৌহর নদীর পারঘাটা। নৌহর বিখ্যাত কোশি নদীর মূল ধারা থেকে বেরিয়ে অনেকটা ঘুরপথে আবার কোশিতেই গিয়ে মিশেছে। খেয়া নৌকোয় নদী পেরিয়ে ওপারে নামলে ফের পাকা সড়ক। সেখান থেকে সাইকেল রিকশায় মাইল সাতেক গেলে জনকপুর।

কিন্তু জনকপুর টৌন অনেক দূরের কথা, নেকীপুর থেকে বেরিয়ে মাইল দুই যেতে না যেতেই সাগিয়া টের পায়, দিনের আলো দ্রুত নিভে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে একবার মুখ তুলে তাকায় সে। কোথাও নীলাকাশের চিহ্নটুকু নেই। ভারি ঘন কালো মেঘের স্তর ছাড়া মাথার ওপর কিছুই চোখে পড়ে না।

এখনও অনেকটা রাস্তা সাগিয়াকে যেতে হবে। তা ছাড়া মাঝখানে রয়েছে একটা মাঝারি নদী। সে যে নেকীপুরে ফিরে আজকের রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে আবার জনকপুর রওনা হবে, তারও উপায় নেই। কেননা জগনাথজি আজ সকালে তার মজুরি মিটিয়ে দিয়ে সাহারসা চলে গেছে। জগনাথজি ছাড়া নেকীপুরের দু-একজনকে সে যে চেনে না তা নয়, কিন্তু তার মতো জঘন্য মেয়েমানুষকে কেউ

দেখতে পারে না। কেননা সাগিয়ার মুখ দেখাও পাপ, তার ছায়া মাড়ালে দশ বার নাহানা করে শরীর শুধ্ করতে হয়।

একেবারে মরিয়া হয়েই সাগিয়া হাঁটার গতি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি, তবে যে কোনও মুহূর্তে আকাশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। সমস্ত চরাচর জুড়ে যা মেঘ জমেচে তাতে একবার শুরু হলে সে দুর্যোগ কবে থামবে, আদৌ থামবে কিনা, কে জানে। তার আগেই তাকে নৌহর নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছতে হবে।

সাগিয়ার দিকে এবার ভালো করে তাকানো যেতে পারে। পৃথিবীর সব চেয়ে ওঁচা রেণ্ডিটুলি বা বেশ্যাপাড়া যদি কোথাও থাকে, সেটি হল জনকপুরে। সাগিয়া সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু এখনও ততটা দেখায় না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জানোয়ারের পাল সাগিয়ার শরীরটাকে ময়দা ডলার মতো ডলে চলেছে। তারপরও সে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

লম্বাটে মুখ সাগিয়ার। গায়ের রং মাজা তামার মতো। চোখের তলায় কালির ছোপ পড়েছে ঠিকই, লক্ষ করলে গালে ছিট-ছিট মেচেতাও দেখা যাবে, চেহারায় ফুটে উঠতে শুরু করেছে কর্কশ কাঠিন্য। সবই ঠিক, তবু রাতের পর রাত কুত্তার পালের কামড়াকামড়ি এবং ধামসানোর পরও সাগিয়ার শরীরে খানিকটা চটক এখনও থেকে গেছে। এর একটা বড় কারণ তার প্রায়-অটুট স্বাস্থ্য।

সাগিয়ার শরীরে এখনও চর্বি জমতে শুরু করেনি। হাত-পায়ের হাড় বেশ পুরু আর মজবুত। সরু কোমর তার, মাংসল ভরাট বুক, কোমরের তলায় বিশাল অববাহিকা, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরোয়নি। ছোট কপাল, ঘন কালো চুল খুলে দিলে কোমর ছাপিয়ে নেমে যাবে।

এই মুহূর্তে সাগিয়ার পরনে খেলো রঙচঙে সিল্কের শাড়ি আর লাল টকটকে ব্লাউজ। পায়ে কাঁচা চামড়ার সস্তা স্লিপার। দুই হাতে রুপোর কাংনা, কানে ঝুটো পাথর বসানো চাঁদির করণফুল, গলায় চাঁদিরই চওড়া হার, নাকে নাকফুল। চুলগুলো প্রকাণ্ড খোঁপায় আটকে একটা রুপোর পাত বসানো কাকাই বা চিরুনি গুঁজে দেওয়া হয়েছে। হাতের আঙুলে গোটা তিনেক চাঁদির আংটি, পায়ের আঙুলে চুটকি। দুই ভুরুর মাঝখানে উল্কিতে আধখানা চাঁদ, থুতনিতেও উল্কি রয়েছে—সেটা ফণাতোলা ছোট একটা সাপ।

সাগিয়ার ডান হাতে ঝুলছে ফুললতাপাতা-আঁকা টিনের একটা সুটকেস। সেটার ভেতর রয়েছে কিছু জামা-কাপড়, খেলো স্নো-পাউডার, কজরৌটি (কাজল-লতা), আলতার শিশি, এমনি সব সাজের জিনিস।

দিন চারেক আগে নেকীপুরে এসেছিল সাগিয়া। জগনাথই লোক পাঠিয়ে তাকে জনকপুর থেকে নিয়ে যায়।

জগনাথ হলো 'লালদাসিয়া' কায়াথ। বয়স পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু এই বয়সেও মেয়েমানুষের জন্য তার শরীরে সারাক্ষণ আগুন জ্বলছে। তার কারণ পার্বতী।

পার্বতী জগনাথের স্ত্রী—অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে-করা বিশুদ্ধ ধর্মপত্নী। কিন্তু এই মেয়েমানুষটির জন্য জগনাথের প্রাণে সুখ-শান্তি বলতে কিছু নেই, তার 'তনমন' একেবারে ছারখার হয়ে গেছে। বিয়ের বছরখানেক বাদেই এক দুর্ঘটনায় কোমরের তলার দিকটা পড়ে যায় পার্বতীর। তারপর প্রায় তিরিশ বছর পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছে সে। একসময় সুন্দরীই ছিল, কিন্তু একনাগাড়ে বছরের পর বছর ভুগে এবং বিছানায় শুয়ে থেকে শরীরে শাঁস বলতে এখন আর কিছুই নেই। চোখ এক আঙুল ভেতরে ঢুকে গেছে, চুল হেজে হেজে পাটের ফেঁসো। হাড়ের ওপর শুকনো ঢিলে চামড়া খোলসের মতো আটকে আছে। বুকের ধুকপুকুনিটুকু না থাকলে মনে হতো, সে বেঁচে নেই।

জগনাথ আরো একবার বিয়ে করতে পারত, পারেনি পার্বতীর বাপুজি অর্থাৎ তার শ্বশুরের ভয়ে। শ্বশুর রামধারীজি বিরাট জমিমালিক, প্রচণ্ড দাপট তাঁর। জগনাথ যে জীবনে দাঁড়াতে পেরেছে, সমাজে সে যে এখন একজন পয়সাওলা 'সরগনা আদমী' (মান্যগণ্য ব্যক্তি) সেটা রামধারীজির কারণেই। তিনি চোখ লাল করে হাতের আঙুল উঁচিয়ে শাসিয়েছিলেন, দুসরা শাদি করা চলবে না জগনাথের। মেয়ের ঘরে সৌতিন ঢুকবে, এতে তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি।

কাজেই দ্বিতীয় বার বিয়েটা করা হয়ে ওঠেনি জগনাথের। কিন্তু শরীর বলে তো একটা ব্যাপার আছে। রুগ্ন রতিশক্তিহীন গিধের মতো স্ত্রীকে নিয়ে সে কী করবে? ধর্মপত্নীর জন্য তো আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন করা যায় না। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে ধুরন্ধর বিল্লির মতো তাকে খিদে মেটাতে হয়।

জগমোহন বিরাট কাঠের কারবারী। সাহারসায় তার আসল গদি। বাড়িও সেইখানেই। তবে নেকীপুরেও তার একটা গোলা আছে। এখানকার গোলা চারপাশের যাবতীয় ভালো টিম্বার জোগাড় করে সাহারসায় পাঠায়। সাহারসার গদি থেকে সে-সব চালান যায় বড় বড় শহরে—পাটনায়, ধানবাদে, কলকাতায়, এমন-কি সুদূর বোম্বাইতেও।

জগনাথ সময় পেলেই নেকীপুরের গোলায় চলে আসে। আসার কারণ দুটো। এখানকার কাজকর্ম তদারক করা আর জনকপুর থেকে সাগিয়াকে আনিয়ে কয়েকটা দিন একটু আনন্দে কাটানো। এতে তার পরমাত্মার শান্তি। অটুট স্বাস্থ্যবতী, চটকদার আওরতটাকে তার খুব মনে ধরেছে। প্রায় বছর দশেক ধরে জগনাথের জন্য বছরে

অন্তত সাত-আটবার জনকপুর থেকে নেকীপুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাগিয়াকে।

সাগিয়া যখন নৌহর নদীর পারঘাটায় পৌঁছল, তখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি, তবে মেঘের ভারে আকাশ অনেকখানি নেমে এসেছে। দিগন্তকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ছুরির ফলার মতো বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড তোলপাড় করে থেকে থেকেই বাজ পড়ছে। সেই সঙ্গে চলছে একটানা মেঘের গর্জন। খোলা নদীর ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

ক'দিন আগে যখন ওপার থেকে এপারে এসে সাগিয়া নেমেছিল, নৌহর তখন আশ্চর্য-শান্ত। বর্ষার জলে যদিও সে ভরে ছিল পূর্ণযুবতীর মতো, কিন্তু এতটুকু অস্থিরতা ছিল না তার। সেই নৌহরকে এখন আর চেনা যায় না। তার নীলাভ জলে সীসার রং ধরেছে, চারিদিক উথাল-উথাল করে বড় বড় ঢেউ উঠছে।

আয়োজনটা যেভাবে হয়েছে তাতে উত্তর বিহারের এই অঞ্চল পৃথিবী থেকে একেবারে মুছে যাবে কিনা, কে জানে।

পারঘাটায় একটি মাত্র নৌকোই রয়েছে। চেনা নৌকো। এটাই যাত্রী নিয়ে এপার ওপার করে।

মাল্লা নৌকোটা ছাড়তে যাচ্ছিল, সাগিয়াকে দেখতে পেয়ে হেঁকে ওঠে, 'ওপারে যাবে?'

নদীর চেহারার দিকে তাকিয়ে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল সাগিয়া। পলকা খেয়া নৌকোয় ওপারে যাবে কি যাবে না ভাবতে একটু সময় লাগে তার।

মাল্লা তাড়া লাগায়, 'কা, যাওগী? এরপর আর কিন্তু নৌকো পাবে না।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবার মতো সময় নেই। উর্ধ্বশ্বাসে সাগিয়া নৌকোয় গিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মাল্লা বৈঠায় ধাক্কার নৌকোটাকে পার থেকে দূরে নিয়ে যায়।

নদী এখন প্রবল তোড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটছে। বিশাল বিশাল ঢেউ তীব্র আক্রোশে সাগিয়াদের নৌকোটাকে মোচার খোলার মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

মাল্লা লোকটা যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি হুঁশিয়ার এবং একজন চতুর যোদ্ধাও। উত্তর বিহারের এই নদী, তার স্রোতের টান সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা তার। এই মুহূর্তে হালের বৈঠাটাকে ঢালের মতো ধরে রেখে দাঁতে দাঁত চেপে সে শুধু ঢেউ কাটিয়ে যাচ্ছে।

সাগিয়া এতক্ষণ লক্ষ করেনি, নিজের অজান্তেই এবার তার চোখ অন্য যাত্রীদের ওপর গিয়ে পড়ে। লোক বেশি না, সবসুদ্ধ জন পাঁচেক। সবাই নৌকোর মাঝখানে খোলা পাটাতন আঁকড়ে বসে আছে। ওদের চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। তারা জানে না নৌকোটা শেষ পর্যন্ত নৌহর পেরিয়ে ওপারে পৌঁছতে পারবে কিনা।

যাত্রীদের মধ্যে চারজন নিরীহ চেহারার সাদাসিধে দেহাতী। পঞ্চম যাত্রীটির

দিকে তাকিয়ে রীতিমত অবাকই হয় সাগিয়া। দেখামাত্র বোঝা যায় উঁচু জাতের, বড় বংশের মানুষ। বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। গায়ের রং টকটকে, মসৃণ ত্বক, লম্বাটে ভরাট মুখ, ভাসা চোখ, টান টান চেহারা। কাঁধের, গলায় বা চিবুকের তলায় সামান্য মেদ অবশ্য জমেছে। তাঁকে দেখে মনে হয়, অত্যন্ত শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে সাদা ধবধবে ধুতি আর পাঞ্জাবি, পায়ে ভারি চপ্পল। সঙ্গে মাঝারি মাপের একটি চামড়ার সুটকেস ছাড়া আর কিছুই নেই।

সাগিয়া নিজে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে, কিন্তু ওই মানুষটির আতঙ্কের শেষ নেই। তাঁর চোখের তারা স্থির। ভয়ার্ত মুখ থেকে পরতে পরতে রক্ত নেমে গিয়ে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। শুকনো ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে তাঁর। অস্পষ্ট কাঁপা গলায় বিড়বিড় করে কিছু বলছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সাগিয়া চারটি মাত্র শব্দ শুনতে পায়, 'ভগোয়ান রামচন্দ্রজি, আপহী ভরসা—' তিনি হয়তো ধরেই নিয়েছেন মেঘের চাপে নুয়ে পড়া আকাশের তলায় নৌহরের প্রচণ্ড জলস্রোতে মৃত্যু অবধারিত।

কড়-কড় শব্দে আকাশটাকে করাতের মতো চিরে দিয়ে কাছাকাছি উদোম নদীর ওপর কোথায় যেন বাজ পড়ে। পলকের জন্য ঝলসে যায় চারপাশ। চমকে সেই ভীত নিষ্পাপ মানুষটির দিকে থেকে মুখ ফেরায় সাগিয়া। তার চোখ কিছুক্ষণের জন্য ধাঁধিয়ে যায়।

দেহাতী চারজন ভীরু চাপা গলায় গোঙানির মতো অদ্ভুত সুরে অনবরত আওড়াতে থাকে, 'হো কিষুণজি, তেরে কিরপা—' তাদের কণ্ঠনালী থেকে শব্দ বেরুতে না বেরুতেই হাওয়ার ঝাপটা উড়িয়ে নিয়ে যায়।

মাল্লটা বিপুল পরাক্রমে নদীর সঙ্গে যুঝে যাচ্ছে। তার ধ্যানজ্ঞান এখন একটাই। বৈঠাটাকে জলের ভেতর আড়াআড়ি রেখে যেমন করে হোক কোণাকুণি নৌকোটাকে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া। সে গলুইর কাছ থেকে সাহস জোগাতে থাকে, 'ডরো মাত ভেইয়া। বারীষ শুরু হবার আগেই তোমাদের ওপারে পৌঁছে দেব।'

নৌহর খুব একটা বড় নদী নয়। কোথাও সেটা আধ মাইলের বেশি চওড়া হবে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক একটানা লড়াইয়ের পর নৌকোটা যখন নদীর মাঝামাঝি এসে পড়েছে সেই সময় বাতাস যেন হঠাৎ খেপে উঠল। সেই সঙ্গে মেঘের স্তরগুলো গলে গলে শুরু হল বৃষ্টি। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর প্রবল তোড়ে। চরাচরের ওপর লক্ষ কোটি সীসার ফলা যেন আকাশ থেকে ছুটে আসছে। আচমকা নদীর ঢেউগুলো পাহাড়ের মতো ফুলে ফেঁপে চারিদিক তোলপাড় করে ফেলতে থাকে। জলস্রোতে এখন কয়েক লক্ষ বুনো হাতির শক্তি।

একটানা মেঘের ডাক, থেকে থেকে বিজলি চমক, বাজের গর্জন, উল্টোপাল্টা ঝড়ো হাওয়া আর নদীর বেপরোয়া উন্মত্ত স্রোত, সব মিলিয়ে আজকের এই বিকেলটা পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের দিনে যেন ফিরে গেছে।

যে-দিকেই তাকানো যাক, এখন সমস্ত কিছু ঝাপসা। উজ্জ্বল সূর্যালোক, শরতের স্নিগ্ধ নীলাকাশ, ঝিরঝিরে সুখদায়ক হাওয়া—পৃথিবীতে কোনওদিন এসব ছিল বলে মনে হয় না।

নৌকোটা একবার ঢেউয়ের মাথায় উঠছে, পরক্ষণে অতল খাদে যেন নেমে যাচ্ছে, আবার তখনই তিরিশ হাত উঁচুতে উঠে আসছে।

শরীরের সমস্তটুকু শক্তি দিয়ে সবাই পাটাতনের কাঠ আঁকড়ে ধরে আছে। হাওয়া এবং নদীর জোর, যে কোনও মুহূর্তে এক ঝাঁকুনিতে তাদের নৌকো থেকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। একবার স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়লে কে কোথায় ভেসে যাবে, কে জানে।

এখন দু'হাত দূরের কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়। তবু সাগিয়া টের পায় অন্য সকলে পাটাতনের কাঠ ধরে বসে থাকলেও সেই শুদ্ধ মানুষটি একেবারে উপুড় হয়ে শুয়ে দু'হাতে নৌকোর কানাত জাপটে ধরে পড়ে আছেন।

দেহাতীরা এখন সমানে বলে যাচ্ছে, 'মব গিয়া, মর গিয়া—' কিছুক্ষণ আগেও কিষুণজির ওপর তাদের অটুট আস্থা ছিল। তারা ভেবেছিল তাঁর কৃপায় নিরাপদে নদীর ওপাবে পৌঁছে যেতে পারবে। এখন সেই বিশ্বাসটা আগাগোড়া টলে গেছে।

মেঘ এবং একটানা বৃষ্টিতে চারিদিক ঝাপসা হয়ে গেলেও বোঝা যাচ্ছে নৌকোটা পারের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু এই দুর্যোগে নদীর অলৌকিক শক্তির সঙ্গে একটা মানুষ কতক্ষণ যুঝতে পারে? হঠাৎ এতক্ষণ পর জলস্রোতের মারাত্মক চাপে মাল্লার হাতের বৈঠা কাঠির মতো মট করে ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা গোঁত খেযে দু'পাক ঘুরেই সটান উল্টে গিয়ে স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে থাকে।

নৌকোটা পাক খাওয়ার সময় দেহাতীদের শেষ চিৎকারটা শোনা গিয়েছিল, 'বিলকুল খতম হো গিয়া। বঁচাও—'

বৈঠা ভেঙে গিয়ে নৌকোর উল্টে যাওয়াটা এতই আকস্মিক যে আগে থেকে কেউ তা আন্দাজ করতে পারেনি। জলের টানে ভেসে যেতে যেতে সাগিয়া ভেবেছিল, আর বাঁচবে না। পরক্ষণেই স্বয়ংক্রিয় কোনও পদ্ধতিতে মনে পড়ে যায়, সে সাঁতার জানে। তৎক্ষণাৎ তার রক্তের ভেতর দিয়ে বিজলি চমকের মতো কিছু খেলে যায়। যদিও শাড়ি এবং জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে বসে গেছে এবং তার ফলে সাঁতরাতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে, তবু জলের ওপর প্রাণপণে ভেসে থেকে সাগিয়া পারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

খানিকটা যাবার পর হঠাৎ তার চোখে পড়ে, ডান পাশে প্রায় কুড়ি হাত তফাতে কিছু একটা ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টির তোড় এখনও কমেনি, দিনের আলোর ছিটেফোঁটাও আর নেই, তবু তারই ভেতর বোঝা যায় ওটা একটা মানুষ। নিজের অজান্তে, হয়তো কোনও অপার্থিব শক্তি সাগিয়াকে ডুবন্ত লোকটার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু জলস্রোতে তাকে এত জোরে টেনে নিয়ে চলেছে যে সাগিয়া কোনওভাবেই তার কাছে পৌঁছতে পারে না। লোকটা ক্রমশ দূরে, আরও দূরে ভেসে যেতে থাকে।

সাগিয়ার ওপর অলৌকিক কিছু একটা যেন ভর করে। এই খ্যাপা নদীর মারাত্মক স্রোত থেকে কাউকে বাঁচাতে যাওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক, তার খেয়াল থাকে না। মরিয়া হয়ে দু'হাতে জল কেটে সে এগিয়ে যায় এবং অনেকক্ষণ যুঝবার পর শেষ পর্যন্ত লোকটার কাছে এসে তার কাঁধের কাছটা জামাসুদ্ধ ধরে ফেলে। সাগিয়া বুঝতে পারছিল তার নিজের নাকমুখ দিয়ে গল গল করে জল ঢুকে যাচ্ছে, পায়ের শিরায় টান ধরে গেছে। কিন্তু এখন কোনও কিছু ভাবার সময় নয়। নিজেকে এবং লোকটাকে স্রোতের ওপর ভাসিয়ে রেখে এবার সে পারের দিকে যেতে থাকে। মাঝে মাঝে চোরা ঘূর্ণি আর উঁচু উঁচু ঢেউ লোকটাকে ছিনিয়ে নিতে চায় কিন্তু সাগিয়া হাতের মুঠি মুহূর্তের জন্য আলগা করে না, তার হাত সাঁড়াশির মতো লোকটার কাঁধ চেপে ধরে থাকে।

জলস্রোতেব ওপর দিয়ে ভাসিয়ে ভাসিয়ে এক-সময় লোকটাকে যখন নদীর পার তুলে আনে তখন সাগিয়ার জীবনীশক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

নৌহর নদীর পার ধরে পঞ্চাশ হাত চওড়া বাদামি বালির ডাঙা চলে গেছে। লোকটাকে তুলবার পর বালির ওপর পড়ে হাঁপায় সাগিয়া। এতক্ষণ জলে থাকার কারণে তার হাত পা সিঁটিয়ে গেছে। শীতে গায়ের চামড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বৃষ্টির দাপট এবার কমে এসেছে, তবে একেবারে থামেনি, ঝির ঝির করে পড়েই যাচ্ছে। আকাশে মেঘ খানিকটা পাতলা হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ আগেও সমস্ত চরাচর মেঘে এবং বৃষ্টিতে এত ঝাপসা হয়ে ছিল যে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। এখন মেঘের স্তর ফাটিয়ে ফ্যাকাসে আলোর একটু আভা ফুটতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসে সাগিয়া এবং দু'হাত দূরে পড়ে থাকা সেই লোকটার দিকে চোখ পড়তে চমকে ওঠে। লোকটা আর কেউ না—উঁচু জাতের বড় বংশের শুদ্ধ নিষ্পাপ মানুষ বলে সাগিয়া যাঁকে মনে করেছিল—তিনিই।

কয়েক পলক মানুষটির দিকে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে সাগিয়া। তারপর হঠাৎ কোনও যান্ত্রিক নিয়মে তাঁর দিকে ঝুঁকে ডাকে, 'শুনিয়ে—শুনিয়ে—'

মানুষটি সাড়া দেন না, নড়াচড়ারও লক্ষণ নেই তাঁর।

দ্বিধান্বিতের মতো বসে থাকে সাগিয়া। হঠাৎ তার মনে হয় মানুষটি বেঁচে আছেন তো? আরো ঝুঁকে দ্রুত একটা হাত তাঁর না'কের তলায় নিয়ে আসে। অনেকক্ষণ পর পর তিরিতির করে একটু নিশ্বাস পড়ছে।

দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ অনেকটা কেটে যায় সাগিয়ার, ভেতরে ভেতরে সে আরাম বোধ করে। মানুষটি বেঁচেই আছেন। সে আবার ডাকতে থাকে, 'শুনিয়ে—'

এবারও উত্তর নেই।

হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হয় সাগিয়ার। মানুষটির কাঁধের কাছটা ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিতে থাকে, 'ইধর দেখিয়ে—' বলতে বলতে মুখটা আরও নামিয়ে আনে। মানুষটির চোখ পুরোপুরি বোজা। সাগিয়া টের পায়, একেবারে বেহুঁশ হয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে সে। একবার ভাবে, এই মানুষটি সম্পর্কে তার কোনও দায় নেই। প্রবল দুর্যোগের মধ্যে খ্যাপা নদী থেকে তাঁকে উদ্ধার করে পারে তুলে দিয়েছে। এরপর আর কী করতে পারে সে? পরক্ষণেই অসীম দায়িত্ববোধ সাগিয়ার মাথায় চেপে বসে। নিজেকে বারবার ধিক্কার দিয়ে ভাবে, এই অবস্থায় মানুষটাকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না। জ্ঞান ফেরার পর সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত সাগিয়াকে তাঁর কাছে থাকতেই হবে।

এখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। আকাশের যা চেহারা, মেঘ কিছুটা হালকা হলেও নতুন উদ্যমে আবার ধ্বংসের বাকি কাজটুকু যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে।

মানুষটি জলে কাদায় এবং বালিতে মাখামাখি হয়ে আছেন। এভাবে খোলা আকাশের নিচে পড়ে থেকে অনবরত ভিজতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ। যেমন করেই হোক তাঁকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

ভালো করে চারপাশ দেখে নেয় সাগিয়া। এই অঞ্চলটা তার অচেনা নয়। সে আন্দাজ করে নেয়, জনকপুরের দিকের পারঘাটা থেকে স্রোতের টানে প্রায় মাইলখানেক দক্ষিণে চলে এসেছে।

জায়গাটা ভয়ঙ্কর নির্জন। একটা মানুষও কাছে-দূরে কোথাও চোখে পড়ছে না। মানুষ দূরের কথা, পাখি-টাখি, জন্তু জানোয়ার, এমন কি পোকামাকড় পর্যন্ত নেই। অসময়ের এই প্রচণ্ড দুর্যোগে সবাই যেন নৌহরের আশপাশ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

একটা লোক পাওয়া গেলেও ধরাধরি করে মানুষটাকে পারঘাটা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু তার আর উপায় নেই। যা করার সাগিয়াকে একাই করতে হবে।

মানুষটার হাতে-পায়ের আঙুল এবং ঠোঁট সিঁটিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ জলে

ভেজার কারণে তাঁর গায়ের চামড়া অত্যন্ত সাদা আর রক্তশূন্য দেখায়।

সাগিয়া বুঝতে পারছে, মানুষটি প্রচুর জল খেয়েছিলেন। প্রথমেই তাঁর পেট থেকে জলটা বার করে দেওয়া দরকার। পিঠের দিকটা ধরে তাঁকে আস্তে আস্তে বসিয়ে দেয় সাগিয়া, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে, দুই হাত দু'দিকে এগিয়ে যায়। সেই অবস্থাতেই তাঁকে ঝাঁকাতে থাকে সাগিয়া। বার কয়েক ঝাঁকুনি দিতেই মুখ দিয়ে খানিকটা নীলচে জল বেরিয়ে আসে। এরপর তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠে চাপ দিতে থাকে সাগিয়া। এবার হড় হড় করে নাকমুখ দিয়ে প্রচুর জল বেরোয়।

গায়ে হাত ঠেকাতেই টের পাওয়া গিয়েছিল মানুষটির গা ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। যেমন করে হোক এর শরীরে উষ্ণতা ফিরিয়ে আনতে না পারলে বাঁচানোর আশা নেই। সাগিয়া মনস্থির করে ফেলে, মানুষটাকে পারঘাটায় নিয়ে যাবে। যত দুর্যোগই হোক, ওখানে পৌঁছে গেলে লোকজন পাওয়া যাবেই। এরকম বেহুঁশ একটি মানুষকে দেখলে কেউ নিশ্চয়ই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না, সবাই হাত বাড়িয়ে দেবে।

একটাই বাঁচোয়া, নদীর পারটা এবড়ো-খেবড়ো বা জলে কাদায় থকথকে নয়, ঝোপঝাড় জঙ্গলও নেই এখানে। মাইলের পর মাইল মসৃণ বাদামি বালি পাটির মতো পড়ে আছে।

সাগিয়া মানুষটিকে আবার তুলে বসিয়ে দেয়। আগের মতোই ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের ওপর নেতিয়ে পড়ে, হাত দুটোও শরীর থেকে আলগা হয়ে ঝুলতে থাকে। সাগিয়া মানুষটির দুই বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরে।

মাথার ওপর মেঘের ভারে নেমে আসা আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, পাশে ফুঁসতে থাকা খতরনাক নদী—এর মধ্যেই জেদি, একরোখা, অনমনীয় এক মেয়েমানুষ সম্পূর্ণ অচেনা এক বেহুঁশ পুরুষকে বালির ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে।

খানিকটা যাবার পর মানুষটিকে বালিতে শুইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ জিভ বার করে কুকুরের মতো হাঁপায় সাগিয়া। তারপর আবার টানতে থাকে। এইভাবে জনকপুরের দিকের পারঘাটায় যখন পৌঁছয়, তার জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পারঘাটার পাশে অনেকগুলো ঝাঁকড়া মাথা পিপর গাছ। সেগুলোর তলায় বেশ কয়েকটা দোকান। তবে কোনওটা চায়ের, কোনওটা পান-বিড়ি-খৈনির, কোনওটা লিট্টির, কোনওটা জিলাবি-গুলাবজামুন আর নমকিনের। দোকানগুলোর গা ঘেঁষে বয়েল গাড়ি আর সাইকেল রিকশা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা দিন এবং বেশ খানিকটা রাত পর্যন্ত মানুষজনের ভিড়ে জায়গাটা গমগম করে।

কিন্তু এই মুহূর্তে দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। একটা সাইকেল রিকশাও চোখে পড়ছে না। লোকজনও নেই। দুর্যোগের চেহারা দেখে সব উধাও হয়ে গেছে।

পারঘাটা এখন একেবারেই নিঝুম। শুধু দুটো বয়েল গাড়ি এখনও চলে যায়নি। নির্জন সুনসান পারঘাটায় ওরা কি আশায় দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে।

মানুষটাকে বালিতে শুইয়ে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে পিপর গাছগুলোর তলায় চলে আসে সাগিয়া। সাইকেল রিকশা নেই, বয়েল গাড়িতেই মানুষটিকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। তিনি কোথায় থাকেন—কোন টৌনে বা গাঁওয়ে, কী তাঁর নাম, সাগিয়া জানে না। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত জানার উপায়ও নেই।

সাগিয়া ঠিক করে ফেলেছে, মানুষটিকে জনকপুরের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে সে তাদের টৌলিতে চলে যাবে। কিন্তু বিনা ভাড়ায় বয়েল গাড়ির প্রাণীদুটো এক কদমও নড়বে না। এতক্ষণে সাগিয়ার মনে পড়ে নৌকোটা গোঁত খেয়ে উল্টে যাবার পর তার টিনের সুটকেসটা জলে ডুবে যায়। তবে জগনাথ চারদিনের মজুরি যে আশিটা টাকা দিয়েছে, সেটা কোমরে শাড়ির খুঁটে বেঁধে রেখেছিল। দ্রুত তার হাত সেখানে চলে যায়। টের পায় টাকাগুলো ওখানেই আছে।

একটা গাড়োয়ানেব সঙ্গে দশ টাকায় ভাড়া ঠিক করে সাগিয়া। তারপর দু'জনে ধরাধরি করে বেহুঁশ মানুষটিকে গাড়িতে তুলে ফেলে। চার চারটে দিন তার হাড়মাংস ডলে পিষে জগনাথ যা দিয়েছিল সেই কষ্টের মজুরি থেকে দশটা টাকা চলে যাবে। রীতিমত আক্ষেপই হয় সাগিয়ার। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই।

জনকপুর নোংরা, নগণ্য শহর। তার একধারে আরও নগণ্য, আরও নোংরা অতি হতচ্ছাড়া চেহারার হাসপাতালে পৌঁছে দেখা গেল, সেখানকার একমেব ডাক্তারটি নেই। পঞ্চাশ মাইল দূরে বিয়ের বরাত নিয়ে গেছে। আজ তো ফিরবেই না, কবে ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই। হাসপাতালে যারা আছে, ডাক্তারের হুকুম ছাড়া কাউকে ভর্তি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এদিকে বৃষ্টির দাপট কিছুক্ষণের জন্য কমে এলেও আবার প্রবল তোড়ে পড়তে শুরু করেছে। হাওয়ার জোরও বেড়ে গেছে কয়েক গুণ।

পারঘাটায় বয়েল গাড়িতে ওঠার সময় সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছিল। এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। মেঘের কারণে অন্ধকার এত ঘন যে মনে হয়, চারিদিকে কালো কালো নিরেট দেওয়াল খাড়া হয়ে আছে।

সাগিয়া ভেবে রেখেছিল, কোনওরকমে হাসপাতলে পৌঁছুতে পারলে তার দায়িত্ব শেষ। কিন্তু এখন সে কী করবে? এই সম্পূর্ণ অজানা মানুষটিকে নিয়ে কোথায় যাবে? দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে তার মাথার ভেতর যেন আগুনের চাকা ঘুরতে থাকে।

এদিকে বয়েল গাড়ির গাড়োয়ান ভাড়া চুকিয়ে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনবরত তাড়া দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই সাগিয়া স্থির করে ফেলে, মানুষটিকে

তাদের টোলায় নিয়ে যাবে। ভাড়ার ওপর আরও দু' টাকা বাড়তি দেবার কড়ারে গাড়োয়ান তাদের সেখানে পৌঁছে দেয়।

বেশ্যাপাড়াটা শহরের শেষ মাথায়। খান দশ বারো ধসে-পড়া টিনের চালের ফুটিফাটা ঘর নিয়ে এই টোলা। দু'সারিতে ঘরগুলো মুখোমুখি কোনওরকমে খাড়া হয়ে আছে, মাঝখান দিয়ে সরু প্যাচপেচে দমচাপা গলি। ঘরগুলোর হাল এমনই ঝরঝরে, যে-কোনও মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

জনকপুরের পয়সাওলাদের মহল্লায় বিজলি এসে গেছে, কিন্তু এদিকে তার চিহ্নমাত্র নেই।

বয়েল গাড়ির মাঝখানে ছইয়ের তলা থেকে সাগিয়া দেখতে পায় তাদের টোলার মুখে একটা ভাঙাচোরা টালির চালের তলায় সেজেগুজে বসে আছে মেয়েরা। বিজরি, শুগা, লছিমা, পঙ্খি, এমনি আট দশজন। দু-তিনটে কালি-পড়া লণ্ঠন জ্বলছে তাদের সামনে ।

অন্যদিন এই সময় চিটে গুড়ের গায়ে মাছির মতো একটা থিকথিকে ভিড় যেন এখানে আটকে থাকে। এই নরকে যারা আসে তারা হলো মাতাল, গাঁজাখোর, চোর-জোচ্চোর, খুনী এবং গরমী বা ক্ষয়রোগী। দুনিয়ার একেবারে নিচের স্তরের এই সব জঘন্য কৃমিকীটেরা ছাড়া রেণ্ডিটোলার ছায়া আর কেউ মাড়ায় না। কিন্তু আজ তারাও আসেনি।

বয়েল গাড়ি দেখে মেয়েগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এই দুর্যোগের মধ্যেও হয়তো একটি খদ্দের এসেছে। কিন্তু ছইয়ের তলা থেকে সাগিয়ার গলা শুনে তাদের উৎসাহ পুরোপুরি নিভে যায়। সাগিয়া ডাকতে শুরু করেছে, 'এ শুগা, এ লছিমা—তোরা জলদি এখানে আয়।'

কারও ওঠার লক্ষণ নেই। কর্কশ গলায় শুগা শুধু বলে, 'কায়?'

'একগো আদমীকে ধরে নামাতে হবে—পুরা বেহোঁশ।'

এবার মেয়েমানুষগুলোর চোখে-মুখে সামান্য ঔৎসুক্য ফুটে ওঠে। তারা পায়ে পায়ে উঠে আসে। ভাঙাচোরা চোয়াড়ে মুখ তাদের। রাতজাগার কারণে চোখের নিচে স্থায়ী কালির ছোপ। কোনওকালে এদের চেহারায় ছিরিছাঁদ এবং সামান্য লালিত্যও ছিল বলে মনে হয় না।

তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানের ভাড়া চুকিয়ে বেহুঁশ মানুষটিকে দেখিয়ে সাগিয়া মেয়েমানুষগুলোকে বলে, 'ধর—'

একজন জিজ্ঞেস করে, 'এ কৌন রে?'

সাগিয়া বলে, 'পরে বলব।'

দু'জন লণ্ঠন তুলে ধরে। বাকি ক'জন সাগিয়ার সঙ্গে ধরাধরি করে মানুষটিকে টোলার ভেতরে নিয়ে আসে।

সাগিয়ার ঘরের দেওয়াল মাটির। এক দেওয়ালে ছোট ছোট দুটো জানালা, সে দুটোর পাল্লা পেটানো টিনের। আরেক দেওয়ালে খেলো ক'টা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, সেগুলোতে গণপতি, দুর্গা রামচন্দ্রজি, বজরংবলী এবং শিবের ধ্যাবড়া-ধ্যবড়া ছবি। তার পাশাপাশি খবরের কাগজ এবং পুরনো ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে ফিল্মের প্রায়-উদোম লাস্যময়ী নায়িকাদের কিছু ছবি সেঁটে দেওয়া হয়েছে। দেব-দেবী এবং হিরোইনদের এই সহাবস্থানে কোনও পক্ষেরই বোধ হয় আপত্তি নেই। এক কোণে পুরনো ঘুণে-কাটা তক্তাপোষের একটি পায়া নেই, সেখানে ইট পেতে কাজ চালানো হচ্ছে।

তক্তাপোষে ময়লা বিছানা। দিন কয়েক সাগিয়া এখানে না থাকায় তার ওপর প্রচুর ধুলোটুলো জমেছে। তক্তাপোষটার তলায় এনামেলের তোবড়ানো হাঁড়িকুঁড়ি, টিনের তোরঙ্গ, শিশি বোতল, কৌটোবাটা, কাঠের বাক্স, সিলভারের কিছু বাসন-কোসন, এমনি নানা টুকিটাকি জিনিস ডাঁই হয়ে আছে। কোণের দিকে একটা কেরোসিন কাঠের আলনায় দু-চারটে শাড়ি ঝুলছে।

বেহুঁশ মানুষটাকে মেয়েমানুষগুলোর হাতে রেখে দ্রুত বিছানাটা ঝেড়ে, বাক্স থেকে পরিষ্কার চাদর বার করে পেতে দেয় সাগিয়া।বলে, 'শুইয়ে দে।' কথা বলতে বলতে ক্ষিপ্র হাতে তক্তাপোষের তলা থেকে লণ্ঠন বার করে ধরিয়ে নেয়।

মেয়েগুলো মানুষটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। শুগা বলে, 'বিলকুল ভিজে গেছে আদমীটা। কাপড়া উপড়া বদলে না দিলে বুখার ধরে যাবে।'

'হাঁ—' বলতে বলতে অসহায় চোখে এদিক সেদিক তাকায় সাগিয়া। তার ঘরে পুরুষের পরার মতো জামাকাপড় নেই।

লছিমা তার মনোভাব বুঝতে পেরে বলে, 'তোর শাড়িই পরিয়ে দে। এখন ধোতি ওতি কোথায় পাবি?'

সাগিয়া দ্রুত আলনা থেকে দুটো শাড়ি নামিয়ে আনে।

লছিমা একপাশ থেকে বলে, 'কাপড়া উপড়া খুলে নাঙ্গা করে শাড়ি পরা সাগি—' বলে অশ্লীল ভঙ্গি করে চোখ টিপে দাঁত বার করে হাসে। দশ বছর বয়েস থেকে নিয়মিত বিড়ি ফোঁকা এবং খৈনি খাওয়ার কারণে তার দাঁত এবং মাড়ি হেজে গিয়ে চিরস্থায়ী কালো ছোপ ধরে গেছে।

অন্য মেয়েমানুষগুলোও কুৎসিত শব্দ করে হাসে। সাগিয়া তাদের দিকে তাকায় না। প্রথমে একটি শাড়ি মানুষটির পেট থেকে নিচের অংশে চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে ভেজা ধুতির গিঁটটা খুলে তলার দিক থেকে টেনে নামিয়ে দেয়।

এতক্ষণ মেয়েগুলো ভালো করে মানুষটাকে লক্ষ করেনি। এবার তার মুখের দিকে চোখ পড়তে থমকে যায়। ফিস ফিস করে নিজেদের ভেতরে বলাবলি করে, 'বহোত খুবসুরত আদমী।'

আসলে এমন সুপুরুষ চেহারা মানুষ দুনিয়ার এই ওঁচা রেণ্ডিটোলায় আসে না। এমনিতেই সাগিয়ার সম্পর্কে এখানকার মেয়েমানুষগুলোর প্রচণ্ড ঈর্ষা। কারণ এখনও তার চেহারায় অনেকটাই চটক থেকে গেছে। বাজারে সাগিয়ার শরীরের প্রচণ্ড চাহিদা। এখানে যে-ই আসুক, সাগিয়ার জন্য সর্বস্ব দিতে রাজি। অন্য মেয়ে দু'টাকা পেলে সে পায় পাঁচ গুণ। সাগিয়া আবার সবাইকে তার বিছানায় তোলে না। 'বগুলা চুনি চুনি খায়'-এর মতো সে বেছে বেছে পছন্দমতো লোককে ঘরে ঢোকায়। কিন্তু অন্য মেয়েমানুষগুলোর পছন্দ অপছন্দই নেই। পোকায়-কাটা, পচা-গলা, ঘেয়ো চেহারার লোক এলেও বাছাবাছির ব্যাপার থাকে না। যে-ই আসুক খাতিরদারি করে ঘরে ঢোকাতে হয়। সব দিক থেকেই তারা সাগিয়ার কাছে মার খাচ্ছে। এমন-কি আজও বয়েল গাড়ি করে যাকে সাগিয়া নিয়ে এসেছে তার মতো সুন্দর আদমী তারা সারা জীবনে আদৌ আর দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না।। সাগিয়ার নতুন সৌভাগ্যে তাদের বুকের ভেতরটা হিংসেয় পুড়তে থাকে।

পঞ্ছি বলে, 'আদমীটা বহোত পাইসাবালা, না রে?'

মানুষটার পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে খুলতে সাগিয়া বলে, 'জানি না।'

'ঝুট।'

'কা ঝুট?'

'আদমীটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলি, আর বলছিস জানিস না! বাতা না, বাতা। আমরা কেউ ভাগ চাইব না, একগো পাইসা ভি নহী।'

সাগিয়া সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'বিশোয়াস কর, আমি আদমীটাকে আগে দেখিনি। একই নাওয়ে নদী পেরুবার সময় পয়লা দেখেছি।'

কিন্তু তার কথার একটি বর্ণও কেউ বিশ্বাস করে না। ঈর্ষার জ্বলতে জ্বলতে লছিমা বলে, 'তুই কি আর এই পচা নালিয়ায় পড়ে থাকবি? জরুর আদমীটা তোকে এখান থেকে নিয়ে পাকা কোঠিতে তুলবে, সোনাচাঁদিতে গা মুড়ে দেবে।'

সাগিয়া উত্তর দেয় না। হাজার বললেও এরা বুঝবে না। সে নিচু হয়ে লেপ্টানো পাঞ্জাবি এবং গেঞ্জি মানুষটার গা থেকে খুলে ফেলে।

ওধার থেকে শুগা আর বিলাখী কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চাপা গলায় লছিমা চেঁচিয়ে ওঠে, 'হো রামচন্দ্‌জি, এ কাকে নিয়ে এসেছিস—বামহন! এই নরকে বামহনকে নিয়ে এলি!' বলে মানুষটির খোলা গায়ে সাদা ধবধবে পৈতার মোটা গোছা দেখিয়ে দেয়।

সাগিয়া চমকে ওঠে। ব্রাহ্মণ সম্পর্কে আজন্মের সংস্কার তাকে মারাত্মক পাপবোধে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। অজান্তে সে কাকে রেণ্ডিটোলায় এনে তুলেছে!

ঘরের অন্য মেয়েগুলোও চুপ। সবারই ধারণা, এখানে একজন ব্রাহ্মণকে টেনে আনাটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

একসময় তোহরি নামের আওরতটা বলে, 'বামহন হলে কী আর করা! বেহুঁশ আদমীটাকে এখন তো আর বাইরে ফেলে দেওয়া যায় না। যা বারীষ, হুঁশ ফিরলে আর বারীষ থামলে রিকশা ডেকে তুলে দেওয়া যাবে।'

মোটামুটি তোহরির কথাটাই সবাই মেনে নেয়। এ-ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

দুর্যোগের রাতে অভাবনীয় একটি মানুষ সম্পর্কে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করে প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে মেয়েমানুষগুলো চলে যায়। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে রেণ্ডিটোলার এক জঘন্য বেশ্যার বিছানায় আবিষ্কার করে মানুষটির কী প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা ভাবতেও কারোর সাহস হয় না।

সবাই যাবার পর ঘরের এক কোণে গিয়ে ভেজা শাড়িটাড়ি বদলে নেয় সাগিয়া। তারপর আরেকটা শুকনো কাপড় নিয়ে তক্তাপোষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এই ঘরের বায়ুস্তরে এবং প্রতিটি জিনিসে লক্ষ কোটি পাপের বীজাণু থিক থিক করছে। কিন্তু একবার যখন মানুষটিকে এখানে এনে তুলেছে তখন তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। শুকনো শাড়ি দিয়ে মানুষটির মাথা এবং গা মুছে দিয়ে, আরেকটা চাদর বার করে গলা পর্যন্ত ঢেকে দেয় সে।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি চলছে। ঝাঁঝরা টিনের চাল যেন চুরমার হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে ঝড়ের দাপটও বাড়ছে, মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। তা'ছাড়া বাজের গর্জন এবং মেঘের ডাক তো আছেই।

সেই দুপুরবেলা নেকীপুর থেকে চার মাইল হেঁটে পারঘাটায় এসেছিল সাগিয়া। তারপর মাঝ নদীতে নৌকাডুবির পর থেকে যা যা ঘটেছে তাতে ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙেচুরে আসছে। কাঁধের কাছ থেকে হাতদুটো আর কোমরের তলার দিকটা একেবারে খসে পড়বে যেন। সেই সঙ্গে ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে, খিদেও পেয়েছে মারাত্মক। এখন চুলা জ্বেলে মাড়ভাত্তা বা দু-চারখানা বাজরার রোটি যে বানিয়ে নেবে সেটুকু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। একটা কৌটোয় চারটি শুকনো চিড়ে আছে। তাই চিবিয়ে এক পেট জল খেয়ে শুয়ে পড়বে।

চিড়ে বার করতে যাবার আগে আস্তে আস্তে ডাকে সাগিয়া, 'শুনিয়ে-শুনিয়ে—'

নাঃ, মানুষটির জ্ঞান এখনও ফেরেনি। চোখ তাঁর আগের মতোই বোজা।

কী ভেবে কপালে হাত রাখে সাগিয়া। বেশ গরম লাগছে। জ্বর আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

সাগিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোনওরকমে দুটি চিড়ে এবং জল খেয়ে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়তে পড়তে অদ্ভুত একটা কথা মনে হয়। এই ঘরে কোনও পুরুষ ঢুকেছে আর তার সঙ্গে সে এক বিছানায় শোয়নি, এটা ভাবা যায় না। একজন সুপুরুষ ব্রাহ্মণ তার নোংরা তক্তাপোষে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে এবং সে রয়েছে মেঝেতে, এমন অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম ঘটল। ভাবতে ভাবতে একসময় চোখ বুজে আসে তার।

হঠাৎ দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে চোখ মেলে সাগিয়া। ঘুমন্ত গলায় বলে, 'কৌন?'

বাইরে দুর্যোগ চলছেই, টিনের চালে হাজারটা বুনো ঘোড়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে—এমনই বৃষ্টির তোড়।

ঝড়বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে জড়ানো মাতালের গলা ভেসে আসে, 'তোহরকা বাপ শালী রেণ্ডি। দরবাজা খোল—'

চেনা গলা, নাম তরজুলাল। লোকটা জনকপুরে টাঙা চালায়। খুব বদমেজাজী এবং খতরনাক। রোজ একটা না একটা ঝামেলা পাকিয়েই যায়। সারাদিন দারু খেয়ে টং হয়ে থাকে। কথায় কথায় ছুরি চালিয়ে দেয়। এই সব কারণে বার কয়েক জেলও খেটেছে।

সাগিয়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আজ চলা যাও—'

শরাবীর গলা কয়েক পর্দা উঁচুতে চড়ে, 'খোল বলছি রেণ্ডি, না হলে লাথ মেরে দরবাজা তুড়ে ঢুকব।'

একপলক ইতস্তত করে সাগিয়া। তক্তাপোষে শায়িত মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঘরে আদমী আছে। আজ যাও—'

কিছুক্ষণ বিপুল তোড়ে খিস্তি করে যায় তরজুলাল। তারপর বলে, 'এই বারীষে কুত্তা বিল্লি বেরুতে পারে না, আর তুই শালী পাসিঞ্জার ঢুকিয়ে ফেললি! ভুচ্চরকা ছৌরী।' এরপর নতুন উদ্যমে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে সে চলে যায়।

আরও কিছুক্ষণ পর আবার দরজায় ধাক্কা। এবার এসেছে গাঁজা-ভাংয়ের দোকানের মালিক ভৈরোনাথ। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে কুকুর-বেড়াল বেরুতে না পারলেও রেণ্ডিটোলার খদ্দেররা ঠিকই বেরিয়ে পড়ে। মানুষের চেয়ে নোংরা জানোয়ার পৃথিবীতে জন্মায়নি।

ভৈরোনাথকেও ভাগিয়ে দেয় সাগিয়া। এমন দুর্দান্ত দুর্যোগের রাতটা বিলকুল বিফলে যাবে, এটা ভাবতে পারেনি সে। তরজুলালের মতো ভৈরোনাথও অকথ্য

খিস্তি দিতে দিতে চলে যায়।

তারপর কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, সাগিয়াব খেয়াল নেই। আচমকা গোঙানির শব্দে সে ধড়মড় করে উঠে বসে। শোওয়ার আগে লণ্ঠনটা নিভু নিভু করে রেখেছিল, চাবি ঘুরিয়ে আলোর তেজ বাড়াতেই চোখে পড়ে তক্তাপোষে সেই মানুষটি ছটফট করছেন, আর মাঝে মাঝেই কাতর শব্দ করে উঠছেন।

দ্রুত উঠে গিয়ে তক্তাপোষের পাশে দাঁড়ায় সাগিয়া। অনেকটা ঝুঁকে ডাকতে থাকে, 'শুনিয়ে, শুনিয়ে—'

মানুষটি চোখ মেলে তাকান, কিন্তু উত্তর দেন না। ঘোর-লাগা লাল টকটকে চোখ তাঁর। বিড় বিড় করে কী বকে যান। তাঁর কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠে সাগিয়া। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কী করবে, ভেবে পায় না সাগিয়া। শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে বাইরে এসে পাশের ঘরের তোহরির ঘুম ভাঙিয়ে মানুষটির নতুন উপসর্গের কথা জানায়। তারপর উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'অব্ কা করে?'

মাঝরাতে ঘুম ভাঙাবার জন্য প্রথমটা খেপে গিয়েছিল তোহরি। তারপর সবটা শুনে একটু নরম হয়ে বলে, 'তোর কাছে পাইসা আছে?' পরক্ষণে ফের কী ভেবে বলে, 'আছেই তো। নেকীপুরের লকড়িবালার কাছ থেকে বহোত কামাই করে এসেছিস।'

জগনাথের দেওয়া মজুরি থেকে বারোটা টাকা এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। সাগিয়া ভেবেছিল কোনওরকমে হুঁশ ফিরলেই মানুষটিকে রিকশা ডেকে তুলে দেবে। কিন্তু এখন সে অথৈ দরিয়ার গিয়ে পড়ল। প্রথমত, ক'দিনে জ্বর সারিয়ে মানুষটিকে চাঙ্গা করতে পারবে তার ঠিক নেই। দ্বিতীয়ত, এঁর জন্য হাতের পুঁজি কিছুই খুব সম্ভব আর থাকবে না। তা ছাড়া তার একটি মাত্র ঘর। একটা লোক তক্তাপোষ জুড়ে পড়ে থাকলে খদ্দের ঢোকানো যাবে না। মানুষটা যত দিন থাকবেন, তার কামাই বন্ধ।

সাগিয়ার মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল তোহরি। সহানুভূতির গলায় এবার বলে, 'বৈদ ডাকতে হবে।। নইলে জলদি জলদি বামহনকে সারিয়ে বাড়ি পাঠানো যাবে না।'

সাগিয়া তার একটা হাত ধরে বলে, 'চল বৈদকে ডেকে আনি।'

তোহরি অবাক; 'এত্তে বারীষমে!'

'হাঁ। আদমীটার বহোত বুখার—'

তোহরি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। এই ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টিতে এবং এত রাত্তিরে বৈদ বা ডাক্তারকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বার করে আনা

যাবে না।

পরদিন সকালে দুর্যোগ অনেকটা কেটে যায়। বৃষ্টি যদিও অল্প অল্প পড়ছে, আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। পাতলা, ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু মেঘ অবশ্য এখনও চোখে পড়ে।

কাল বাকি রাতটুকু আর ঘুমোয়নি সাগিয়া। কাছে বসে অসহায়ভাবে মানুষটির একটানা গোঙানি শুনে গেছে। রোগকাতর অচেতন মানুষটিকে নিয়ে সে কী করবে ঠিক করে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। তারপর দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই বৈদ সহায়জিকে ডেকে এনেছে।

পাওনলাল সহায় জাতে কায়াথ বা কায়স্থ হলেও রেণ্ডিটোলার বাসিন্দারা ডাকলে চলে আসে। এই কারণে জনকপুরের উঁচা জাতের লোকেরা রোগ-বীমার হলে তার কাছে যায় না, তাকে একরকম একঘরে অচ্ছুত করে রেখেছে। কিন্তু পাওনলাল প্রচণ্ড বেপরোয়া, দুর্জয় সাহস তার। সে বলে, বৈদের কাছে যে রোগীই আসুক, তার চিকিৎসা না করাটা পাপ। বেশ্যা আসুক, ধাঙড় আসুক, চামার আসুক, কাউকেই ফেরায় না পাওনলাল। ডোম-দোসাদ-মেথর, চোর-ডাকু, অসুস্থ হয়ে যে-ই ডাকুক সে ছুটে যায়। এতে কে কী ভাবল, কে কী বলল, গ্রাহ্যই করে না।

মাঝবয়সী পাওনলালের গায়ে শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস থাকে ধুসো আলপাকার কোট। পরনের ধুতিটা এতই খাটো যে হাঁটুর আধ হাতের বেশি নামেনি। কাঁচাপাকা চুল চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা, পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারি জুতো। কোটের বুক পকেটে কালো কারে বাঁধা পুরনো আমলের গোল ঘড়ি। দাড়ি কামানোর সময়-টময় বিশেষ পায় না। তাই গালে আট-দশ দিনের খাপচা খাপচা দাড়ি প্রায়ই জমে থাকে। কোথাও বেরুলে তার হাতে একটা ঢাউস টিনের বাক্স ঝোলে। পাওনলালের চিকিৎসার নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি নেই। কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি এবং অ্যালোপ্যাথি—তিন রকম নিয়মই দরকারমতো কাজে লাগায়, তার বাক্সে কবিরাজি বড়ি যেমন আছে, হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের কাঁড়ি কাঁড়ি শিশি এবং অ্যালোপ্যাথিক ট্যাবলেট আর ইনজেকশনের সরঞ্জামও তেমনি রয়েছে। রোগ সারানোটাই আসল কথা, কোন নিয়মে, কী পদ্ধতিতে সারানো হলো, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আদৌ দরকার নেই।

সাগিয়ার ঘরে ঢুকে তক্তাপোষে শায়িত মানুষটির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে পাওনলাল বৈদ। বলে, 'সর্বনাশ, এ কাকে এনে তুলেছিস!'

পাওনলাল আসার খবরটা এখানকার ছোট্ট রেণ্ডিটোলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই এসে সাগিয়ার ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ায়।

সাগিয়া ভয়ে ভয়ে শুধোয়, 'কাকে এনেছি!'

পাওনলাল বলে, 'ইনি শাস্ত্রীজি—রামসীতা মন্দিরের বড় পূজারি শিউশঙ্কর

শাস্ত্রী।' তারপর একটানা যা বলে যায় তা এইরকম। শিউশঙ্করের মতো আজীবন ব্রহ্মচারী, এমন সৎ, পবিত্র এবং শাস্ত্রজ্ঞ ভূভারতে আর একজনকেও পাওয়া যাবে না। জনকপুরে, শুধু জনকপুরে কেন, আশেপাশে একশো মাইলের মধ্যে তাঁর মতো শ্রদ্ধেয়, তাঁর মতো সম্মানিত মানুষ দ্বিতীয় কেউ নেই। শাস্ত্রীজির পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব কিছু শুদ্ধ। এমন একটি মানুষকে এই নরকে টেনে এনে তাঁর মারাত্মক ক্ষতি করা হয়েছে। খবরটা জানাজানি হলে শিউশঙ্করের সুনাম এবং মর্যাদা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তা'ছাড়া জনকপুরের মানুষ সাগিয়াদের ছেড়ে দেবে না। রামসীতা মন্দিরের মাননীয় পুরোহিতকে রেণ্ডিটোলায় টেনে এনে ভ্রষ্টাচারের পথে ঠেলে দেবার কারণে তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

সাগিয়ারা শিউশঙ্করকে আগে না দেখলেও তাঁর নাম প্রচুর শুনেছে। জনকপুরের হাওয়ায় ভেসে ভেসে তাঁব মহত্ত্ব এবং ব্রহ্মচর্যের নানা খবর এই নরক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

সাগিয়া শিউরে ওঠে। দরজার বাইরে অন্য মেয়েমানুষগুলো ভয়ে কাঁপতে থাকে।

সবার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন হাতজোড় করে করুণ মুখে সাগিয়া বলে, 'হামনিকা কোই কসুর নহী পাওনজি—' তারপর কীভাবে, কোন অবস্থায়, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই নৌহর নদী থেকে শিউশঙ্করকে তুলে এনেছে, সব কিছু কাঁপা ভয়ার্ত গলায় বলে যায়।

কঠোর মুখ করে তাকিয়ে ছিল পাওনলাল। সব শোনার পর তাঁর কাঠিন্য অনেকটা কেটে যায়। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ, ওই অবস্থায় ফেলে আসা যায় না। পরে শাস্ত্রীজিকে এর প্রায়শ্চিৎ করে নিতে হবে।' বলতে বলতে শিউশঙ্করের কপালে একটা হাত দিয়েই সরিয়ে নেয়। টিনের বাক্স থেকে থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপ ইত্যাদি বার করে প্রথমে জ্বরটা দেখে, তারপর স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক পিঠ পরীক্ষা করে বলে, 'জ্বর তো অনেক। সুই (ইঞ্জেকশন) দিতে হবে।' বলে, তক্ষুণি সিরিঞ্জ এবং ওষুধের অ্যাম্পুল বার করে শিউশঙ্করের ডান হাতে ইঞ্জেকশন দেয়। তারপর এক গাদা বড়ি দিয়ে বলে, 'হুঁশ ফিরলে সকালে দুপুরে আর সন্ধ্যায় তিন বার দুটো করে খাওয়াবি।'

'জি—' ঘাড় হেলিয়ে দেয় সাগিয়া।

'দুপুরের মধ্যেই হুঁশ ফিরে আসবে। তখন গরম দুধ খাইয়ে দিস। রাতে এসে আমি আরেকটা সুই দিয়ে যাব।'

'লেকেন পাওনজি—'

'কী?'

'শাস্ত্রীজিকে কি আমার খাওয়ানো ঠিক হবে?'

পাওনলাল বুঝতে পারে, নিজের ছোঁয়া দুধ খাওয়াতে চাইছে না সাগিয়া। বলে, দুঃসময় উপায় না থাকলে খাওয়াতে দোষ নেই। তবে দুধ ছাড়া অন্য কিছু, যেমন ভাত, রোটি একেবারেই যেন দেওয়া না হয়। এমনিতেই পূর্বজন্মের কোনও পাপের কারণে এই নরকে আসতে হয়েছে শিউশঙ্করকে। বেশ্যার ছোঁয়া অন্ন তাঁর পবিত্র শরীরে ঢুকলে মৃত্যুর পর তাঁর যে নরকবাস হবে তা অনন্ত। সে-পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই।

সাগিয়া আঁতকে উঠে বলে, 'নহী নহী, মরে গেলেও ভাত খাওয়াব না।'

'আর একটু সুস্থ হলেই শাস্ত্রীজিকে পাঠিয়ে দিবি। দেখিস কেউ যেন এখান থেকে তাঁকে বেরুতে না দ্যাখে।'

'হাঁ।'

'এবার দশটা টাকা দে। আমার ফী, রিক্‌শাভাড়া, দাওয়াই আর সুঁই-এর দাম।'

পাওনলাল লোকটা যেমন হিসেবি তেমনি হুঁশিয়ার। নিজের পাওনাকড়ি বুঝে নিয়ে সে চলে যায়।

তারপর রেণ্ডিটোলার বাসিন্দাদের মধ্যে একটা গোপন পরামর্শ-সভা বসে। প্রথমে তারা এটুকুই জেনেছিল, বেহুঁশ মানুষটা ব্রাহ্মণ। তাতেই তাদের আজন্মের সংস্কারে ধাক্কা লাগে। কিন্তু পাওনলালের কাছে যখন জানতে পারল মানুষটি শিউশঙ্কর শাস্ত্রী—তখন থেকেই উৎকণ্ঠা, শঙ্কা এবং চাঞ্চল্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। পাওনলালের কথামতো তারা ঠিক করে ফেলে, শাস্ত্রীজি যখন এখানে এসেই পড়েছেন, তাঁর মর্যাদা এবং সম্মান যাতে এতটুকু নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখবে। সন্ধে নামতে না নামতেই এখানে চোর বজ্জাত শরাবী ইত্যাদি ইত্যাদি যত হারামজাদের ছৌয়ারা ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে থাকে। যে-ক'দিন শাস্ত্রীজি থাকবেন, তাদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাইরের লোক এখানে আসা মানেই শাস্ত্রীজির খবরটা চারিদিকে চাউর হয়ে যাবে। তাঁর মুখে চুনকালি লাগে, এমন কাজ তারা হতে দেবে না।

দুপুরবেলা মেঘ কেটে টলটলে সোনালি রোদ বেরিয়ে পড়ে। ঝির ঝির করে হাওয়া বইতে থাকে। আজ আকাশের দিকে তাকালে কে বলবে, কাল ওই রকম একটা মারাত্মক দুর্যোগ এই অঞ্চলটার ঘাড় মুচড়ে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে।

তোহরি আর লছিমার ঘরে দুটো বড় বোতলে গঙ্গাজল ছিল। কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তুলে তাতে গঙ্গাপানি মিশিয়ে মেয়েমানুষগুলো প্রথমে পুরো রেণ্ডিটোলাটা ধুয়ে ফেলে।

শুধু তাই না, কয়েক মাস আগে দুটো স্টিলের ঢাকনাওলা বড় বাটি কিনেছিল

সাগিয়া। সে দুটো আনকোরা নতুনই রয়ে গেছে। বাক্স থেকে একটা বাটি বার করে কাছাকাছি এক খাটাল থেকে টাটকা দুধ এনে জ্বাল দিয়ে রাখে। শাস্ত্রীজির হুঁশ ফিরলে খাওয়াতে হবে।

পাওনলাল বৈদ যা বলেছিল, অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। দুপুরের কিছুক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরে আসে শিউশঙ্করের। লাল টকটকে চোখ মেলে সাগিয়ার দিকে তাকান তিনি। ঘোরলাগা জড়ানো গলায় বলেন, 'তুমি কে?'

বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাক সাগিয়ার। আবছা গলায় বলে, 'আমাকে চিনবেন না।'

আর কোনও প্রশ্ন করেন না শিউশঙ্কর। আস্তে আস্তে আবার তাঁর চোখ বুজে আসে।

ফিসফিস করে সাগিয়া ডাকে, 'শুনিয়ে, দুধ পী—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায়।

শিউশঙ্কর সাড়া দেন না, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেই ঘুম সহজে ভাঙতে চায় না।

একসময় বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শরাবী জানোয়ারেরা ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে থাকে। তোহরি, লছিমা, শুগা এবং আরও কয়েকটি মেয়েমানুষ তাদের ভাগিয়ে দেয়। ফুর্তি করতে যারা এসেছিল, আশাভঙ্গের কারণে খিস্তি করতে করতে তারা চলে যায়।

একজন বলে, 'কা রে, সতী পার্বতী বন গয়ী? শালী রেণ্ডি—'

আরেকজন বলে, 'বেওসা বন্ধ্ কর দিয়া? ইধরি মন্দির বনেগা—কা?'

যাদের উদ্দেশে বলা, তারা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না।

রাতে পাওনলাল আবার আসে। রোগী সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আরেকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে জ্বরটা অনেক নেমে যায় শিউশঙ্করের, বিকেলের সেই ঘুমটাও ভাঙে। তার চোখে সেই ঘোর ঘোর ভাব অতটা আর নেই। তিনি দেখতে পান তক্তাপোষের পাশে নিচের ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকজন মেয়েমানুষ বসে আছে। তাদের চোখেমুখে ভয়, উদ্বেগ এবং গভীর দুর্ভাবনার ছাপ। তিনি জানেন না, এই মেয়েমানুষেরা আজ প্রায় সারা দিনই এখানে পালা করে বসে আছে। মাঝে মাঝে দু-একজন উঠে গিয়ে কোনওরকমে দুটো চালডাল ফুটিয়ে, খানকতক রোটি সেঁকে নাকেমুখে গুঁজে এসেছে। আর শরাবীরা যখন সদর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল তখন শুধু বার কয়েক উঠে গিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে।

শিউশঙ্কর অবাক নির্জীব চোখে প্রতিটি মেয়েকে দেখতে দেখতে বলেন 'তোমরা কারা?'

সাগিয়াই উত্তর দেয়, 'আমরা কেউ না দেওতা।'

'আমি এ ঘরে এলাম কী করে? এখানকার কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

সাগিয়া বলে, 'ঝড়তুফানে কাল নৌহর নদীতে নৌকোডুবি হয়েছিল—মনে আছে?'

আস্তে মাথা হেলান শিউশঙ্কর, 'হাঁ। তুমি জানলে কী করে?'

'আমি সেই নৌকোয় ছিলাম।'

'আমি খেয়াল করিনি।'

সাগিয়া এবার জানায়, তুফানে নৌকো উল্টে যাবার পর সে কীভাবে শিউশঙ্করকে এখানে নিয়ে এসেছে।

কৃতজ্ঞ চোখে সাগিয়ার দিকে তাকান শিউশঙ্কর। বলেন, 'তুমিই তাহলে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ! ভগোয়ান রামচন্দ্রজি তোমার কল্যাণ করবেন।'

সাগিয়া এবার ভয়ে ভয়ে বলে, বৈদজি ডেকে শিউশঙ্করকে দেখানো হয়েছে এবং দু-দু'বার সুইও দেওয়া হয়েছে। বৈদ প্রচুর দাওয়াই দিয়ে গেছে, এবং বলেছে রোগীর হুঁশ ফিরলে যেন দুধ খাওয়ানো হয়। নইলে শরীরে তাগদ আসবে না। তিনি কি এখন দুধ খাবেন?

মাথা নাড়েন শিউশঙ্কর, অর্থাৎ খাবেন।

সাগিয়া ভয়ে ভয়ে বলে, 'লেকেন—'

'কী?'

'আমি—আমাদের ছোঁয়া কি খাবেন?'

মৃদু হাসেন শিউশঙ্কর, 'খাব না কেন? নিয়ে এস। ভুখ লাগছে।'

'আমরা—আমরা নরকের পোকা দেওতা। আর এটা দুনিয়ার সব চেয়ে নোংরা জায়গা।' বলতে বলতে সাগিয়ার ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

এতক্ষণে শিউরে ওঠেন শিউশঙ্কর। আবহমান কালের সংস্কারে তাঁর চোখমুখ এবং শরীরের মাংসপেশী কুঁকড়ে যেতে থাকে। অসহ্য কষ্টে তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

শিউশঙ্করের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মারাত্মক ভয় পেয়ে যায় ঘরের সব ক'টি মেয়েমানুষ। রুদ্ধশ্বাসে তারা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যান শিউশঙ্কর। স্নিগ্ধ হেসে বলে, 'তুমি আমার জীবন দিয়েছ। দুধ নিয়ে এস।'

সাগিয়া এবং অন্য মেয়েমানুষগুলোর রক্তের ভেতর দিয়ে বিজরি চমকে যায়। সাগিয়া দৌড়ে দুধের বাটিটা নিয়ে এসে আস্তে আস্তে তাঁর মুখে ঢেলে দিতে থাকে। অন্য মেয়েগুলো হাতজোড় করে বসে থাকে। দুধ খাওয়ার পর ওষুধ খেয়ে ফের

ঘুমিয়ে পড়েন শিউশঙ্কর।

পরদিন সকালে অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন শিউশঙ্কর। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে সাগিয়াকে বলেন, 'একটা রিকশা ডেকে দাও, এবার আমি যাব।'

সাগিয়া আঁতকে ওঠে, 'লেকেন—'

'কী হলো?'

'এই দিনেব বেলা আপনাকে এই নরক থেকে বেরুতে দেখলে জনকপুরের আদমীরা কী বলবে!'

'কে কী বলল, কে কী ভাবল, এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তোমরা, বিশেষ করে তুমি আমার প্রাণ দিয়েছে, এটা মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে।'

সাগিয়া বলল, 'কিরপা করে এই নরকের কথা মনে রাখবেন না।'

কিছুক্ষণ পর রেণ্ডিটোলার বাইরের রাস্তায় একটা সাইকেল রিকশায় গিয়ে ওঠেন শিউশঙ্কর। সাগিয়া এবং অন্য মেয়েমানুষগুলো হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরে রিকশা চলতে শুরু করে।

মেয়েমানুষগুলো ভাবে, একটি দিনের জন্য এখানে স্বর্গের পবিত্রতা নেমে এসেছিল। এরপর আহ্নিক এবং বার্ষিকগতির নিয়মে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আসবে যাবে, কিন্তু এই দিনটি আর কখনও ফিরে আসবে না। হয়তো গুছিয়ে এইভাবে তারা ভাবতে পারছে না, তবে ভাবনাটা মোটামুটি এই রকমই।

আর চলতে চলতে সাগিয়ার মুখটাই শুধু মনে পড়ছে শিউশঙ্করের। সে বার বার নরকের কথা বলছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে স্বর্গ এবং নরকের মাঝখানের সীমারেখাটা যেন ধরতে পারছিলেন না শিউশঙ্কর।



তিন

মল্লিকা

নরিম্যান পয়েন্টের ছাব্বিশতলা অফিস বাড়িটার টপ ফ্লোর থেকে গ্যালপিং লিফটটা মাঝে মাঝে থেমে থেমে ধাঁ-ধাঁ করে নিচে নেমে যাচ্ছিল। ঝিঁঝির ডাকের মতো তার মৃদু একটা শব্দ হচ্ছে।

লিফট বক্সের ভেতর মোটে দু'টি মানুষ—সোমনাথ চ্যাটার্জি আর ধীরাজলাল দেশাই। কেননা তখন প্রায় সাতটা বাজে। এই ছাব্বিশতলা স্কাই স্ক্রেপারটার সবগুলো ফ্লোরে যত অফিস-টফিস আছে, অনেক আগেই ছুটি হয়ে গেছে। সুতরাং লিফটে ভিড় না থাকাই স্বাভাবিক।

তবে পাঁচটায় গোটা অফিসবাড়ি ফাঁকা হয়ে গেলেও সোমনাথকে সাতটা আটটা পর্যন্ত থাকতে হয়। তার কারণ কাজের প্রচণ্ড চাপ। মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের যে বিভাগটির সঙ্গে ইমপোর্ট এক্সপোর্ট জড়িত, সোমনাথ তার একজন বড় অফিসার। ওয়েস্টার্ন রিজিওনের সে প্রায় সর্বেসর্বা। তার অফিস এই বিশাল বাড়িটার টপ ফ্লোরে।

সোমনাথের বয়স তেঁতাল্লিশ চুয়াল্লিশ। তবে তিরিশ-টিরিশের বেশি দেখায় না। ছ'ফিটের ওপর হাইট, মেরুদণ্ড টান টান; চাওড়া মজবুত কাঁধ। হঠাৎ দেখলে তাকে বাঙালি বা ভারতীয় মনে হয় না। তার গায়ের লালচে রঙে, নীলাভ চোখে এবং পাতলা ভুরুতে ইউরেশিয়ান টাচ আছে।

মাত্র তিন মাস হল সোমনাথ বম্বে রিজিওনে এসেছে, তার আগে সে ছিল দিল্লিতে।

সোমনাথের সঙ্গী ধীরাজ দেশাই অবশ্য এ অফিসের কেউ না। তবে সোমনাথের কাছে তার দরকার আছে।

ধীরাজের বয়স ছাপ্পান্ন-সাতান্ন। গায়ের রং টকটকে। চওড়া কপাল, কাটাকাটা মুখ, তীক্ষ্ণ নাক সামনের দিকে বাঁকানো। বাজপাখির মেলে-দেওয়া ডানার মতো ঘন ভুরুর তলায় তার ধূর্ত চতুর চোখ। গায়ে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। পরনে নিখুঁত ইংলিশ স্যুট, তার সঙ্গে মাথায় গুজরাটি টুপি। লোকটার ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিরাট বিজনেস, ফ্লোরা ফাউন্টেনের কাছে তার প্রকাণ্ড অফিস। ওই ব্যাপারেই সোমনাথের কাছে আসে সে।

তিন মাস আগে যেদিন সোমনাথ বম্বে রিজিওনে এল তার দু'দিন পর থেকেই

লোকটা নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে। ইমপোর্ট এক্সপোর্টের পারমিট সংক্রান্ত এমন কিছু সুবিধা সে চায় আইনসঙ্গতভাবে তা দেওয়া সম্ভব না। লোকটা আভাসে-ইঙ্গিতে মোটা ঘুষের কথা জানিয়েছে, সোমনাথ আমল দেয় নি। অফিসার হিসাবে সে অত্যন্ত স্ট্রিক্ট। তবু লোকটা রোজই আসে। সোমনাথ বিরক্ত হয় খেপে উঠেও একেক দিন তাড়িয়ে দেয়। লোকটাব কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য, কখনও সে উত্তেজিত হয় না। শান্ত ঠাণ্ডা মুখে একটু হেসে বিদায় জানিয়ে চলে যায়, কিন্তু পরের দিন বেয়ারা এসে আবার তার স্লিপ দেয়। নাছোড়বান্দা পোকার মতো লোকটা সোমনাথের গায়ে আটকে আছে।

অন্য দিন এসে পারমিট-টারমিটের কথা তুলে ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকে ধীরাজ দেশাই। আজ কিন্তু সে ধারই মাড়ায় নি সে। কিছুক্ষণ আগে সোমনাথের চেম্বারে ঢুকে তার কোঁচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছে, 'আপনাকে আর ডিসটার্ব করব না স্যার—'

সোমনাথ অবাক হয়ে গেছে। তারপর হালকা বিদ্রূপের গলায় বলেছে, 'হঠাৎ আমার এরকম সৌভাগ্য?'

'তিন মাস আপনাকে দেখছি। তাতে মনে হয়েছে আপনি স্ট্রিক্ট প্রিন্সি পল্-এর অফিসার। আনডিউ কোনও প্রিভিলেজ আপনার কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। পারমিটের আবদার করে আপনাকে আর বিব্রত করছি না।'

'ধন্যবাদ।'

'তবে আমার একটা আর্জি আছে।'

'বলুন—'

'উই ক্যান বী গুড ফ্রেণ্ডস। এতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

সোমনাথের কোঁচকানো ভুরু এবার সহজ স্বাভাবিক হয়েছে। সরলভাবে হেসে সে বলেছে, 'আরে না না, আপত্তি থাকবে কেন?'

ধীরাজ দেশাই এবার বলেছে, 'তবে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে আমরা চা খাব আর পারমিট ছাড়া এনি ড্যাম থিং ইন দা ওয়ার্ল্ড—ধরুন পলিটিকস, করাপসান, ন্যাশনাল ক্যারেক্টার, স্পোর্টস, সেক্স—নিয়ে চুটিয়ে গল্প করব।'

সোমনাথের স্নায়ুর ওপর অস্পষ্ট ছায়া পড়েছে। লোকটা তাকে কোনওরকম ফাঁদে ফেলতে চায় না তো? সোমনাথ খবর পেয়েছে, লাখ লাখ টাকা ধীরাজ দেশাইর, মালটিমিলিওনেয়ার বলতে যা বোঝায় সে তা-ই। বম্বের যত দামি দামি ফ্যাশনেবল পাড়া—মালাবার হিল, ওরলি, জুহু, ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড—সব জায়গায় তার ফ্ল্যাট আছে। আর আছে গণ্ডা গণ্ডা ইম্পোর্টেড গাড়ি। লোকটা ইচ্ছা করলে

সোমনাথের মতো লোককে আরদালি রাখতে পারে। তবু তার কাঁচুমাচু মুখ, তেলতেলে মোলায়েম হাসি আর হাত কচলানোর বহর দেখে মনে হচ্ছিল সোমনাথ এক কাপ চা খেলে লোকটা হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে যাবে।

চা খাইয়ে ধীরাজ তাকে আর কতটা ফাঁদে ফেলতে পারে? 'দেখাই যাক কী হয়, ' এমন গোছের একটা মনোভাব সোমনাথের মধ্যে কাজ করে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সে ধীরাজের সঙ্গে চা খেতে আড্ডা দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

তিন মিনিটও লাগল না, গ্যালপিং লিফট্‌টা সোজা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এল। বাইরে বেরুতেই দেখা গেল বম্বে শহরের ওপর সন্ধ্যা নেমে গেছে। চারিদিকে কালো জামদানি শাড়ির মতো অন্ধকার ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এখান থেকে বাঁ দিকে চোখ ফেরালে আরব সাগর। সামনে মেরিন ড্রাইভের রাস্তাটা আধখানা বৃত্তের মতো বেঁকে মালাবার হিলসের দিকে চলে গেছে। পেছনে ব্যাক বে রিক্লামেশনের নতুন স্কাই স্ক্রেপার কমপ্লেক্স—কুড়িতলা, বাইশতলা, আটাশতলা, তিরিশতলা, অগুনতি হাইরাইজ সেখানে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই মুহূর্তে মেরিন ড্রাইভের রাস্তায় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মার্কারি আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। দূরে উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায়, মেরিন লাইন্সের ফ্লাইওভারে কিংবা চৌপট্টির ওভার ব্রিজটার গায়ে নানা কোম্পানির অসংখ্য রঙিন নিওন জ্বলছে।

ঘাড়ের পাশ থেকে ধীরাজ দেশাই বলে উঠল, 'একটু কষ্ট করে আসুন স্যার, আমার গাড়িটা ওখানে রয়েছে।' খানিকটা দূরে রাস্তায় পার্কিং জোনে আঙুল বাড়িয়ে দিল সে।

অফিস থেকে সোমনাথকে একটা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। ধীরাজ দেশাইর সঙ্গে চা খেতে যাবে বলে নিজের গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল সে। কথা আছে, চা খাবার পর ধীরাজই তাকে তার কোলাবার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে।

পাশাপাশি যেতে যেতে ধীরাজ দেশাই আবার বলল, 'কোথায় বসে চা খাবেন বলুন? সাতটা ক্লাবে আমার মেম্বারশিপ আছে। এই ক্লাবগুলোর একটা হল মালাবার হিলসে, একটা গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে, একটা ওরলিতে, একটা জুহুতে—'

হাত তুলে ধীরাজ দেশাইকে থামিয়ে দিল সোমনাথ। বলল, 'আপনার যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চলুন। তবে দু'ঘণ্টার বেশি আমি থাকতে পারব না। এখন সাতটা বাজে, ন'টার ভেতর আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবেন।'

বশংবদ প্রজার মতো ধীরাজ দেশাই বলল, 'ঠিক আছে স্যার, ন'টার ভেতরেই পৌঁছে দেব।' একটু থেমে কী চিন্তা করে আবার বলল, 'জুহুর ক্লাবেই চলুন স্যার। অন্য ক্লাবগুলোতে দারুণ ভিড়, সব সময় হাট বসে থাকে। জুহুটা বেশি নিরিবিলি,

প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে।'

সোমনাথ উত্তর দিল না।

পার্কিং জোনে যে ঝকঝকে প্রকাণ্ড গাড়িটার সামনে এসে ধীরাজ দেশাই সোমনাথকে দাঁড় করালো সেটা সেভেনটি-ফোর মডেলের ইম্পোর্টেড ইতালিয়ান কার। গাড়িটা এয়ার কণ্ডিশানড। জানালার নীলাভ কাচগুলো বন্ধ, ভেতরে আলো জ্বলছে না। গাড়িতে কেউ আছে কিনা, কিংবা কী আছে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ওরা গিয়ে দাঁড়াতেই নিঃশব্দে পেছনের দরজা খুলে গেল। ধীরাজ দেশাই বলল, 'আসুন স্যার—'

সোমনাথ বলল, 'আপনি আগে উঠুন।'

'তাই কখনো হয়? আপনি থাকতে—' বিনয়ে এবং অতিরিক্ত ভদ্রতায় পিঠ বেঁকে যেতে লাগল ধীরাজ দেশাইর।

অগত্যা প্রথমে সোমনাথকে উঠতেই হল। উঠেই আবছাভাবে সে দেখতে পেল সামনের সিটে ঝকঝকে উর্দিপরা শোফার বসে আছে। আর এই পেছনের সিটের ও-মাথায় জানালার ধার ঘেঁষে একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। যেহেতু ভেতরে আলো নেই, অস্পষ্ট নীলাভ অন্ধকারে মেয়েটার চোখমুখ বা বয়স কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না।

এই গাড়িটা এত বড় যে পিছনের সিটে চারজন হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারে। সোমনাথ মেয়েটির ছোঁয়া বাঁচিয়ে একটু দূরেই বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ফোমের আরামদায়ক নরম গদির ভেতর দেড় ফুট ঢুকে গেল। আর সে বসতেই ধীরাজ দেশাই উঠে এসে তার গা ঘেঁষে বসল। তারপর বলল, 'স্যার, আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে।'

সোমনাথ জানতে চাইল, 'কেন?'

'গাড়ির লাইটটা আজ বিকেল থেকে খারাপ হয়ে গেছে। অন্ধকারে ভূতের মতো বসে থাকতে কি ভালো লাগে! মুখ না দেখলে কথা বলে সুখ নেই।'

'আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

ধীরাজ দেশাই এবার শোফারকে বলল, 'জুহু চল।' তারপর সোমনাথের দিকে ফিরে বলতে লাগল, 'আপনি স্যার আমার অনুরোধটা রেখেছেন, আমাকে ফিরিয়ে দেন নি—সেজন্যে আই অ্যাম সো হ্যাপি, সো গ্রেটফুল—' বম্বের একঘেয়ে মনসুনের মতো সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে যেতে লাগল সে।

আর তা শুনতে শুনতে চোখের কোণ দিয়ে ডান পাশে বসে থাকা মেয়েটাকে দেখতে চেষ্টা করল সোমনাথ। কিন্তু না, মেয়েটার মুখ ওদিকে ফেরানো। জানলার

নীল কাচের বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

মেয়েটা কে, বোঝা যাচ্ছে না। সোমনাথের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করিয়ে দেওয়া দূরের কথা, মেয়েটার সঙ্গে একটা কথাও ধীরাজ দেশাই নিজে পর্যন্ত বলে নি। ড্রাইভার, সোমনাথ আর সে ছাড়া অন্য কেউ আছে, ধীরাজের ভাবগতিক দেখে তা মনে হয় না। মেয়েটার অস্তিত্ব পুরোপুরি ভুলে গিয়ে সে বসে আছে।

ধীরাজ দেশাইর তোষামোদ আর ঘ্যানঘ্যানানি মাথা ধরিয়ে দিচ্ছিল, কপালের দু'পাশে রগদুটো সমানে ঘোড়ার মতো লাফিয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, চা খাবার কথায় রাজি না হলেই ভালো হত। কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর তার উপায় নেই। যেভাবে লোকটা বকে যাচ্ছে, শুনতে শুনতে দু'ঘণ্টা বাদে একখানা ব্রন টিউমার না গজিয়ে যায়।

মেরিন ড্রাইভের তেলতেলে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে পঞ্চাশ মাইল স্পিডে গাড়িটা উড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এতটুকু শব্দ নেই, গাড়িটা এক ইঞ্চিও লাফাচ্ছে না। সোমনাথের মনে হচ্ছিল, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল একটা ঘরে বসে আছে।

একটানা বক বক করতে করতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতেই ধীরাজ দেশাই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ড্রাইভার, রুখো রুখো—'

ততক্ষণে তারা মেরিন লাইনসের ফ্লাইওভারটার কাছে এসে পড়েছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে শোফার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল।.

ধীরাজ দেশাই প্রায় হাতজোড় করে সোমনাথকে বলল, 'স্যার, যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলব—'

আচমকা রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে দিতে অবাক হয়ে গিয়েছিল সোমনাথ, কিছুটা বিরক্তও। সে বলল, 'কী ব্যাপার?'

'এক জায়গায় আমি একটা ইমপর্টান্ট ডকুমেন্ট ফেলে এসেছি। ওটা হারিয়ে গেলে খুব বিপদে পড়ে যাব। আমি স্যার এখানে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরছি। আপনি কাইন্ডলি জুহুতে চলে যান—আপনি পৌঁছুবার পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমি চলে আসছি।'

'কিন্তু জুহুতে আপনার ক্লাব তো আমি চিনি না।'

'সে জন্য অসুবিধা হবে না।' কোণের দিকের সেই মেয়েটিকে দেখিয়ে ধীরাজ দেশাই বলল, 'ও আমার পি-এ। ও আপনাকে ক্লাবে নিয়ে যাবে।' মেয়েটাকে বলল, 'তুমি এঁকে নিয়ে যাও। দেখো এঁর কোনওরকম অসুবিধা না হয়।'

মেয়েটি বলল, 'ঠিক আছে স্যার।'

ধীরাজ দেশাই বার বার ক্ষমা চেয়ে নেমে পড়ল। সোমনাথের ইচ্ছা হল, সে-ও নেমে যায়। এই লোকটির কথায় রাজি হয়ে কি ইঁদুরকলে যে সে পড়ছে! কিন্তু

নামা গেল না, নামার কথাটা বলা পর্যন্ত গেল না। তার আগেই গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল এবং মুহূর্তে পঞ্চাশ মাইল স্পিড উঠে গেল।

মালাবার হিলস বাঁয়ে রেখে কাম্বালা হিল পেরিয়ে গাড়িটা যখন ওরলিতে এসে পড়েছে, সেই সময় কানের পাশ থেকে চাপা সুরেলা একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'স্যার—'

চমকে ঘাড় ফেরাল সোমনাথ। সেই মেয়েটা জানালার ধার থেকে কখন যেন অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। কাঁধের ওপর তার গরম নিশ্বাস পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

এতক্ষণে গাড়ির ভেতরকার নীলাভ অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে সোমনাথের। মেয়েটাকে অনেকখানিই দেখতে পাচ্ছিল সে। ধারাল নাক তার। পেন্সিলে-আঁকা ভুরুর তলায় মেয়েটার যে চোখ তাতে যৌনগন্ধ মাখানো। রক্তাভ ঠোঁটে ঝকঝকে দুটো দাঁত কেটে বসে আছে। মোমে-মাজা গলা, অনাবৃত সুগোল বাহু কাঁধ থেকে নেমে এসেছে, দু' হাতের দশটি বড় বড় ছুঁচলো নখ রক্তরঞ্জিত। মুখটা ডিমের মতো লম্বাটে। পরনে ছোট হট প্যান্ট আর বিশাল বুকে সংক্ষিপ্ত সী-থ্রু ব্রা। এই পোশাকে শরীরের দশ ভাগের এক ভাগও ঢাকা পড়ে নি। সাঁচিস্তূপের মতো দুই বুকের প্রায় সবটাই, সরু কোমর, সুগভীর নাভি, তার নিচের অনেকখানি অববাহিকা এবং নীল মাখনের পাহাড়ের মতো দুই উরু, পেলব পা—সবই তার উন্মুক্ত। তার গা থেকে উত্তেজক সেন্টের গন্ধ উঠে আসছিল।

এতক্ষণ ভালো করে লক্ষই করে নি সোমনাথ। এবার তাকে দেখতে দেখতে নাকে এবং মাথায় সোডার ঝাঁঝের মতো কিছু একটা অনুভব করতে লাগল।

ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে রেখেই একটু হাসল মেয়েটা। তারপর আগের মতো সুরেলা গলায় বলল, 'চুপচাপ বসে থাকতে নিশ্চয়ই আপনার খারাপ লাগছে। ইউ আর সার্টেনলি ফিলিং আনকমফোর্টেবল।' নিখুঁত ইংরেজিতেই কথা বলছিল সে।

জড়ানো কণ্ঠস্বরে কী একটা উত্তর দিলে সোমনাথ।

মেয়েটা আবার বলল, 'আমি যদি আপনার সঙ্গে গল্প করি, কিছু মনে করবেন না তো?'

'আরে না না, মনে করব কেন?' সোমনাথ টের পাচ্ছিল, তার স্নায়ুগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

একটু চুপচাপ। তারপর মেয়েটি বলল, 'আমার বস্ মিস্টার দেশাই কাল বলছিলেন আপনি এখানকার লোক, আই মিন, মহারাষ্ট্রিয়ান নন।'

'ঠিকই বলেছেন।' বলে একটু হাসল সোমনাথ। কী ভেবে সামান্য কৌতূহলের সুরে পরক্ষণে বলল, 'আমার সম্বন্ধে আপনাদের আলোচনা হয় নাকি?'

'বারে, আমাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস, আর আপনি এই ওয়েস্টার্ন রিজিওনের বলতে গেলে টপমোস্ট পার্সন, আপনার সম্বন্ধে আলোচনা হবে না!'

মেয়েটা ঠিকই বলেছে। যাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কনসার্ন, সোমনাথ সম্পর্কে তাদের মধ্যে আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক, সে কোনও উত্তর দিল না।

মেয়েটা আবার বলল, 'বম্বেতে আপনি কতদিন আছেন?'

সোমনাথ বলল, 'তিন মাসের মতো।'

'এখানে কোথায় থাকেন?'

'কোলাবায়। মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের অফিসারদের জন্য যে সব ফ্ল্যাট আছে তার একটাতে—'

'এর আগে কোথায় ছিলেন স্যার?'

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল সোমনাথের। নীলাভ সাপের মতো একটি অনাবৃত বাহু সোমনাথের কাঁধের ওপর দিয়ে তার গলা বেষ্টন করল। সেই সঙ্গে সোমনাথ অনুভব করল সাঁচিস্তূপের মতো মেয়েটার বুক তার বাঁ পাঁজরের হাড়ের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। মাখনের পাহাড়ের মতো একটা নীল উলঙ্গ উরু একান্ত অবলীলায় তার কোলের উপর উঠে এল। আর একটা নরম মুখ কাঁধ আর চিবুকের খাঁজের মধ্যে উঠে এসে আটকে রইল। ঘাড়-পর্যন্ত-ছাঁটা নীলাভ চুল থেকে উগ্র গন্ধ উঠে এসে সোমনাথের নাকের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যেতে লাগল। চিবুকে-ঘাড়ে-গলায় মেয়েটার নিশ্বাস পড়ছে তপ্ত লু-বাতাসের মতো। সোমনাথের মনে হতে লাগল তার রক্তচাপে দ্রুত বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে। এয়ার কণ্ডিশানড গাড়ির ভেতরেও সে গলগল করে ঘামতে লাগল। নিমেষে তার জামা ভিজে সপসপে হয়ে গেল।

মেয়েটি আদুরে গলায় আবার বলল, 'বললেন না তো স্যার, এর আগে কোথায় ছিলেন?'

সোমনাথের গলার ভেতরে থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'দিল্লিতে—' তারপরেই সে মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু নীল সাপের মতো শীতল মসৃণ পিছল একটি শরীর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

সোমনাথ তীক্ষ্ণ চাপা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ড্রাইভার, গাড়ি রুখো—'

গাড়ি থামল না। ঘাড়ের খাঁজে থেকে মেয়েটার গলা বুজগুড়ির মতো ভেসে উঠল, 'ডোন্ট বি সিলি স্যার, বিহেভ লাইক অ্যান ইন্টেলিজেন্ট ম্যান। আপনি হাজার চিৎকার করলেও গাড়ি থামবে না। আর—'

শ্বাসরুদ্ধের মতো সোমনাথ বলল, 'আর কী?

'আপনি নেমে যাবার চেষ্টা করলে আমাকে কিন্তু চেঁচাতে হবে এবং প্যান্টি আর

ব্রা ছিঁড়ে লোকজনকে বলতে হবে আপনি আমাকে রেপ করতে চাইছেন। আপনার মতো একজন দায়িত্বশীল অফিসারের পক্ষে তার ফলাফল কী হতে পারে, ভেবে দেখবেন।'

সোমনাথ বুঝতে পারছিল এই মেয়েটাকে দিয়ে ফাঁদ পেতেছে ধীরাজ দেশাই, আর সেই ফাঁদে সে পা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নাকমুখ দিয়ে আগুনের হলকার মতো ঝাঁঝ বেরিয়ে আসছিল তার। কীভাবে ফাঁদটা কেটে বেরুনো যায়, সে ভাবতে পারছিল না। তবে এটা বুঝতে পারছিল, এখন মাথাটা পুরোপুরি ঠাণ্ডা রাখতে হবে এবং কৌশলে মেয়েটার চোখে ধুলো ছিটিয়ে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে সোমনাথ বলল, 'কি যে বল, তোমার মতো প্রেটি ইয়ং গার্লের সঙ্গ ছেড়ে আমি কখনও নেমে যেতে পারি?'

মেয়েটা স্বপ্নময় রঙিন অন্ধকারে ঢেউ তুলে একটু হাসল, 'দ্যাটস লাইক আ গুড বয়।' বলেই ঘাড়ের খাঁজে দীর্ঘ চুমু খেল।

সোমনাথ বলল, 'এতক্ষণ আমরা একসঙ্গে রয়েছি অথচ তোমার নামটাই কিন্তু এখনও জানা হয় নি।'

'আমার নাম স্টেলা—'

'আমি সোমনাথ।'

ঘাড়ের ভেতরে থেকে দ্রুত মুখটা তুলে সোমনাথের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল স্টেলা। তারপর বলল, 'সোমনাথ কী? হোয়াটস ইওর সারনেম?'

হঠাৎ কী হল মেয়েটার? তার পদবি জানবার জন্য এত খেপে উঠল কেন? অবাক হয়ে সোমনাথ বলল, 'চ্যাটার্জি।'

পরিষ্কার বাংলা ভাষায় স্টেলা এবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বাঙালি?'

'হ্যাঁ, কেন?'

সোমনাথের শরীর থেকে নীল সাপের প্যাঁচ মুহূর্তে খসে গেল। কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল স্টেলা। কোল থেকে মাখনের স্তূপের মতো উরু সরিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে সোমনাথকে দেখতে দেখতে সে বলল, 'কোনওদিন আপনারা কি কসবাতে ছিলেন?'

যে মেয়ের নাম স্টেলা তার মুখে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল সোমনাথ। কসবার নাম শুনে সে হকচকিয়ে গেল। সে শুনেছে খড়ি পেতে কারা যেন ভূ-ভারতের খবর বলে দিতে পারে। স্টেলা কি তাদের কেউ?

রুদ্ধশ্বাসে স্টেলা আবার বলে উঠল, 'আপনার বাবার নাম কি মণিমোহন চ্যাটার্জি?'

বিমূঢ়ের মতো সোমনাথ বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এসব জানলে কি করে? তুমি

কে?'

তার কথা যেন শুনতেই পেল না স্টেলা। তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে শোফারকে বলল, 'রুখো—রুখো—'

একটুও শব্দ না করে ইম্পোর্টেড গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেলা সোমনাথকে প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তায় নামিয়ে দিল।

সমস্ত ব্যাপারটা এতই আকস্মিক আর অভাবনীয় যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না সোমনাথ। বিভ্রান্তের মতো সে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। স্টেলা মুখ বাড়িয়ে খুব চাপা গলায় শুধু বলল, 'আমি মল্লিকা—'

মাথার ভেতর একটা শিরা কট করে কেটে গেল যেন। রক্তের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু ঘটে যেতে লাগল। সোমনাথ চিৎকার করে কী বলতে গেল, তার আগেই নিঃশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সেটা চলতে শুরু করেছে। মুহূর্তে অসংখ্য দ্রুতগামী বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট কারের ভিড়ে সেটা মিশে গেল।

যতক্ষণ গাড়িটা দেখা যায়, দাঁড়িয়ে থাকল সোমনাথ। তারপর নিশি-পাওয়া মানুষের মতো ফুটপাথের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

মল্লিকাকে প্রথম কবে দেখেছিল সোমনাথ?

মনে পড়ছে কসবাতে তাদের প্রকাণ্ড কমপাউণ্ডওলা যে তিনতলা বাড়িটা রয়েছে তার ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তখন বিকেল, সময়টা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, অর্থাৎ শীতের আয়ু ফুরিয়ে আসছে।

এখন থেকে কুড়ি বাইশ বছর আগে কসবার ওদিকটা ছিল খুবই নিরিবিলি, বাড়িঘরের চাইতে ফাঁকা জায়গা বেশি। ডোবা-পুকুর, বাঁশঝাড়, ঝোপজঙ্গল প্রচুর দেখা যেত। ওপরে তাকালে বিশাল নীলাকাশ চোখে পড়ত।

তখন কত আর বয়স সোমনাথের, বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে, রেজাল্ট বেরোয় নি, হাতে তার অঢেল সময়।

শীতশেষের সেই পড়ন্ত বেলায় মাথার ওপর অগুনতি পাখি উড়ছিল। রোদে তখন বাসি হলুদের রং ধরেছে। সূর্যটা কসবার উঁচুনিচু বাড়িগুলোর মাথায় লাল রিবন বাঁধতে বাঁধতে পশ্চিমে নেমে যাচ্ছে।

ছাদের কার্নিসের কাছে দাঁড়িয়ে রোদ, পাখি, লাল টুকটুকে সূর্য দেখতে দেখতে হঠাৎ সোমনাথের চোখে পড়েছিল, তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে মোড়ের মাথার পুরনো নোনা-ধরা একতলা বাড়িটার সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িটার মাথায় প্রচুর মালপত্র—দড়িতে বাঁধা ঢাউস বিছানা, টিনের বাক্স, পোর্টম্যান্ট, খেলো কাঠের টেবল চেয়ার, বেতের ঝুড়ি, বড় আয়না ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাড়িটা থামতেই সতের আঠার বছরের একটি মেয়ে প্রথমে নেমেছিল। তারপর নেমেছিল হাড়-বার-করা, রোগা, অ্যানিমিক চেহারার মধ্যবয়সী একটি মহিলা—খুব সম্ভব মেয়েটির মা। তারও পর আট থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে।

সেই সতের আঠার বছরের মেয়েটা এবার গাড়ির ভেতর থেকে পা-কাটা কোলকুঁজো চেহারার রুগ্ণ একটি প্রৌঢ়কে নামিয়ে এনে প্রায় কোলে করেই একতলা বাড়িটায় রেখে এসেছিল। তারপর কমবয়সী ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে হাতে হাতে ধরাধরি করে যাবতীয় লটবহর ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। সোমনাথ বুঝতে পারছিল, এ বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল। তবে মেয়েটার নাম যে মল্লিকা, সেটা তখন সে জানত না। জানার কথাও নয়। না জানলেও মল্লিকাকে সেই তার প্রথম দেখা।

তারপর রাস্তায়-টাস্তায় অনেক বার দেখা হয়েছে মল্লিকার সঙ্গে। কেউ কথা বলে নি, বলার কোনও কারণও নেই। তবে মেয়েটা দারুণ সুন্দর, তার চেহারা খুবই আকর্ষণীয়, সে পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ভাল লাগার একটা রেশ অনেকক্ষণ আলতো নেশার মতো সোমনাথের গায়ে জড়িয়ে থাকত।

সে লক্ষ করত, বাড়ির যাবতীয় কাজ করে মেয়েটা। দুধ আনা, বাজার করা, লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন তোলা—হাসিমুখে সব করে যেত। তারপর বিকেল হলেই, পশ্চিমের গাছপালার ওধারে যখন সূর্যটা নেমে যেত সেই সময় দারুণ সেজে হাতে একটা ফ্যাশনেবল লেডিজ ব্যাগ ঝুলিয়ে সোমনাথদের বাড়ির সামনে দিয়ে ওধারের বড় রাস্তায় চলে যেত। তারপর কখন কত রাত্রে ফিরত, সোমনাথ বলতে পারবে না। তবে পরের দিন সকালেই আবার দেখা যেত, সরকারি মিল্ক বুথ থেকে দুধ আনছে, বাজার করছে কিংবা রেশনের দোকানে লাইন লাগাচ্ছে। ততদিনে তার নামটা জানা হয়ে গেছে সোমনাথের।

মল্লিকারা আসার এক মাস পর সোমনাথের এম. এ'র রেজাল্ট বেরিয়েছিল। সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে।

মনে আছে, রেজাল্ট বেরুবার দু'দিন পব দুপুরে শোভাবাজারে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল সে। গোটা দুপুর আড্ডা মেরে বিকেলে সে এসেছিল এসপ্ল্যানেডে। এত তাড়াতাড়ি কসবায় ফিরবে, না ভবানীপুরে আরেক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আরেক রাউণ্ড আড্ডা জমাবে ভাবছে, সেই সময় মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মেয়েটা। তারপর স্নিগ্ধ হেসে কাছে এসে বলেছিল, 'অভিনন্দন।'

মল্লিকার সঙ্গে আগে অসংখ্য বার দেখা হলেও সেই তার প্রথম কথা বলা। সোমনাথ বলেছিল, 'কিসের অভিনন্দন?'

'আপনি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছেন—সেই জন্যে।'

সোমনাথ অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'আমার রেজাল্টের কথা আপনাকে কে বলল?'

মল্লিকার চোখ দুটো এতই সরল আর সুন্দর, মনে হয়, সব সময় জলে ধুয়ে আছে। সে বলেছিল, 'আমাদের পাড়ার সবাই বলছে। ভেবেছিলাম, আপনাদের বাড়ি গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আসব।'

'গেলেই পারতেন।'

'সাহস হয় নি।'

'কেন?'

'কে কী ভাববে—'

'কিছুই ভাবত না।'

মল্লিকা উত্তর দেয় নি।

রেজাল্ট বেরুবার পর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, সবাই দারুণ খুশি হয়েছিল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অচেনা একটি মেয়ে এসে এভাবে অভিনন্দন জানাবে, এতটা ভাবা যায় নি। দারুণ ভাল লাগছিল সোমনাথের। সে বলেছিল, 'আপনার কি এখন জরুরি কোনও কাজ আছে?'

কবজি উলটে ঘড়ি দেখতে দেখতে মল্লিকা বলেছিল, 'এখন নেই। তবে ছ'টার পর এক জাযগায় যেতে হবে।'

'ছ'টা বাজতে এখনও পঞ্চাশ মিনিট দেরি। তার মধ্যে কোথাও গিয়ে এক কাপ চা খাওয়া যেতে পাথে। আপনার আপত্তি নেই তো—'

মল্লিকা জানিয়েছিল, আপত্তি নেই।

ওরা কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে পর্দাঢাকা কেবিনে মুখোমুখি বসেছিল, শুধু চা-ই নয়, যদ্দূর মনে আছে, কাটলেট-টাটলেটের অর্ডার দিয়েছিল সে।

খেতে খেতে মল্লিকা বলেছিল, 'আপনি তো আমাদের পাড়ার আইডল।'

'কি রকম?'

'সবার মুখে শুধু আপনারই কথা। ম্যাট্রিক থেকে শুরু করে ইউনিভারসিটির সব পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছেন। আপনার মতো ছেলে হয় না—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সোমনাথ লাজুক হেসেছিল, 'যত সব আজেবাজে কথা। জানেন—'

মল্লিকা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল, 'কী?'

'প্রথম যেদিন আপনারা এলেন সেদিন আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে আপনাকে দেখেছি।'

'তাই নাকি? আমি তো আপনাকে দেখি নি।'

মল্লিকা হেসেছিল।

সোমনাথ এবার বলেছিল, 'আপনারা আমাদের পাড়ায় এসেছেন, ইচ্ছে হত আলাপ করব। অনেক বার ভেবেছিও। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'সাহস হয় নি। ভাগ্যিস রেজাল্ট মোটামুটি খারাপ হয় নি, তাই আলাপটা হয়ে গেল।'

এরপর এলোমেলো টুকরো টুকরো কী কথা হল, এতকাল পর আর মনে নেই'।

গল্প করতে করতে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। আচমকা হাতঘড়িটা আরেক বার দেখে সটান উঠে দাঁড়িয়েছিল মল্লিকা। অস্থিরভাবে বলেছিল, 'আমাকে এবার যেতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে উদার হাতে বেয়ারাকে টিপস দিয়ে মল্লিকার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সোমনাথ। বলেছিল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

'আপনিই বলুন।'

'কাল?'

'বেশ। কোথায়?'

'ধরুন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের সামনে—'

'কখন?'

'চারটের সময়।'

'ঠিক আছে।'

একটু ভেবে সোমনাথ এবার বলেছে, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

চমকে তার দিকে ফিরে মল্লিকা বলেছে, 'কেন?'

'তা হলে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি। আমার এখন কোনও কাজ নেই।

তীক্ষ্ণ চাপা গলায় মল্লিকা বলেছে, 'না-না, আমি নিজেই যেতে পারব।' সোমনাথকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দুম করে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে সে উঠে পড়েছিল।

পরের দিন ঠিক চারটের সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের সামনেই দেখা হয়েছিল মল্লিকার সঙ্গে। খানিকটা গল্পটল্প করে আগের দিনের মতো ছ'টার সময় চলে গিয়েছিল সে। তবে ঠিক হয়েছিল, পরের দিন আবার তাদের দেখা হবে।

এরপর থেকে সোমনাথরা রোজ বিকেলে কোথাওনা কোথাও গিয়ে বসত। কোনওদিন তারা যেত ইডেন গার্ডেনে, কোনওদিন লেকের পাড়ে, কোনওদিন বা ময়দানের মাঝমধ্যিখানে। এর মধ্যে কখন যেন তারা পরস্পরকে 'তুমি' টুমি করে বলতে শুরু করেছে। আর টুকরো-টুকরোভাবে মল্লিকাদের পারিবারিক কিছু কিছু

খবর জানতে পেরেছে সোমনাথ। ওর বাবা মার্চেন্ট অফিসের কেরানি ছিল। অ্যাকসিডেন্টে ভদ্রলোকের পা কাটা যাবার পর ওদের খুবই খারাপ সময় চলছে। মল্লিকা আই. এ পর্যন্ত পড়েছিল, ছোটখাটো একটা কাজ করে সে, তার ওপরেই সংসারের সব দায়দায়িত্ব এসে পড়েছে। তবে সে কী করে, কোথায় তার অফিস, সেটা আর বলে নি। সোমনাথও জিজ্ঞেস করে নি।

সোমনাথের মনে আছে, অদ্ভুত এক নেশার ঘোরে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল তার। বিকেলের দিকে ময়দানে, ভিক্টোরিয়ার ফুলের বাগানে কিংবা গঙ্গার ধারে মল্লিকার সঙ্গে একবার করে রোজ দেখা না হলে খুব খারাপ লাগত। তবে একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, ছ'টা সাতটার বেশি একদিনও তাকে আটকানো যেত না। মাস দেড়-দুই এভাবে কাটবার পর সোমনাথের ছোট বোন সবিতা—তখন কলেজে পড়ত—হঠাৎ একদিন তাকে ছাদের এক কোণে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'সেজদা, এটা তুই কী করছিস?'

বুঝতে না পেরে সোমনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করছি?'

'মল্লিকার সঙ্গে আজকাল নাকি খুব বেড়াচ্ছিস?'

সোমনাথের বুকের ভেতরটা চমকে উঠেছিল। ঢোক গিলে সে বলেছিল, 'কে মল্লিকা?'

সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বরে লম্বা টান দিয়ে সবিতা বলেছিল, 'মল্লিকাকে চিনিস না! আর ভালমানুষ সাজতে হবে না। তুই ক্যাচ হয়ে গেছিস।'

দম-আটকানো গলায় সোমনাথ এবার বলেছে, 'মল্লিকার সঙ্গে বেড়াই—এ খবরটা কে দিলে?'

'অনিলকাকু।' অনিল ব্যানার্জি সোমনাথের বাবার মামাতো ভাই এবং একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। সবিতা বলে যাচ্ছিল, 'অনিলকাকু আজ সকালে এসে বাবাকে বলছিল, মেয়েটা খুব খারাপ টাইপের। ওর সঙ্গে মেলামেশা করলে বিপদে পড়তে হবে। পুলিশ নাকি ওর ওপর ওয়াচ রাখতে গিয়ে তোকে তার সঙ্গে দেখেছে।'

মল্লিকা সম্বন্ধে এরকম একটা ব্যাপার ভাবা যাচ্ছিল না, সবটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। তবে বাবা তাদের ঘোরাঘুরির কথা জানতে পেরেছেন, সেটা মোটেই সুখবর নয়। বাবা রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দুর্দান্ত রাশভারী আর রাগী। পুরনো আমলের নীতিটীতি এবং মূল্যবোধ কমা সেমিকোলন পর্যন্ত মেনে চলেন। অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি। ভয়ে ভয়ে সোমনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবা কিছু বলেছেন?'

'খুব রেগে আছেন। আমি আগেই জানিয়ে দিয়ে গেলাম। এবার নিজের মুণ্ডু কী করে বাঁচাতে হয়; তুই বুঝবি।'

মনে আছে সেদিনই বাবার ঘরে ডাক পড়েছিল সোমনাথের। গমগমে ভারি গলায় এজলাসে রায় দেবার মতো করে বাবা বলেছিলেন, 'তোমার সব খবর অনিল দিয়ে গেছে। সে যাক, দিস ইজ মাই ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্নিং, তুমি ওই বাজে মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করবে। শি ইজ আ ব্ল্যাকমেলার। ভাল ফ্যামিলির ছেলেদের সঙ্গে মিশে তাদের সর্বনাশ করে। আশা করি দিস উড বি এনাফ ফর ইউ।'

সোমনাথ ঘাড় নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল। কোনওদিন বাবার মুখের ওপর চোখ তুলে সে কথা বলে নি। কিন্তু তার মনে হয়েছিল, একটি গরিব অসহায় মেয়ের ওপর অকারণে অন্যায় করা হচ্ছে। বাবা বলার পরও সে মল্লিকার সঙ্গে দেখা করেছে। মেয়েটার আকর্ষণ এমনই অপ্রতিরোধ্য যে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। তা ছাড়া এই দেখা করাটা ছিল বাবার বিরুদ্ধে তার প্রোটেস্ট। তবে মল্লিকাকে পুলিশের কথাটা সে বলতে পারে নি।

দু'দিন বাদে বাবার ঘরে আবার তার ডাক পড়েছিল। বাবার দিকে সেদিন তাকানো যায় নি। তাঁর সমস্ত মুখ -ঘাড়-গলা টকটকে লাল। মনে হচ্ছিল, তাঁর রক্তচাপ একটা বিপজ্জনক সীমানায় পৌঁছে গেছে। তিনি প্রচণ্ড গম্ভীর গলায় শুধু বলেছিলেন, 'এম. এ পাশ করে তোমার যে ডানা গজাবে, ভাবতে পারিনি। মনে রেখো, তোমার প্রতিটি স্টেপের খবর আমি রাখছি। কীভাবে মেয়েটার সঙ্গে তোমার মেলামেশা বন্ধ করা যায় দেখছি। ইউ মে গো নাউ—'

পরের দিন সকালে কে যেন খবর দিয়েছিল, মল্লিকাদের বাড়ি পুলিশ এসেছে। শোনামাত্র সোমনাথ ছুটে গিয়েছিল। একজন জুনিয়ার অফিসার তখন মল্লিকাকে বলছিল, 'বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আপনাদের এই লোকালিটি ছেড়ে যেতে হবে।'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো হঠাৎ চিৎকার করে সোমনাথ বলেছিল, 'কেন কেন, যাবে? কী অন্যায় ওরা করেছে?'

যুবক পুলিশ অফিসারটিকে সোমনাথ চেনে। সে বলেছিল, 'ওঁর প্রফেশন সম্বন্ধে আমাদের কাছে অনেক সেনসেসানাল খবর আছে। তা ছাড়া এখানকার বাসিন্দারা চায় না এঁরা এখানে থাকুন। এই দেখুন এঁর বিরুদ্ধে কত লোক সিগনেচার দিয়েছে।' বলেই এক টুকরো কাগজে মল্লিকাদের পাড়া থেকে তুলে দেবার আবেদন এবং তার তলায় অনেকগুলো নামের স্বাক্ষর দেখিয়েছিল। প্রথম স্বাক্ষরটি সোমনাথের বাবার।

সোমনাথ বলেছিল, 'ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখুন, এঁদের ওপর কিন্তু খুবই ইনজাসটিস হচ্ছে।' বলেই লক্ষ করেছিল কৃতজ্ঞ চোখে মল্লিকা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পুলিশ অফিসারটির আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সোমনাথের বাবা হঠাৎ সেখানে এসে হাজির। মোটা নির্মম গলায় তিনি ছেলেকে বলেছিলেন, 'তোমার জন্যে একটা

নোংরা জায়গায় আমাকে আসতে হল। মনে হচ্ছে, আমি আত্মহত্যা করি। একটা ডার্টি উইম্যানকে তুমি ডিফেন্ড করছ!'

সোমনাথের হাত-পা উত্তেজনায় কাঁপছিল। দুর্বল গলায় সে বলল, 'কিন্তু বাবা—'

আচমকা ওধার থেকে মল্লিকা বলে উঠেছিল, 'এরা যা বলছেন, আমি তাই। খুবই খারাপ মেয়ে। তুমি যাও সোমনাথ, আমার ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে।'

সোমনাথ এবার কী বলবে ভেবে পায় নি। একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। তার দু-দিন বাদে ঘোড়ার গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে মল্লিকারা কসবা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তারপর ওকে অনেক খুঁজেছে সোমনাথ, কোথাও পায় নি।

দেখতে দেখতে কুড়ি-বাইশটা বছর কেটে গেছে। এম. এ'র পর কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে কমার্স মিনিস্ট্রিতে বড় চাকরি পেয়েছে সোমনাথ। সঙ্গে সঙ্গে বিয়েও করেছে, তারপর এক বছর দু'বছর পর পর একটা করে প্রোমোশন পেয়ে এখন সে ওয়েস্টার্ন রিজিওনে এসেছে। দু'টি ছেলেমেয়ে, সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে তার সুখের সংসার। সে দায়িত্বশীল অফিসার, পরিতৃপ্ত ফ্যামিলিম্যান।

কিন্তু এতকাল বাদে এভাবে আরব সাগরের পারের এই শহরে মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল! আর দেখাই যখন হল এবং পরিচয়ও পাওয়া গেল তখন একটা কথাও বলা গেল না তার সঙ্গে। অদ্ভুত এক বিমূঢ়তার মাঝখানে তাকে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেছে মল্লিকা।

পরের দিন দুপুরবেলা অফিসে একটা ফাইল দেখছিল সোমনাথ, হঠাৎ ফোন এল। রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই ওধার থেকে একটি মেয়ের গলা ভেসে এল, 'মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সোমনাথ বলল, 'বলুন—'

'আমি মল্লিকা—'

সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের কষে-বাঁধা ছিলার মতো স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে গেল সোমনাথের। অসহ্য এক উত্তেজনা, নাকি অস্থিরতা, তার ওপর ভর করল। ফোনটা প্রায় মুখে লাগিয়ে কাঁপা গলায় সে বলল, 'কোত্থেকে ফোন করছ?'

'কুড়ি মাইল দূর থেকে—'

'একবার কি আসা যায় না?'

'না।'

'তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করছে। কসবা ছেড়ে সেই কুড়ি বছর

আগে তোমরা কোথায় গেলে।'

বিষণ্ণ হাসল মল্লিকা, 'কী হবে সে-সব জেনে?'

দারুণ আগ্রহের গলায় সোমনাথ বলল, 'না-না, তুমি বল। জানো, তোমাকে অনেক খুঁজেছি, কোথাও পাই নি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করছি। না পেয়ে ভালই হয়েছে।' বলেই একটু থামল মল্লিকা। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'কসবা থেকে আমরা বাগবাজার চলে গিয়েছিলাম। তারপর এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে বম্বে এসেছি।'

'তোমার মা-বাবা-ভাইবোনরা কেমন আছে?'

'বাবা মারা গেছে। দুটো বোনের বিয়ে দিয়েছি। একটা ভাই কলকাতায় মস্তান হয়েছে, আরেকটা ভাই কোচিনে স্মাগলিং করছে। মা আমার কাছে বম্বেতে আছে। আমি কী করছি জিজ্ঞেস করলে না তো?'

সোমনাথ জড়ানো গলায় যা বলল, তার কিছুই বোঝা গেল না।

শব্দ করে হাসল মল্লিকা। বলল, 'কলকাতায় থাকতে যা ছিলাম, এখনও তাই আছি। আমি ব্ল্যাকমেলার। কলকাতায় ছোট র‍্যাকেটে ছিলাম, এখানে এসে বড় র‍্যাকেটে ঢুকেছি। বদমাশগুলো আমাকে দিয়ে তোমার মতো লোকদের ফাঁদে ফেলে নানারকম সুবিধা আদায় করে। বাবার চাকরি যাবার পর সেই যে ফাঁদে পড়েছি, আর বেরুতে পারলাম না। জীবনে পারবও না বোধ হয়।'

'একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কী?'

'কাল আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'একটা প্রাইভেট ক্লাবে। সেখানে আমি তোমার সঙ্গে নানারকম কাণ্ড করতাম। কী করতাম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আর এই সব অ্যাকটিভিটির সময় গোপনে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রাখা হত। সেই ছবি ডেভলাপ করিয়ে ধীরাজ দেশাই তোমাকে দেখাত এবং বলত, লাইসেন্সের ব্যাপারে সুবিধা করে দাও। তুমি কী করতে সেটা অবশ্য তোমার ব্যাপার। তবে একটু সাবধান করে দিচ্ছি, চারপাশে ধীরাজের মতো সাপ ঘুরছে। টেক কেয়ার।'

একটু চুপ করে থেকে সোমনাথ এবার বলল, 'একটা কথা—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে অন্তর্যামীর মতো মল্লিকা বলল, 'তুমি কী বলবে জানি। কাল তোমাকে হঠাৎ ওভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম কেন, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি যখন গাড়িতে উঠেছিলে জানতাম না, তুমিই সোমনাথ। চেহারা তোমার বদলে গেছে, একটু মোটা হয়েছ। যখন জানলাম তখন না নামিয়ে উপায় ছিল না।'

'কেন?'

'আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।'

'ধীরাজ দেশাইকে কী কৈফিয়ৎ দিয়েছ?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই।'

'আচ্ছা—'

'বল।'

'তুমি তো জানতে আমার বাবাই তোমাদের নানা কায়দা করে তোমাদের কসবা থেকে তুলে দিয়েছিল।'

'জানতাম।'

'তারপরেও আমাকে ছেড়ে দিলে? আমার বাবা এখনও জীবিত, আমার নামে স্ক্যান্ডাল রটিয়ে তাঁকে তো শেষ করে দিতে পারতে।'

মল্লিকার হাসির শব্দ ভেসে এল। তারপরই গভীর, গাঢ় গলায় সে বলল, 'আমি এও তো জানি তুমি কোনও কিছু গ্রাহ্য না করে আমার অনেক কাছে এসেছিলে। সবাই যখন আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাইছে তখন তুমিই রুখে দাঁড়িয়েছিলে। আমার জন্য কেউ এভাবে ভাবে নি সোমনাথ—'

দুরন্ত ঢেউ-এর মতো এক আবেগ সোমনাথকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। সে বলল, 'তুমি কি আমাকে, তুমি কি আমাকে—'

মল্লিকা বলল, 'চুপ কর সোমনাথ, আমি খুব খারাপ মেয়ে। আমাকে স্বপ্ন দেখানো কি তোমার উচিত?'

'তোমার সঙ্গে একবার কি দেখা হতে পারে? ধর, আজ-কাল-পরশু—যে কোনওদিন, যে কোনও জায়গায়?'

'তুমি অনেস্ট অফিসার, রেসপনসিবল ফাদার, হ্যাপি হাজব্যান্ড। আজ-কাল-পরশু, কোনওদিনই পৃথিবীর কোনও জায়গায় আমাদের দেখা হবে না।'

সোমনাথ তবু কী বলতে যাচ্ছিল, ওধার থেকে লাইনটা কেটে দিল মল্লিকা।



খাঁচা

বাংলা-বিহার সীমান্তের কাছাকাছি পুরনো নোংরা মফস্বল শহরের একধারে এই পাড়াটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। চোয়াড়ে ক্ষয়াটে হতচ্ছাড়া চেহারার কুড়ি-পঁচিশটা মেয়েমানুষ এখানকার বাসিন্দা। সারাটা দিন তারা ঘুমিয়ে কি নিজেদের মধ্যে এলোমেলো গল্প করে কাটিয়ে দেয়। সূর্য ডুবে গেলে জলো কালির মতো ফিকে অন্ধকার যখন নামে, সেই সময় এই মেয়েমানুষেরা নরকের খাসমহলে একের পর এক সন্ধ্যাবাতি জ্বেলে দেয়।

পাড়া আর কি, মাঝখানে চৌকো বড় একটা উঠোনকে ঘিরে টানা ব্যারাকের মতো ক'টা বাড়ি। সেগুলোর মাথায় ভাঙাচোরা টিনের চাল। দেওয়াল আর মেঝে অবশ্য পাকা। তবে প্ল্যাস্টার খসে কবেই দেওয়ালগুলোর নোনা-ধরা ইট বেরিয়ে পড়েছে। সিমেন্ট চটে গিয়ে ঘরের মেঝে এবড়ো খেবড়ো।

ব্যারাকগুলোর সামনের দিকে ঘুণে-কাটা নড়বড়ে একটা দরজা। ওটা দিয়েই এ পাড়ায় ঢুকতে হয়। প্রায় গোটা দিনই দরজাটা বন্ধ থাকে, সন্ধে হলেই হাট করে খুলে দেওয়া হয়। ওটার এমন হাল যে জোরে ধাক্কা দিলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তবু সদর দরজা বলে কথা। একটা ধোঁকার টাটি তো খাড়া রাখতেই হয়।

ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর আগে, সেই যুদ্ধের সময় এই ব্যারাকগুলো ছিল আমেরিকান টমিদের ছাউনি। যুদ্ধ থামলে তারা চলে যায়। তারপর বেশ কিছুদিন ব্যারাকগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। স্বাধীনতার সাত-আট বছর বাদে এই মফস্বল শহরের আড়তদার জনৈক হর্ষনাথ কুণ্ডু ব্যারাকগুলো কিনে মেয়েদের পাড়া বসায়। লোকটা দূরদর্শী। সে বুঝতে পেরেছিল ধানচালের ব্যবসার চেয়ে মেয়েদের নিয়ে এই কারবারে অনেক বেশি পয়সা।

পাড়াটা এখন আর হর্ষনাথের হাতে নেই। সাতাত্তর বছর বয়সে বাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার পর কেষ্টভামিনী দাসীকে 'লিজ' দিয়ে দেয় সে।

কেষ্টভামিনী তার পঞ্চান্ন বছর বয়স, এক কুইন্টাল ওজনের বিপুল শরীর, বাজখাঁই গলা আর প্রচণ্ড দাপট নিয়ে ব্যারাকেই থাকে। সে এখানকার 'বাড়িউলি' এবং এতগুলি মেয়ের পাহারাদার। এই পাড়াটা তার খাস তালুক, তার হুকুম ছাড়া এখানে কোনও কিছু হওয়ার জো নেই।

যুদ্ধের আমলে ব্যারাকগুলোর ভেতরে পার্টিসান ওয়াল ছিল না। হর্ষনাথ পাঁচ

ইঞ্চি ইটের দেওয়াল তুলে অগুনতি খুপরি বানিয়ে দিয়েছিল। মেয়েদের জন্য মাথাপিছু একখানা করে খুপরি। রান্নাবান্নাও তারই মধ্যে। খুপরিগুলোর সামনে দিয়ে টানা-বারান্দা চলে গেছে।

উঠোনের একধারে তিনটে বাঁধানো কুয়ো। কুয়োগুলোর গা ঘেঁষে ছোট ছোট ক'টা খোপ, সামনের দিকে পুরনো চট ঝোলানো, এগুলোতে স্নানের ব্যবস্থা।

এই প্রাচীন শহরের ডান দিকে মাইল তিনেক গেলে বড় মাপের তিন-চারটে কয়লাখনি। বাঁ দিকে চার মাইল দূরে ক'বছর হল বিরাট লোহার কারখানা বসেছে, কারখানাটা ঘিরে বসেছে বেশ বড় মাপের নতুন টাউনশিপ।

কাজেই মেয়েপাড়ার ব্যবসা রমরম করে চলছে। সন্ধে হতে না হতেই কয়লাখনি আর কারখানার দিক থেকে মাতাল আব লম্পটের ঝাঁক এখানে হানা দিতে শুরু করে। ভদ্রলোকদের ক্বচিৎ কখনো এ পাড়ায় দেখা যায়। এখানকার খদ্দেরদের বেশির ভাগই চোর জোচ্চোর ফেরেববাজ গুণ্ডা বদমাস ইত্যাদি।

সবে আশ্বিনের শুরু। গোটা বর্ষার জলে ধুয়ে শরতের আকাশ ঝকঝক করছে। মনে হয়, মাথার ওপর আদিগন্ত ফ্রেমে কেউ যেন পালিশ করা একখানা নীল আয়না বাঁধিয়ে রেখেছে। অবশ্য এ কোণে ও কোণে পেঁজা তুলোর মতো ভারহীন সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝির ঝির করে অদৃশ্য স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে সুখদায়ক বাতাস।

এখন ভরদুপুর। সমস্ত চরাচর জুড়ে শরতের নরম মায়াবী রোদ ছড়িয়ে আছে।

এই দুপুরবেলায় মেয়েপাড়াটা ঝিম মেরে পড়ে থাকে। চারিদিক সুনসান। গাছপালার মাথায় বা ব্যারাকগুলোর চালে কাকেদের কর্কশ চিৎকার, ফাঁকে ফাঁকে ঘুঘুর ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

এ পাড়ার বাসিন্দা বেশির ভাগ মেয়েই রাঁধাবাড়া এবং খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে টানা ঘুম লাগাচ্ছে। দু-চারজন ঢালা বারান্দায় গোলোক ধাম আর লুডোর ছক পেতে বসেছে।

দক্ষিণ দিকের ব্যারাকের টানা বারান্দার একেবারে শেষ মাথায় একটা বড় পাখির খাঁচা ঝুলছে। ভেতরে দাঁড়ের ওপর বসে আছে একজোড়া সবুজ টিয়া। তাদের ছোলা খাওয়াতে খাওয়াতে বুলি শেখাচ্ছে যমুনা, 'বল পিরীতের আটা।'

পাখি দুটোকে অনেক কথা শিখিয়েছে যমুনা। যেমন, 'রসের নাগর', 'সাতকেলে ভাতার' কিংবা 'শয়তানের ছানা'। একটাও ঠাকুর দেবতার নাম শেখায়নি সে। যমুনার ধারণা, তাদের এই নরকে ভগবান টগবান কোনওদিন ঢুকবে না। কাজেই ঠাকুর দেবতার মহিমাকীর্তন শিখিয়ে কী লাভ?

'পিরীতের আটা' শব্দ দুটো ঘাড় বাঁকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে জোড়া টিয়া

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারে না। গর্‌র্‌র্ গর্‌র্‌র্ করে অদ্ভুত আওয়াজ করে যায়। কথাটা তাদের গলায় বসানো একদিনের কাজ নয়, পাখিদের বোল শেখাতে প্রচুর ধৈর্য এবং সময় দরকার।

এবার যমুনার দিকে তাকানো যেতে পারে। তার বয়স তেইশ চব্বিশ। এ পাড়ার আর সব বাসিন্দাদের থেকে সে অনেকটাই আলাদা। অন্য মেয়েদের গাল এর মধ্যেই ভেঙে গেছে, চোয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে হাড়। তাদের চোখের তলায় তিন পোঁচ করে গাঢ় কালি। গায়ের চামড়া খরখরে, দৃষ্টি ঘোলাটে, গাঁট পাকানো আঙুল, বিড়ি টেনে টেনে ঠোঁট আর মাড়ি কালচে। লালিত্য বলতে তাদের মধ্যে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কেউ যেন তাদের শরীরের সবটুকু শাঁস শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিক থেকে যমুনা যেন এ পাড়ার কেউ নয়। এখানকার জীবনযাপনের অল্পস্বল্প ছাপ পড়লেও সে বুঝিবা তাজা নিষ্পাপ যুবতীই থেকে গেছে। মুখখানা ভরাট, মাথাভর্তি প্রচুর চুল, চমৎকার স্বাস্থ্য। গায়ের চামড়া মসৃণ, চোয়াল বা কণ্ঠার হাড় চামড়ার তলা থেকে অন্যদের মতো এখনও ফুটে বেরোয় নি। সে বিড়ি বা পানদোক্তা খায় না, দাঁতগুলো তার ধবধবে সাদা।

যমুনার সব আকর্ষণ তার চোখে। এমন বড়, টানা টানা, নরম চোখ ক্বচিৎ দেখা যায়। এই জঘন্য নর্দমায় পড়ে থাকলেও তার বাছ-বিচার আছে, পছন্দ অপছন্দ আছে। যাকে তাকে সে নিজের ঘরে ঢোকায় না। দেখে বা কথা বলে যদি ভাল না লাগে, তাকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না যমুনা। অথচ তাকে ঘিরে সন্ধের পর ভনভনে পোকার মতো ভিড় লেগে যায়।

যমুনার নাম শুধু চোর জোচ্চোর মাতাল লম্পটরাই জানে না, দূরের টাউনশিপ আর কয়লাখনি এলাকায় যে সব ভদ্রলোকেরা রয়েছে তাদের কাছেও তার খবর কীভাবে যেন পৌঁছে গেছে। মাঝরাতে চারিদিক ঘুমের আরকে ডুবে গেলে লুকিয়ে চুরিয়ে, চাদরে মুখ ঢেকে এদের কেউ কেউ যমুনার ঘরের দরজায় এসে টোকা দেয়।

এখানে যারা আসে তারা সবাই প্রথমে চায় যমুনাকে। তাকে না পেলে অন্য কথা। এজন্য বাকি মেয়েরা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে, প্রতি মুহূর্তে হয়তো মনে মনে যমুনার মৃত্যুকামনা করে। নরকেও প্রতিদ্বন্দ্বী কম নেই।

নিঝুম দুপুরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে আচমকা কোথায় যেন মাইক বেজে ওঠে। এক মনে পাখিদের বোল শেখাতে শেখাতে চমকে ওঠে যমুনা। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে ব্যারাকের সামনে ধুলোভর্তি রাস্তার খানিকটা দেখা যায়। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সেদিকে তাকায় যমুনা। তার চোখে পড়ে একটা সাইকেল রিকশা আস্তে আস্তে উত্তর থেকে দক্ষিণে আয়রন অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরির টাউনশিপের দিকে চলেছে। দুটো অল্প বয়সের ছোকরা পাশাপাশি উঁচু সিটে বসে

আছে। তাদের একজনের হাতে ছোট মাইক। মুখের কাছে মাইকটা তুলে ধরে সে একটানা বলে যাচ্ছে, 'মায়েরা বোনেরা দাদারা ভাইয়েরা, আগামীকাল শুক্রবার 'মোহিনী' সিনেমায় নতুন ছবি 'মনের মানুষ' শুরু হচ্ছে। এতে আছেন মহানায়ক বরুণ সমাদ্দার, এর নায়িকা স্বপ্নসুন্দরী দীপান্বিতা। এঁদের সঙ্গে পাবেন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভিলেন নরেশ মুৎসুদ্দিকে। নাচে আছেন মিস বিজয়লক্ষ্মী-টি বম্বে। এ ছবিতে বিজয়লক্ষ্মীর নাচ দেখলে মনে হবে এক জাদুনগরীতে চলে গেছেন। এছাড়া রয়েছে আরও বিখ্যাত বিখ্যাত সব শিল্পী। হরেন বিশ্বাস, মধু গোস্বামী, সোনালি বটব্যাল, মণি সান্যাল, এমনি অনেক। কাল দলে দলে, সবান্ধবে, সপরিবারে, কাচ্চাবাচ্চাসুদ্ধ 'মোহিনী' সিনেমায় চলে আসুন। 'মনের মানুষ' দেখে দিল খুশ করে যান। আপনি যেমনটি চান, এ ছবি ঠিক তাই। মনে রাখবেন, পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের টিকিট লাগে না।' একটু থেমে, দম নিয়ে ফের নতুন উদ্যমে শুরু করে ছোকরা, 'আপনাদের এই সঙ্গে একটা সুখবর দিই, কাল বেলা তিনটেয় ম্যাটিনি শো'য়ে উপস্থিত থাকবেন স্বপ্নসুন্দরী দীপান্বিতা আর 'মনের মানুষ' ছবির পরিচালক ভারতবিখ্যাত অমরেশ চৌধুরী। এই দু'জনকে দেখার সুযোগ হারাবেন না। মনে রাখবেন জীবনে সুযোগ একবারই আসে, দু'বার নয়।'

সাইকেল রিকশাটার সামনে পেছনে একপাল ছেলেমেয়ে জুটে গেছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

মাইক হাতে ছোকরাটার পাশে আরেকটি যে যুবক বসে আছে, সে সমানে রঙিন হ্যান্ডবিল বিলি করে যাচ্ছে।

মাইকে ছোকরাটি নতুন করে 'মনের মানুষ'-এর আরও মহিমা কীর্তন শুরু করে দিয়েছিল কিন্তু পরিচালক অমরেশ চৌধুরীর নামটা শোনার পর অন্য কিছুই যমুনার কানে ঢুকছে না, চারপাশের দৃশ্যাবলী ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে যেন।

একসময় সাইকেল রিকশাটা অনেক দূরে চলে যায়। মাইকের শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে। এতক্ষণ পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ছিল যমুনা, এবার আস্তে আস্তে গোড়ালি নামিয়ে সামনের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দূরমনস্কর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

অমরেশ চৌধুরীর নাম কত দিন বাদে শুনল সে? পরিষ্কার মনে আছে—ঠিক দু'বছর। গেল বারের আগের বার আশ্বিন মাসে, পুজোর আগে আগে অমরেশ চৌধুরী তার বিরাট ইউনিট নিয়ে এই শহরে 'মনের মানুষ' ছবির শুটিং করতে এসেছিল। তার সঙ্গে যমুনার জীবনযাপনের কোনও রকম মিল নেই। তারা পরস্পরের অচেনা, বহু দূরের আলাদা আলাদা পৃথিবীর মানুষ। তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না, তবু অদ্ভুতভাবে আলাপটা হয়ে

গিয়েছিল।

অমরেশকে নিয়ে ভাবনাটা বেশিদূর এগোয় না। সদর দরজায় কর্কশ আওয়াজ করে কড়া নড়ে ওঠে, সেই সঙ্গে গণেশের সর্দি-বসা ভারি গলা ভেসে আসে, 'অ্যাই, দোর খোল—'

যান্ত্রিক নিয়মে রোজ এই সময়টা গণেশ এসে সদরের কড়া নাড়ে। জানা সত্ত্বেও যমুনা এমনই অন্যমনস্ক ছিল যে আওয়াজটায় চমকে ওঠে।

এদিকে বারান্দার ও মাথায় যে মেয়েরা গোলোকধাম খেলছিল তাদের একজন দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে। গণেশ ভেতরে ঢুকতেই মেয়েটা আবার খিল আটকে দেয়।

গণেশের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। পেটানো লোহার পাতের মতো তার শরীর। দরজার পাল্লার মতো চওড়া বুক, হাত পায়ের হাড়গুলো মোটা মোটা আর মজবুত, ছড়ানো মাংসল কাঁধ, চৌকো ভারি মুখ। গালে এবং হাতে লম্বা কাটা দাগগুলো বুঝিয়ে দেয় লোকটা মারাত্মক।

গণেশের পরনে চাপা নীল প্যান্ট আর বোতামহীন রং-চটা হাফ শার্ট, পায়ে টায়ার-কাটা চটি। লোকটা এ পাড়ার দালাল, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এখানকার বাসিন্দাদের রক্ষাকর্তা। বাড়িউলি কেষ্টভামিনী দাসীর সে ডান হাত এবং নানা ঝঞ্ঝাটে প্রধান অস্ত্র।

কেষ্টভামিনীর যে ধরনের ব্যবসা তাতে যে কোনওদিন যে কোনও মুহূর্তে এখানে হামলা হতে পারে। নিয়মিত যারা এ পাড়ায় হানা দেয় সেই সব চোর জোচ্চোর হারামজাদারা যখন তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের ধাতস্থ করার জন্য গণেশের মতো একজন জবরদস্ত জেনারেল দরকার।

চেহারা যেমনই হোক, গণেশের কথাবার্তায় ব্যবহারে একটা সাদাসিধে আন্তরিক ব্যাপার আছে, কিন্তু দরকারের সময় প্যান্টের খাঁজ থেকে পলকে দশ ইঞ্চি ছুরি বার করে ফেলে সে।

এই মুহূর্তে গণেশের এক হাতে একটা বড় কাপড়ের ব্যাগ, আরেক হাতে রঙিন এক গোছা কাগজ। সেগুলো 'মনের মানুষ' ছবির হ্যান্ডবিল।

যে মেয়েটা দরজা খুলে দিয়েছিলেন তার নাম টিয়া। সে বলে, 'আমার জন্যে বেলফুলের মালা এনেচ তো গণেশদা?'

গণেশের হাতের ব্যাগটা বেল আর জুঁইয়ের মালায় বোঝাই। এখানকার বাসিন্দাদের পক্ষে সাজগোজটা খুবই জরুরি। খাপরা-ওঠা মুখ, শিরা বেরিয়ে-পড়া রোগা হাত আর ভাঙাচোরা শরীর সস্তা পাউডার-রুজ এবং ফুলের মালায় সাজিয়ে খদ্দেরের চোখ যতটা ধাঁধানো যায়। নইলে কেউ ফিরেও তাকাবে না।

গণেশ এই মেয়েদের ফুল জোগান দেয়। সন্ধেবেলা বিকিকিনির বাজারে দাঁড়াবার আগে মেক-আপটা তো চাই। সাজতে গুজতে ঘণ্টা দেড় দুই লেগে যায়। তাই দুপুরেই ফুল নিয়ে আসে গণেশ।

ওধারে অন্য মেয়েরা অর্থাৎ বকুল গোলাপ বেলা চাঁপা রূপা মুক্তো আর পান্না গোলোকধাম আর লুডো ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। এরা সবাই জানে তাদের জন্য মালা নিয়ে এসেছে গণেশ। তবু রোজকার মতো একই প্রশ্ন করে, 'টাটকা ভাল মালা এনেছ তো?'

গণেশ অন্য সব দিনের মতোই সর্দি-বসা গলাটা নরম করে বলে, 'এনেচি বাপু এনেচি। দুটো বাজার চষে ভাল ভাল মাল নিয়ে এয়েচি।

গণেশ জানে, এখানকার মেয়েগুলোর জীবনে নিত্যনতুন ঘটনা ঘটে না, কথা বলার মতো বিষয়ও অতি সামান্য। তাই রোজ একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে হয়। এতে আদৌ বিরক্ত হয় না গণেশ, ঝাঁঝিয়েও ওঠে না। পেটের জন্য এরা যেখানে এসে ঠেকেছে, প্রতিদিন যে গ্লানি আর অসম্মান গায়ে মেখে এদের ভাতকাপড় জোটাতে হয় তাতে রীতিমত কষ্টই পায় গণেশ, দুঃখী মেয়েগুলোর জন্য অসীম সহানুভূতিতে তার মন ভরে থাকে। আবার এটাও সে জানে, এরা এই নরকে না এলে তার নিজেরও পেটের ভাত জুটত না, কেননা বেশ্যাপাড়ার দালালি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও কাজ সে শেখেনি।

মেয়েগুলো বলে, 'মালা দাও গণেশদা—'

গণেশ এ পাড়ায় পা দিতেই বারান্দার এক কোণে যমুনাকে দেখতে পেয়েছিল। সে বলে, 'যমুনার সঙ্গে একটা দরকারি কথা সেরে তোদের কাছে আসচি। এট্টু সবুর কর।'

গোটা উঠোনটা ইট পেতে সিমেন্ট দিয়ে পয়েন্টিং করা। তার ওপর দিয়ে বড় বড় পা ফেলে গণেশ যমুনার দিকে এগিয়ে যায়।

হিংসেয় অন্য মেয়েদের চোখগুলো জ্বলতে থাকে। তারা জানে যমুনার ব্যাপারে গণেশের রীতিমত পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। দামি দামি পয়সাওলা 'বাবু' সে তাকেই জুটিয়ে দেয়, ওর সঙ্গেই গণেশের যত জরুরি পরামর্শ। রাগে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে গেলেও গণেশের সামনে মুখ ফুটে তো বলার উপায় নেই। গণেশ যে ধরনের মানুষ, ভালর ভাল, মন্দর মন্দ, একবার খেপে গেলে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

যমুনার কাছে এসে গণেশ বলে, 'চল, তোর ঘরে যাই। কথা আচে।'

যমুনা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখোমুখি যে ঘরখানা, সেটা তারই। গণেশের হাতে রঙিন হ্যান্ডবিল দেখে আন্দাজ করে নেয়, ঘরে গিয়ে সে কী বলবে।

নিঃশব্দে, একটি কথাও না বলে যমুনা গণেশকে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে আসে।

চারিদিক পরিপাটি করে সাজানো। এক ধারে তক্তাপোষে ভাঁজহীন ধবধবে বিছানা। আরেক ধারে ছোট আলমারি, খেলো কাঠের ড্রেসিং টেবল, সাজের টেবলটার ওপর পাউডার রুজ আলতা সেন্ট এবং ক্রিমের রকমারি কৌটো আর শিশি। দেওয়ালে দেবদেবীর কোনও ছবি নেই, ভগবান টগবানকে নিজের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না যমুনা। দেওয়ালে অবশ্য অন্য ধরনের কিছু ছবি আছে। সেগুলো সবই প্রাকৃতিক দৃশ্যের—যেমন বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়া, নিবিড় দেবদারুর বন কিংবা সমুদ্রের বেলাভূমি।

আরেক কোণে রয়েছে একটা উঁচু টেবল আর দু'টি চেয়ার। এই টেবলটার ওপর মলাট দিয়ে যমুনা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে বেশ ক'টি বই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে হাল আমলের লেখকদের গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি রয়েছে উলবোনা, রন্ধনপ্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ের বই।

স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ যমুনার মতো মেয়েরা কোনওকালেই পায় না। নিজের চেষ্টায় অনেকটাই শিখেছে সে, একটু-আধটু ইংরেজিও জানে।

অন্য মেয়েরা দিনের বেলায় যখন ঘুমিয়ে, গোলোকধাম আর লুডো খেলে কিংবা পরস্পরের সঙ্গে অকারণে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে সময় কাটায় তখন হয় পাখিকে দানা খাওয়ায় যমুনা কিংবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। সব দিন হয়ে ওঠে না, তবে ফি রবিবার তিন চারখানা বাংলা খবরের কাগজ গণেশকে দিয়ে কিনিয়ে আনে। এই সব পত্রপত্রিকায় রবিবারের ম্যাগাজিনে যে সব লেখাটেখা থাকে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। এতেও অন্য মেয়েদের ঘোর আপত্তি। মুখ বাঁকিয়ে বিদ্রূপের গলায় তারা বলে, 'আছিস তো বাপু নদ্দমায় মুখ গুঁজে। বেচিস গায়ের মাংস। তার আবার বিদ্যেসাগর হবার সাধ! মুখে আগুন।'

অন্যদের মনোভাব যাই হোক, এই পড়াশোনার কারণে মনে মনে যমুনাকে যথেষ্ট সমীহ করে থাকে গণেশ।

যমুনা ওপাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলে, 'বসো গণেশদা।'

ডান হাতের থলে মেঝেতে নামিয়ে রেখে চেয়ারটায় বসতে বসতে গণেশ বলে, 'আজ কী কারবার হয়েচে জানিস?' কারবার শব্দটা তার কথার মাত্রা।

যমুনা লক্ষ করে, গণেশের চোখেমুখে এবং গলার স্বরে উত্তেজনা ফুটে বেরিয়েছে। বিছানার এক কোণে আলতোভাবে বসে খুব শান্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'মনে হচ্ছে—জানি।'

কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গণেশ। তারপর বাঁ হাতে হ্যান্ডবিলগুলো উঁচুতে তুলে জিজ্ঞেস করে, 'এগুলো দেকেচিস?'

যমুনা জানায় হাতে পায়নি, তবে দূর থেকে হ্যান্ডবিলগুলো দেখেছে।

গণেশ বলে, 'কোতায় দেকলি?'

কিছুক্ষণ আগে সিনেমার লোকেরা সাইকেল রিকশায় করে মাইকে চেঁচাতে চেঁচাতে এবং হ্যান্ডবিল বিলি করতে করতে যে এ পাড়ার সামনে দিয়ে গেছে তা জানিয়ে দেয় যমুনা।

হাতের হ্যান্ডবিলটা নাড়তে নাড়তে গণেশ বলে, 'এতে কী নেখা আচে জানিস?'

'পড়িনি, কিন্তু জানি। কাল থেকে 'মোহিনী' সিনেমায় 'মনের মানুষ' দেখানো হবে।'

'আরও মজা আচে, পড়ে দ্যাক। এই ধর।'

হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডবিলটা নেয় যমুনা। কারা কারা 'মনের মানুষ' ছবিতে অভিনয় করেছে তাদের নাম কায়দা-করা বড় হরফে ছাপা হয়েছে। তলায় আলাদা করে লাল বর্ডারের ভেতর রয়েছে পরিচালক অমরেশ চৌধুরী আর নায়িকা দীপান্বিতার নাম। জানানো হয়েছে তাঁরা কাল চারটের শো'য়ে এ ছবির উদ্বোধন করবেন।

লেখাপড়ার দিক থেকে গণেশ একবোরে আকাট। তার পেটে দশটা গুঁতো মারলেও 'ক' অক্ষর বেরুবে না। একজনকে দিয়ে খানিকক্ষণ আগে হ্যান্ডবিল পড়িয়েছে সে। এতে কী লেখা আছে, সব তার জানা। তবু যমুনাকে বলে, 'পড়ে শোনা দিকিন।'

যমুনা জোরে জোরে পড়ে যায়। শুনতে শুনতে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে গণেশের, চোখদুটো কুঁচকে যায়। ঘড়ঘড়ে গলায় সে বলে, 'তোর নাম কোতাও লেই?'

'না।'

'ভাল করে দেকেচিস?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।'

'কী কারবার রে? অমরেশ শালার খজরামোটা বুজলি? বলেছিল না, 'মনের মানুষ' বেরুবার সময় তোর নাম ছেপিয়ে দেবে?'

মাথা হেলিয়ে যমুনা জানায়, এইরকম একটা আশ্বাস তাকে দেওয়া হয়েছিল।

'আর কী বলেছিল?'

উত্তর দেয় না যমুনা। আস্তে আস্তে মুখটা ডান দিকে ফেরায়। সেখানে দেওয়াল ফুটিয়ে একটা জানালা বার করা হয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে ধোঁয়াটে রঙের পাহাড়ের রেঞ্জ চোখে পড়ে। কয়লাখনিগুলো ওখানেই। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে যেন দেখতে পায়, দু'বছর আগের সেই দিনগুলো অদৃশ্য সিনেমার পর্দায় ফুটে উঠছে।

অমরেশ চৌধুরীরা সেবার আয়রন ফ্যাক্টরির টাউনশিপে এসে উঠেছিল। উদ্দেশ্য এখানকার পাহাড়ের ভিসুয়ালস, কোল মাইন, আয়রন ফ্যাক্টরি ইত্যাদি ব্যাকগ্রাউন্ডে

রেখে শুটিং করা। 'মনের মানুষ' ছবির গল্পে এসব নাকি খুবই জরুরি।

এই ছবির একটা জায়গায় নায়ক এক দেহ-পসারিণীর প্রেমে পড়বে। মেয়েটি পেটের জন্য নোংরা ঘাঁটলেও তার অন্তঃকরণ অতি পবিত্র। সে-ও নায়ককে আন্তরিক ভালবেসেছে। কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না, এদিকে নায়কের বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছে। এই মেয়েটিও খুব ভাল, স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, অত্যন্ত পতিব্রতা। দুই নারীর প্রেম নিয়ে এ ছবিতে তীব্র নাটকীয়তা তৈরি করা হয়েছে। চরম ক্লাইমেক্সে গণিকা মেয়েটির আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটবে, ইত্যাদি।

অমরেশের মাথায় বাই চাগিয়ে উঠল সত্যিকারের একটি বেশ্যাকে দিয়ে দেহ-পসারিণীর রোলটা করাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে গণেশের সন্ধান পায়। গণেশ তাকে যমুনার কাছে নিয়ে আসে।

কলকাতা থেকে দেড় দু'শো মাইল দূরে এমন বাজে নোংরা বেশ্যাপাড়ায় যমুনার মতো একটা মেয়েকে পাওয়া যাবে, ভাবতে পারেনি অমরেশ। যমুনার কথাবার্তা, আচরণ মুগ্ধ করেছিল তাকে। যে মেয়েটিকে ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারে মানাতো সে কিনা নর্দমায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে! অমরেশ মনস্থির করে ফেলেছিল, তার ছবির গণিকার রোলটা যমুনাকে দেবে। সেদিনই কনট্রাক্ট করে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে গিয়েছিল।

যমুনা চমকে দিয়েছিল অমরেশ এবং তার ইউনিটকে। যে মেয়েটা কোনওদিন কড়া আর্ক ল্যাম্পের তলায় ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায়নি সে তুখোর অভিনেত্রীর মতো চমৎকার অভিনয় করে গেছে। যেভাবে তাকে দাঁড়াতে বা সংলাপ বলতে কিংবা মুখচোখের বিশেষ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে বলা হয়েছে তক্ষুণি হুবহু তাই করেছিল যমুনা। একটি শটও এন জি হয়নি, নষ্ট হয়নি এক সেন্টিমিটার ফিল্মও। একবারেই প্রতিটি দৃশ্য ও.কে হয়ে গিয়েছিল।

যমুনার মধ্যে এক দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী লুকনো ছিল। তাকে আবিষ্কার করতে পেরে দারুণ উত্তেজিত অমরেশ। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে সে চাপা গলায় বার বার বলেছে, 'দেখবে, এই ছবি রিলিজ হলে তোমার খুব নাম হবে। রাতারাতি তুমি ফেমাস হয়ে যাবে।'

ফেমাস শব্দটার মানে যমুনার অজানা নয়। দারুণ ভাল লেগেছিল তার, আবার লজ্জাও পাচ্ছিল। তবে এই প্রশংসা এবং সুখ্যাতি তাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তার পা মাটিতেই ছিল। সে কী, এই পৃথিবীতে তার সঠিক জায়গাটি কোন আবর্জনার মধ্যে, এক মুহূর্তের জন্যও তা ভোলেনি যমুনা। নতমুখে, নখ খুঁটতে খুঁটতে আধফোটা গলায় বলেছে, 'আমার কথা আপনি সবই জানেন। আমাদের মতো মেয়েদের আবার নাম!'

অমরেশ যমুনার কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ গলায় বলেছে, 'নিজেকে এত ছোট ভাবো কেন? ইচ্ছে করে তো আর ওই হেল-এ যাও নি। এই সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে, বিশেষ করে মেয়েদের নষ্ট করে দিচ্ছে। আমাদের সোস্যাল প্যাটার্নই এর জন্য দায়ী।'

সমাজ-ব্যবস্থা ট্যবস্থার মতো ভারি ভারি ব্যাপারগুলো ভাল করে মাথায় ঢোকেনি যমুনার। কিন্তু অমরেশের বলার মধ্যে এমন আন্তরিকতা এবং গাঢ় গভীর সহানুভূতি ছিল যা তাকে আমূল নাড়া দিয়ে গেছে। তার মতো মেয়েদের সম্বন্ধে এভাবে আগে আর কাউকে বলতে শোনেনি। মনুষ্যজাতির যে ওঁচা প্রতিনিধিরা রাতের অন্ধকারে তার কাছে হানা দেয় তারা হল চোর, জোচ্চোর, খুনী, মাতাল, ফেরেববাজ, ধর্ষণকারী, ছেনতাইওলা, ইত্যাদি। এরা সবাই মিলে মানুষ সম্পর্কে তার ধারণা প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। মানুষকে সে বিশ্বাস করে না, এদের সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধা নেই। এ জাতীয় মনোভাব সত্ত্বেও অমরেশকে ভাল লেগে গিয়েছিল। সে যাদের চেনে, প্রতিদিন রাতে এসে মানুষ সম্পর্কে তার অশ্রদ্ধা বিরূপতা এবং বিদ্বেষকে যারা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে যায় অমরেশ তাদের কেউ নয়। সে যেন এক অলৌকিক নিষ্পাপ জগতের বাসিন্দা, অপার্থিব কোনও নিয়মে যমুনার কাছে চলে এসেছে।

অমরেশ ফের বলেছে, 'তুমি যে পাড়ায় থাক, এইরকম সব এলাকা থেকে কত বড় বড় ফিল্ম আর স্টেজের আর্টিস্ট বেরিয়েছে জানো?' বাংলা নাটক ও সিনেমার আদি যুগে কলকাতার বেশ্যাপাড়ার কোন কোন মেয়ে শিল্পী হিসেবে সারা দেশ মাতিয়ে দিয়েছিল তাদের লম্বা তালিকা মুখস্থ বলে গিয়েছিল অমরেশ। সেই সঙ্গে জানিয়েছে, 'এরা আমাদের গর্ব।'

মুগ্ধ হয়ে শুনে গেছে যমুনা।

অমরেশ এবার বলেছে, 'তোমার মধ্যে কী দারুণ ব্যাপার আছে, জানো না। আমার পরের ছবিতে তোমাকে আরও বড় রোল দেব। দু-একটা ছবি রিলিজ করলে প্রোডিউসার আর ডিরেক্টররা তোমার কাছে লাইন লাগাবে।'

এ সব অলীক ঘটনা তার মতো মেয়ের জীবনে যে ঘটতে পারে না, এ রকম পরিষ্কার ধারণা যমুনার ছিল। তবু অমরেশের কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগছিল তার, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হচ্ছিল। সে বলেছে, 'আমার কাছে এ সব স্বপ্ন।'

অমরেশ বলেছে, 'জানো তো আমরা ড্রিম মার্চেন্ট।'

কথাটার অর্থ জানত না যমুনা। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'মানে?'

অমরেশ বলেছে, 'সপনোকা সওদাগর।' একটু থেমে আবার শুরু করেছে, 'সওদাগর না বলে স্বপ্নের ফেরিওলা বলতে পার। আমরা ফিল্মের মধ্যে স্বপ্ন ঢুকিয়ে

ফেরি করে বেড়াই।'

যমুনা দারুণ বুদ্ধিমতী। সে বলেছে, 'কিন্তু সে স্বপ্ন কি সত্যি হয়?'

'না। তবে তোমার বেলায় হবে।'

বেশ কয়েকদিন ধরে শুটিং চলেছিল। এর ভেতর মাঝে মাঝেই লুকিয়ে চুরিয়ে স্টিল ফ্যাক্টরির টাউনশিপ থেকে এসে যমুনার কাছে রাত কাটিয়ে গেছে অমরেশ।

কত মানুষই তো এসেছে তার জীবনে। এরা মানুষ না, আগাপাশতলা জন্তু। সেই প্রথম অমরেশের মধ্যে তার কাম্য পুরুষটিকে যেন পেয়ে গিয়েছিল যমুনা। কথাবার্তায়, ব্যবহারে এমন সুন্দর, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল মানুষ আগে আর কখনও দেখেনি সে।

দিন দশেক এ অঞ্চলে কাটিয়ে অমরেশ তার ইউনিট নিয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে সে জানিয়ে গেছে, খুব শিগগিরই তার নতুন ছবিতে অভিনয় করার জন্য লোক পাঠিয়ে যমুনাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। তারপর আর তাকে পেছন দিকে ফিবতে হবে না। কলকাতা তার জন্য গোলাপ বাগান সাজিয়ে দেবে।

অমরেশ আরও বলেছিল, 'মনের মানুষ' ছবি যেখানে যেখানে রিলিজ করবে সেই সব হল-এ যমুনাকে নিয়ে গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় কবিয়ে দেবে।

কিন্তু সেই যে অমরেশ তার ভেতরকার ঘুমন্ত দুরাশাকে উসকে দিয়ে চলে গিয়েছিল, তারপর দুটো বছর কেটে গেছে। কিন্তু যমুনার কাছে সে আর লোক পাঠায়নি বা চিঠি লেখেনি কিংবা অন্য কোনওভাবেই যোগাযোগ করেনি। দুশো মাইল দূরের মহানগর তার স্মৃতি থেকে এক ওঁচা বেশ্যাপাড়ার নগণ্য দেহ-পসারিণীকে একেবারে মুছে দিয়ে থাকবে।

ধীরে ধীরে যমুনার স্বপ্নের চড়া রং মলিন হতে হতে ঝাপসা হয়ে গেছে। অমরেশের কথা যখন সে ভুলতে বসেছে এবং ধরেই নিয়েছে এখানে নর্দমার নোংরা পোকার মতো মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হবে বাকি জীবন এবং এটাই তার অনিবার্য নিয়তি, সেইসময় খবর এল কাল 'মোহিনী' সিনেমায় অমরেশ আসছে।

যমুনা ভবে, আয়রন ফ্যাক্টরির টাউনশিপে যখন আসবেই, তখন তার কথা কি একবারও মনে পড়বে না অমরেশের? মরে-আসা ক্ষীণ একটু আশা কোথায় যেন চাপা পড়ে ছিল। হঠাৎ সেটা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। অমরেশ কোনও কারণে তাদের পাড়ায় না আসতে পারলেও লোক পাঠিয়ে তাকে কি আর ছবি দেখার জন্য নিয়ে যাবে না? সে কথা দিয়ে গিয়েছিল, ছবি যেখানেই রিলিজ করবে সেখানেই যমুনাকে নিয়ে যাবে। অন্য কোথাও রিলিজ করছে কিনা সে জানে না। কিন্তু যমুনা এ অঞ্চলের বাসিন্দা, 'মনের মানুষ'-এ বড় একটা 'রোল' করেছে, তা ছাড়া এখানে

ছবিটা রিলিজ করছে। তাকে খবর না দিয়ে পারবে না অমরেশ। সে—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই গণেশ বলে ওঠে, 'ওই শালা তোকে বলেছিল না, সিনেমায় হিরো-ইন ফিরো-ইন বেনিয়ে দেবে?'

যমুনা চমকে গণেশের দিকে তাকায়। এই নরকে একমাত্র এই একটি লোককেই সে খানিকটা বিশ্বাস করে। নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা তাকে বলে। অমরেশের কথাও তাকে জানিয়েছিল।

যমুনা আধফোটা গলায় বলে, 'হ্যাঁ, বলেছিল।'

'তারপর খজড়াটা এ ধার মাড়ায়নি। সপনো ফপনো দেকিয়ে রাত্তিরে এসে মধুটি ঠিক লুটে লিয়ে গেচে। ওকে ছাড়বি না যমুনা।'

'তুমি কি আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলচ?'

'যদি লিজে থিকে না আসে কি খপর না দেয়, নিঘ্‌ঘাত দেকা করবি।'

'দেখি।'

'দেকি লয়, যা বলচি তাই করবি। শালাকে ছাড়া হবে না।' বলতে বলতে কাপড়ের থলে থেকে দু'গাছা জুঁইয়ের মোটা মালা বার করে টেবলের ওপর রাখে গণেশ, 'এই তোর মালা রইল। আমি এখন যাই।'

গণেশ চলে যায়।

দুরাশা আর আশাভঙ্গের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে যমুনা।

পরদিন সকাল থেকেই সে টের পায়, অদ্ভুত এক উত্তেজনা তার মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে। বেলা যত চড়ে সেটা ক্রমশ বাড়তেই থাকে।

কিছুক্ষণ পর পরই বারান্দায় এসে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে পাঁচিলের ওপারের রাস্তাটার দিকে তাকায় যমুনা। এই বুঝি 'মোহিনী সিনেমা' থেকে অমরেশের লোক এল। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত অনেক বার বারান্দায় ছোটাছুটি করেও কারও দেখা পাওয়া গেল না।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে কোনওরকমে স্নান সেরে, চাট্টি চাল ফুটিয়ে খেয়ে নেয় যমুনা। খেতে খেতে মনস্থির করে ফেলে গণেশের কথামতো আর কিছুক্ষণ দেখে সে নিজেই 'মোহিনী সিনেমা'য় চলে যাবে।

বেলা একটু হেলে গেলে নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে সাজতে বসে যমুনা। চুল বেঁধে খোঁপায় যখন রুপোর কাঁটা গুঁজছে সেই সময় আয়নায় তার মুখের পাশে কেষ্টভামিনীর চাকার মতো গোল মাংসল মুখ ফুটে ওঠে। সে চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে।

যমুনা বেশ অবাক হয়ে ঘুরে বসে। কেষ্টভামিনী এই পাড়ারই পুব দিকের দু'খানা

বড় ঘর নিয়ে থাকে এবং তার এই সাম্রাজ্যটি প্রবল দাপটে চালিয়ে যায়। দুপুরবেলায় ঝাড়া তিন-চার ঘণ্টা সে পরিপাটি দিবানিদ্রা দিয়ে থাকে। আজ সেটি স্থগিত রেখে কেন যে তার কাছে হানা দিয়েছে, বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে যমুনা।

কেষ্টভামিনীও কম অবাক হয়নি। এ পাড়ার মেয়েরা সেই পড়ন্ত বেলায় সাজগোজ করতে বসে। এই তো সবে দুপুর পেরুল। এর মধ্যে যমুনার সাজার কারণ সে বুঝতে পারে না।

একসময় যমুনা বলে, 'তুমি কেষ্টমাসি! আজ ঘুমোও নি যে?'

কেষ্টভামিনী তার বিপুল শরীর এবং সর্বাঙ্গে দু-তিন কেজির মতো জমকালো সোনা-রুপোর গয়না নিয়ে হেলেদুলে ঘরে ঢুকে থপ করে যমুনার কাছে বসে পড়ে। বলে, 'শুয়ে তো ছিলুম। চোকও বুজে এয়েছিল, কিন্তু ঘুমোতে দিলে কই? তা তুই সাত তাড়াতাড়ি সাজতে বসেচিস যে?'

যমুনা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই কেষ্টভামিনী ফের বলে ওঠে, 'সাজচিস, ভালই করচিস। আগরওলা লোক দিয়ে গাড়ি পাঠিয়েচে। ড্যামনাটা আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে বিছানা থেকে তুলে ছাড়লে। তাড়াতাড়ি সেজেগুজে লে, লোকটার সঙ্গে বেরুতে হবে।'

আগরওলা কোল মাইন অঞ্চলের বড় ব্যবসাদার। ধানকল, কোল্ড স্টোরেজ ছাড়াও সাইকেলের বড় ডিলার। বেশির ভাগ সময় কলকাতায় কাটায়। সেখানেও তার প্রচুর ব্যবসা। মাঝে মধ্যে এখানে এলে যমুনাকে তার চাই-ই। কয়েকটা রাতের জন্য তার কাছে যমুনার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

আগরওলা লোকটা ভাল। বাইরের মেয়ে নিয়ে যারা ফুর্তি ফার্তা করে তাদের হল 'ফেল কড়ি মাখ তেল'। কিন্তু যমুনা সম্পর্কে আগরওলার আলাদা একটা টান আছে। সেটা তার ভাল ব্যবহার, সুন্দর রুচি এবং চেহারার স্নিগ্ধ লাবণ্যের কারণে। যমুনার জন্য অঢেল পয়সাও খরচ করে সে। শুধু যমুনাই না, আগরওলা তাকে ইচ্ছামতো পাওয়ার জন্য কেষ্টভামিনীকেও সন্তুষ্ট রাখে। ভাল পয়সা সে-ও পেয়ে থাকে। কাজেই আগরওলার ডাক যখন এসেছে, কেষ্টভামিনী দুপুরের ঘুমটি শিকেয় তুলে ছুটে এসেছে। অন্য কেউ এসময় এলে চিৎকার এবং খিস্তিখেউড়ে তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দিত।

এদিকে আগরওলার নাম শুনে চমকে উঠেছে যমুনা। তার যে ধরনের ব্যবসা তাতে এইরকম খদ্দেররা লক্ষ্মী। আগরওলা সম্পর্কে তার খানিকটা দুর্বলতাও আছে। আর যাই হোক, এখানে যারা রোজ সন্ধেয় হানা দেয় সে তাদের মতো জন্তু নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন দূরবর্তী মোহময় এক স্বপ্ন আবছা সঙ্কেতের মতো চোখের

সামনে ফুটে উঠতে শুরু করেছে তখন আগরওলার গাড়ি পাঠানো তাকে অস্থির করে তোলে। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটে যায়।

যমুনা বলে, 'আগরওলার লোককে ফিরিয়ে দাও মাসি।'

হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়েছিল কেষ্টভামিনী। ফের আস্তে আস্তে বসে পড়ে। ভুরু এবং কপাল কুঁচকে যায় তার, চোখের দৃষ্টি খর হয়ে ওঠে। সে বলে, 'কী বলচিস লা ছুঁড়ি, আগরওলার লোককে ফিরিয়ে দেব! মাথাটা কি তোর খারাপ হয়ে গেল!'

যমুনা বলে, 'আমি আজ আগরওলার ওখানে যেতে পারব না। আমার অন্য কাজ আছে।'

কেষ্টভামিনীর ভেতর থেকে এবার জবরদস্ত বাড়িউলি প্রবল প্রতাপে বেরিয়ে আসে। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলে, 'কী এমন রাজকায্য শুনি।'

'আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'কোতায়?'

যমুনা উত্তর দেয় না। কেষ্টভামিনীকে খানিকটা অগ্রাহ্য করেই দুই ভুরুর মাঝখানে একটি গাঢ় গোলাপি টিপ আঁকতে থাকে।

রাগে কেষ্টভামিনীর নাকের পাটা ফুলে ওঠে। গলায় মাংসের থাকগুলি কাঁপতে থাকে। আগের স্বরেই আবার বলে, 'কতার জবাব দিচ্চিস না যে?'

যমুনা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'মোহিনী সিনেমায়।'

'অ, তা হলে ওরা যা বলাবলি করচে সেটাই ঠিক। সিনেমার সে-ই ছোঁড়াটা সেবার এসে তোর মাথা খেয়ে গিয়েচিল। শুনলাম, আজ ফের আসচে। 'মোহিনী হল'-এ কী সব হবে। শ্যামের বাঁশি শুনতে পেয়েচিস বুঝিন?'

যমুনা উত্তর দেয় না।

কেষ্টভামিনী জানে যমুনা তার হাতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। এখানকার আর দশটা হতচ্ছাড়া চেহারার ছুকরির সামনে যেভাবে দাপট দেখানো যায়, যমুনার সঙ্গে সবসময় তেমনটি চলবে না। যমুনা যদি তার চোখে ধুলো দিয়ে কোনও দিন ফুড়ুৎ করে, তার এই মেয়েপাড়া একেবারে কানা হয়ে যাবে। যমুনাকে দেখিয়ে কত টাকা যে সে কামিয়ে থাকে একমাত্র সে-ই জানে। কাজেই তার সঙ্গে খুব হিসেব করে কথা বলতে হয়। কখনও গরম, কখনও নরম।

কেষ্টভামিনী এবার যমুনার পিঠে একখানা হাত রেখে গলায় যতখানি সম্ভব মায়া ঢেলে বলে, 'ও সব তাল ছাড় যমুনা। কলকাতায় থাকে ওই ছোঁড়া। চেনা নেই, জানা নেই, দু'দিনের জন্যে এসে তোর মাথাটা বিগড়ে দিয়ে গেল। ওর খপ্পরে পড়লে তোর কী সর্বনাশ করবে, কোথায় নিয়ে ভাসিয়ে দেবে, তার কি কিছু ঠিকঠিকানা আচে!'

যেন মেয়েমানুষ হিসেবে যমুনার সর্বনাশের কিছু বাকি আছে এবং এখনও সে

ভেসে যায় নি! মনে মনে হেসেই ফেলে সে আর গভীর মনোযোগে টিপটা এঁকে যায়।

কেষ্টভামিনী বলে, 'কি রে, আমার কতা কানে গেল?'

নিচু গলায় যমুনা উত্তর দেয়, 'গেছে।'

সংশযের গলায় কেষ্টভামিনী জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে আগরওলার ওখেনেই যাচ্চিস তো?'

'না।'

'ওই সিনেমার ছোঁড়াটার কাচেই যাবি?'

'তাই তো ভেবেছি।'

'আমি যে গলায় রক্ত তুলে তোকে বোঝালাম, তার ফল হল এই?'

যমুনা চুপ।

একটা চোখ ছোট করে কিছু ভাবে কেষ্টভামিনী। পঁচিশ বছর এই মেয়েপাড়া চালাচ্ছে। এখানকার ছুকরিদের মনস্তত্ত্ব তার নখের ডগায়। এতক্ষণ পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণীর মতো যমুনাকে বুঝিয়েছে। এখন নিজের আসল মূর্তিটা অদৃশ্য খাপের ভেতর থেকে বার করে আনে। এক ঝটকায় বিশাল শরীরটা টেনে তুলে কোমরে হাত রেখে, চোখ লাল করে, চিৎকারে খিস্তিতে সমস্ত পাড়াটাকে তটস্থ করে তোলে।

'খজরী মাগী, পাখনা গজিয়েচে! হয় আগরওলার গাড়িতে উঠবি, লইলে লাথি মেরে একেন থেকে বার করে দেব। মালপত্তর গুচিয়ে লে।'

কেষ্টভামিনী যেন বড় রকমের এক জুয়ায় বাজি ধরে বসে। সে জানে, এখান থেকে চলে যাবার ঝুঁকি নেওয়া এই মুহূর্তে যমুনার পক্ষে খুব সহজ নয়। অবশ্য সিনেমার সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হলে মেয়েটা কী করবে, সেটা আগে থেকে বলা যায় না। ঝোঁকের মাথায় মানুষ কত কী-ই তো করে বসে! তার সঙ্গে দেখাটাই করতে দেবে না কেষ্টভামিনী।

আগরওলা ঠিক সময়েই লোক পাঠিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আগরওলার গাড়িতেই উঠতে হয় যমুনাকে। কেষ্টভামিনীর মেয়েপাড়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারে না।

পেছনের সিটের আরামদায়ক নরম গদিতে বসে আছে যমুনা। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে উমাপদ। লোকটাকে অনেকদিন ধরেই চেনে যমুনা। আগরওলার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে বছরে আট-দশ বার এসে সে এই মেয়েপাড়া থেকে তাকে নিয়ে যায়। আগরওলার প্রতি তার আনুগত্য প্রায় কুকুরের মতো।

উমাপদর বয়স চল্লিশের ওপরে। ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা মজবুত চেহারা। গায়ের রং ঘোর কালো। গোল মাংসল মুখে বসন্তের দাগ। ট্যারাবাঁকা দাঁত পান-জর্দার

চিরস্থায়ী কালচে রঙে ছোপানো। ডান গালে একটা বড় আঁচিল, থ্যাবড়া থুতনি। পরনে ফিনফিনে ধুতি আর হাফ হাতা পাঞ্জাবি। তলায় জালি-কাটা গোলাপি গেঞ্জি। গলায় সোনার চেন।

চেহারা যেমনই হোক, উমাপদ মানুষটা খারাপ নয়। নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে তার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

কোল মাইনের দিকে যেতে যেতে উমাপদ ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এবার অনেকদিন পর তোমায় লিয়ে যাচ্চি।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল যমুনা। অন্যমনস্কর মতো সে জবাব দেয়, 'হুঁ।'

'আগরওলাজি তিন মাস এদিকে আসেন নি, তাই তোমাদের এখানে আমারও আসা হয়নি।'

'হুঁ।'

'তুমি ভাল আচো তো দিদি?'

কিছু ভাবছিল যমুনা। হঠাৎ সে মনস্থির করে ফেলে। সামনের দিকে ঝুঁকে বলে, 'উমাপদদা আমার একটা কথা রাখবে?' তার চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে অসীম ব্যগ্রতা।

উমাপদ বেশ অবাকই হয়। বলে, 'কী?'

'আগরওলাজির ওখানে যাবার আগে একবার 'মোহিনী সিনেমা'টা ঘুরে যেতে চাই।'

'সে তো উল্টোদিকে, সেই লোহা ফ্যাক্টরির টাউনে।'

'হ্যাঁ।'

'অতটা ঘুরে গেলে দেরি হয়ে যাবে যে দিদি। আগরওলাজি খেপে যাবেন।'

'আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলব।'

দ্বিধান্বিতভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকে উমাপদ। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'মোহিনী সিনেমা'য় জরুরি কাজ আচে?'

যমুনা মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'অন্য একদিন ওটা করলে হয় না?'

'না।'

'ঠিক আচে, তোমাকে আমি লিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পার কাজটা চুকিয়ে ফেল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার চিন্তা নেই।'

অগত্যা উমাপদ ড্রাইভারকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে লোহা কারখানার টাউনশিপের দিকে যেতে বলে।

'মোহিনী সিনেমা'য় পৌঁছে দেখা যায়, চারিদিকে প্রচণ্ড ভিড়। সামনের কোলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটার মাথায় 'হাউস ফুল' বোর্ড। জন পনের কুড়ি আর্মড পুলিশ গেটের বাইরে পাহারা দিচ্ছে। হল-টার সারা গায়ে, 'মনের মানুষ' ছবির বিরাট বিরাট হোর্ডিং। সেগুলোতে হিরো বরুণ সমাদ্দার, হিরো-ইন দীপান্বিতা, ড্যান্সার বিজয়লক্ষ্মী-টি, ভিলেন নরেশ মুৎসুদ্দির বড় বড় রঙিন ছবি। তা ছাড়া টাইপ ক্যারেক্টার আর্টিস্ট মধু গোস্বামী; সোনালি বটব্যাল, হরেন বিশ্বাসদের ছবি রয়েছে। কিন্তু কোথাও যমুনার ছবি বা নাম দেখা যায় না।

গাড়ি থেকে নেমে মানুষের থিকথিকে ভিড় ঠেলে গেটের কাছে চলে আসে যমুনা। পুলিশ তাকে আটকে দেয়।

যমুনা বলে, 'ডিরেক্টর অমরেশ চৌধুরী কি এসেছেন?'

পুলিশ জানায়, শুধু অমরেশ চৌধুরই না, নায়িকা দীপান্বিতাও পৌঁছে গেছেন।

যমুনা বলে, 'অমরেশ চৌধুরীর সঙ্গে আমি একটু দেখা করব। বিশেষ দরকার।'

পুলিশ জানায় দেখা হওয়া সম্ভব নয়। এখন কাউকে ভেতরে যেতে দেবার হুকুম নেই।

হাতজোড় করে বার বার অনুরোধ জানায় যমুনা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেটের ওধারে 'মোহিনী সিনেমা'র ম্যানেজার নকুলেশ চট্টরাজ ব্যস্তভাবে এখানকার কয়েকজন এমপ্লয়িকে হাত নেড়ে নেড়ে কী সব বলছে। লোকটাকে অনেক দিন ধরেই চেনে যমুনা। মাঝরাতে প্রায়ই তার ঘরে হানা দেয় সে।

যমুনা খানিকটা ভরসা পায়। একমাত্র নকুলেশই ইচ্ছা করলে গেটের তালা খুলে দিতে পারে। প্রায় বেপরোয়া ভঙ্গিতেই সে গেটের আরও কাছে গিয়ে ডাকে, 'নকুলেশবাবু—'

নকুলেশ তাকে দেখে চমকে ওঠে। রাতে যার ঘরে লুকিয়ে চুরিয়ে যাওয়া যায়, দিনের আলোয় লোকজনের সামনে তাকে দেখে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের মতো সে বলে, 'কী ব্যাপার? কাকে চাই?'

'অমরেশ চৌধুরীর সঙ্গে একবার দেখা করব। দু মিনিটের বেশি কথা বলব না।'

মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে কর্কশ গলায় নকুলেশ বলে, 'না, এখন দেখা হবে না।' বলে দাঁড়ায় না, লম্ব লম্বা পা ফেলে ভেতর দিকে উধাও হয়ে যায়।

হতাশ, বিপর্যস্ত যমুনা বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে ফের আগরওলার গাড়িতে গিয়ে ওঠে।



তিন

শেষ পারানি

নয়নপুরের এই অংশটা সব চাইতে জমজমাট।

একটা খোয়ার রাস্তা উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণে গেছে। তার দু'ধারে দোকান পসার। পান-বিড়ির দোকান, ভুষিমালের দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান। তামা কাঁসা সোনা রুপো মনিহারি পোদ্দারি, কত রকমের কারবার যে এখানে ছড়ানো, লেখাজোখা নেই। কলকাতার ধাঁচে এখানকার রেস্টুরেণ্টের নাম 'শ্যামলী কাফে,' হেয়ার কাটিং সেলুনের নাম 'কেশবিন্যাস', লণ্ড্রির দোকানের নাম 'মলিন মুক্তি'। বিজলি আলোর দাক্ষিণ্য এখনও এসে পৌঁছয়নি, তাই বাজারের মাঝমধ্যিখানে ডায়নামো চালিয়ে একটা সিনেমা হল আসর জাঁকিয়ে বসেছে। দিনে দু'বার শো, শো আরম্ভের আগে দু'বারই বেশ সমারোহ করে চটকদার হিন্দি গান বাজানো হয়।

দক্ষিণে রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেটা উঁচু বাঁধ। বাঁধের তলায় নদী, ওপারে সারি সারি ধানচালের আড়ত। উত্তরের শেষ প্রান্তে হারান সাধুখাঁর পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। হারান এ তল্লাটের সব চাইতে বড় বিড়ি-সিগারেটের কারবারী। দশ-বারো জন কারিগর সারাদিন বিড়ি বেঁধে হিমশিম খেয়ে যায়, মস্ত উনুনে তারের জাল পেতে সেই বিড়ি সেঁকা হয়।

তিরিশ বছর আগে নয়নপুরে এসেছিল বৃন্দাবন, তখন তার বয়েস পঁচিশ। সেই থেকে হারানের দোকানে বিড়ি বাঁধার কাজ করে যাচ্ছে। বাজে-পোড়া ঢ্যাঙা তালগাছের মতো চেহারা, ভাঙাচোরা মুখ, মাথার চুল ধোঁয়াটে রঙের। সমস্ত দিন নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে বিড়ি বেঁধে যায় সে, এছাড়া আরেকটি শখও রয়েছে। ছোটোখাটো একটা কীর্তনের দল আছে তার, কোথাও ডাক পড়লে গাইতে যায়। বিশেষ করে শবযাত্রায় যাবার ডাকই বেশি আসে।

মাসটা আষাঢ়। সেই বিকেল থেকে থেমে থেমে রুপোর গুঁড়োর মতো চোখভোলানো বৃষ্টি পড়ছে।

এখন দোকানের সামনের দিকে বসে আছে হারান। ওখানে বসেই সে বেচাকেনা করে। কালো থলথলে শরীর, গলা বলে কিছু নেই, ঘাড়ের ঠিক ওপরেই মুণ্ডুটা জোড়া লাগানো। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, কলপ-মাখা বাবরি পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

পেছন দিকে কারিগরদের বসবার জায়গা। সেখানে মা কালীর ফটোও যেমন

আচে তেমনি আলুথালু-বসনা সিনেমা-নায়িকাদের ছবিও ভক্তিভরে সারি সারি সাজানো। অন্য কারিগরেরা আজ আগেভাগেই চলে গেছে। শুধু বৃন্দাবন আর অল্পবয়সী একটি ছোকরা, নাম লোটন; বিড়ি বাঁধছে।

দেখতে দেখতে ঝপ করে সন্ধে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নদীর দিক থেকে বাতাসও ছাড়ল, সাঁই সাঁই ঝড়ো বাতাস। বৃষ্টিটাও আর রুপোর গুঁড়ো হয়ে রইল না, পলকে তাতে সীসের রং ধরে গেল, আর ধারাল ফলায় তা ঝরতে লাগল।

বর্ষার রাতে লোকজনের আনাগোনা কম, নেই বললেই হয়। বাজার-পাড়ার দোকানে দোকানে আলো নিভছে, ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে।

হারান একবাব আকাশের দিকে তাকাল, তারপব কোণাকুণি উত্তরে। তার দোকানের পর খানিকটা জায়গা ফাঁকা, বাড়িঘর কিছু নেই, অল্প অল্প ঝোপঝাড় শুধু। ওই জায়গাটা পেরিয়ে গেলেই কামিনীপাড়া। দিনের বেলায় পাড়াটা পড়ে পড়ে ঝিমোয়, তারপর রাত গাঢ় হলে, বাজারের বাতি একে একে নিভলে ওখানে আলোর ফোয়ারা ছোটে। বাজারের রসিক নাগরেরা ভনভনে মাছির মতো সেখানে গিয়ে জোটে, বাকি রাত কামিনীপাড়ায় প্রমত্ত উৎসব চলতে থাকে।

আজ বর্ষার রাতে ওখানে একটু পরেই আসর জমবে। হারান চঞ্চল হয়ে উঠল, কেননা তার বাঁধা মেয়েমানুষ আছে কামিনীপাড়ায়।

ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে যেখানে কারিগরেরা বসে সেদিকে ফেলল হারান। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'অ্যাই লোটন—অ্যাই বেন্দা, আজ যদ্দূর হয়েছে থাক। কাল এসে আবার লাগিস।'

বলামাত্র ছোকরা কারিগরটা উঠে পড়ল।

বৃন্দাবন কিন্তু মুখ তোলেনি, আপন মনে কাজই করে যাচ্ছে।

হারান সাধুখাঁ গলা চড়িয়ে আবার ডাকল, 'হেই বেন্দা—'

বৃন্দাবন এবার তাকাল, 'কী কইছ?'

'আজ ক্ষ্যামা দে বাপু—'

'সবে তো সন্‌ঝে হল। হাতের কাজটা সেরে লিই, তারপর না হয়—'

গলা তুলে একবার দেখে নিল হারান, এখনও যা বিড়ির মশলা বৃন্দাবনের কুলোয় মজুদ রয়েছে তা ফুরোতে ঘণ্টা তিন-চারেক লেগে যাবে। অসহিষ্ণু সুরে সে বলল, 'আজকের রাতটা কি মাটি করে দিতে চাস বেন্দা?'

'কেন?'

'আরে শালা, বিষ্টি পড়চে দেখচিস না—' চোখের তারায় নাচন দিয়ে হারান বলল, 'টগরমণি সেজেগুজে বসে থাকবে। বাংলা মাল আর পরোটা মাংস গিলে আজকের রাতটা যা জমবে মাইরি—তা চ' না আজ আমার সন্‌গে। একটা মাদী

পায়রা জুটিয়ে দেব'খন। সারারাত শালা চেটেপুটে খেতে পারবি। রাতখানা যা কাটবে না!'

বৃন্দাবন আঁতকে উঠল, 'না না খাঁ মশায়, ও মতলব ছাড়ো। আমি কি ও পাড়ায় কখনও যাই?'

'শালা বেদ্ধ খানকি বেম্মচারী হয়ে বসেচ! আগে ও পাড়ায় যেতিস না!'

করুণ মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল বৃন্দাবন, ঠিক সেই সময় দুটো লোক ভিজতে ভিজতে এসে হাজির। দু'জনেই মাঝবয়সী। একজনের চেহারা রসকষহীন, শুকনো। দ্বিতীয়জন মোটামুটি গাট্টাগোট্টা, গায়ে শাঁস আছে।

শুকনো চেহারার লোকটা শুধলো, 'এখেনে বেন্দাবন দাস বলে কেউ আচে? কেত্তন টেত্তন গায়—'

ভুরু কঁচকে হারান জিজ্ঞেস করল, 'আচে, কেন?'

'আমরা সন্‌গে করে লিয়ে যাব। লোক মরেচে, মড়ার সন্‌গে কেত্তন গাইতে গাইতে শ্মোশানঘাটায় যেতে হবে।'

পেছন দিকে বসে বসে কথাগুলো শুনছিল বৃন্দাবন, এবার হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে এসে দুই হাত জোড় করে বলল, 'আমার নাম বেন্দাবন। তা মাশায়রা কুত্থেকে আসচেন?'

নমস্কার করে শুকনো লোকটা বলল, 'হুই নদীর ওপারে চিত্তিরগঞ্জ থেকে আসচি। লিন, তা হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক। আপনার দলবল—'

বাধা দিয়ে বৃন্দাবন বলল, 'কিন্তু এই বষ্যায়—'

ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে লোকটা হাসল, 'কথা শোন দাসমাশায়ের! বষ্যা বলে কি জম্ম-মিত্যু আটকায়?'

হারান বলে উঠল, 'তা বটে। কিন্তু বেন্দাবনের খপর কুথায় পেলেন?'

লোকটা বলল, 'ফুল ফুটলে কি গন্ধ ঠেকিয়ে রাখা যায়! ঠিক নাকে এসে লাগে।' বলতে বলতে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বৃন্দাবনের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আর দেরি করবেন না দাসমাশায়। সেই দুপুরে মরেচে, এতক্ষণে শুকিয়ে মড়া কাঠ হতে চলেচে। তা ভাবনার কিছু লেই। বষ্যা য্যাখন নেমেচেই, আপনাকে ঠকাব না, ঠিক পুষিয়ে দেব। বড়লোকের ব্যাপার, বুঝলেন না—'

একটু চিন্তা করে বৃন্দাবন বলল, 'যে মরেছে সে মেইয়েছেলে না ব্যাটাছেলে?'

লোকটা কিছুক্ষণ অবাক থেকে বলল, 'মড়ার আবার ব্যাটাছেলে মেইয়েছেলে কী! তা আপনি য্যাখন জানতে চাইছেন, বলি।—মেইয়েছেলে।'

ঘাড় কাত করে বৃন্দাবন বলল, 'তা হলে হল না, আপনারা অন্য কেত্তনওলার কাচে যান।'

'সি কী!' লোকটা বিমূঢ়ের মতো তাকাল, 'এই বিষ্টিতে আর কার কাছে যাব! আর কাউকে তো চিনিও না! অন্য জায়গায় গেলে আপনি যা পান তার চার গুণ ছ'গুণ দেব। যা চাইবেন তাই পাবেন।'

হারান বলল, 'অতগুলো টাকা পাবি। যা, চলে যা বেন্দা—'

ভরসা পেয়ে লোকটা হারানকে বলে, 'বলুন, দাসমাশায়কে এট্টু বুজিয়ে বলুন—'

টাকার কথায় কিন্তু টলল না বৃন্দাবন, 'মেইয়েমানুষকে আমি গান শোনাই না। আমি যাব না।' গলার স্বর শুনে মনে হল, তার কথার নড়চড় হবে না।

লোকটা স্তম্ভিত। বলল, 'মড়া আবার গান শুনবে কি মাশায়!'

বৃন্দাবন উত্তর দিল না।

আরও খানিকক্ষণ সাধ্যসাধনা করল লোকটা। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের সঙ্গী সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটিকে বলল, 'কী ফ্যাসাদে পড়লুম বল দিকিন। মাগী মরলে তো মরলে, তা এই বষ্যাকালে! কেন বাপু, বষ্যার দুটো মাস ছাড়া বছরের আরও দশটা মাস তো পড়ে ছিল, ত্যাখন মরতে পারতিস। তো মরলি মরলি, কুণ্ডু মশায়ের কি বাই যে চাগল, মাগীকে কেত্তন শুনোতে শুনোতে শ্মোশানে লিয়ে যাবে। তা-ও যদি বিয়ে করা বউ হত! বাঁধা মেয়েমানুষের জন্যে ঘটা কত! সারা জম্ম পাঁকে মুখ গুঁজে রইল! এখন সতী-সাবিত্তিরি সাজিয়ে কেত্তন শুনোতে শুনোতে স্বগ্গের রথে চড়িয়ে দেতে চাইচে কুণ্ডুমাশা—'

লোকটার কথা শুনতে শুনতে চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল বৃন্দাবনের। অনেকখানি আগ্রহ নিয়ে সে শুধলো, 'চিত্তিরগঞ্জ থেকে আপনারা আসচেন তো?'

'আজ্ঞা—' লোকটা ঘাড় ফেরাল।

'কোন্ কুণ্ডুমাশয়ের কথা কইচেন?'

'নিশি কুণ্ডু—ধানচালের আড়ত আচে যার, তেলের ঘানি আচে—'

বিদ্যুৎচমকানির মতো কী যেন খেলে গেল বৃন্দাবনের বুকের ভেতর দিয়ে। কাঁপা গলায় বলল, 'তার মেইয়েছেলে মরেচে। কী নাম বলুন দিকিন—'

'নাম জানি না।' লোকটা বলল, 'কুণ্ডুমাশায়ের কি আর একটা মেইয়েমানুষ!'

বৃন্দাবনের পঞ্চান্ন বছরের জীর্ণ হৃৎপিণ্ডটা ভয়ানক কাঁপছিল। পদ্মই কি তবে মারা গেল! চিত্তিরগঞ্জের ওপার থেকে কেউ যেন তাকে অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর বিচিত্র ঘোরের ভেতর মনে হচ্ছে ওখানে একবার তাকে যেতে হবে, যেতেই হবে। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আমি যাব—'

ফ্যাল ফ্যাল করে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লোকটা বৃন্দাবনের হাত জড়িয়ে ধরল, 'বাঁচালেন দাসমাশায়, এই জল ঝড়ের রাত্তিরে কুথায় কেত্তনের দল খুঁজতে যেতাম—'

বৃন্দাবন যেন তার কথা শুনতে পেল না। শবযাত্রায় একা গেলে তো চলবে না, লোক দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ভিজতে ভিজতে দলবল জুটিয়ে ফেলল। তারপর খোলকত্তাল প্রেমজুরি নিয়ে খেয়াঘাটে গিয়ে উঠল।

নদী পেরিয়ে বেশ খানিকটা হাঁটতে হল। সারাটা পথ সেই রোগা শুকনো লোকটা সমানে বক বক করে যাচ্ছে। কী বলছে, কিছুই বুঝতে পারছে না বৃন্দাবন। আষাঢ় মাসের একটানা বৃষ্টি, বিদ্যুৎচমক, বাজের আওয়াজ, ঘন অন্ধকার—সব নিরাকার হয়ে গেছে তার কাছে। চরাচরে একটা মুখই সে শুধু দেখতে পাচ্ছিল—পদ্মর মুখ। পদ্ম কি মারা গেছে? এ প্রশ্নটাই ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে তার চোখের সামনের আর চোখের বাইরের সব কিছু ঢেকে ফেলছে।

শেষ পর্যন্ত রোগা লোকটা যেখানে তাদের নিয়ে এল সেটা একটা দোতলা বাড়ি। বলল, 'আমরা এসে গেচি, ভেতরে আসুন দাসমাশায়—'

বিজলি বাতি চিত্তিরগঞ্জেও এসে পৌঁছোয়নি। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল আট-দশটা হ্যাজাক জ্বেলে বাড়িটাকে আলোয় আলোয় একেবারে দিন করে ফেলা হয়েছে। অনেক লোকজনও দেখা গেল। তারা কেউ পা টিপে টিপে হাঁটছে, কেউ ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। তাদের মুখচোখ চলাফেরা কথাবার্তা—সব একাকার হয়ে মনে হচ্ছে এ বাড়িতে কিছু একটা ঘটে গেছে—নিদারুণ শোকাবহ কোনও ঘটনা।

সেই লোকটা বৃন্দাবনের কানের ভেতর মুখ গুঁজে বলল, 'দোতলায় চলুন, মড়া সেখেনেই রয়েচে। কুণ্ডুমাশায়ও তাকে আগলে যক্ষির মতো বসে আচে। মাশায় মাগীটা ভাগ্যি করে এসেছিল বটে। সাতদিন ভুগে ভুগে আজ মরল। এই সাতদিন কুণ্ডুমাশায় গদিতে যায়নি, নিজের বাড়িও ফেরেনি। মেইয়েমানুষটা মরার পর কুণ্ডুমাশায়ের কান্না যদি দেকতেন! কলিকালে দেকালে বটে—'

উঠতে উঠতে আরও অনেক কথা বলল লোকটা, 'এই বাড়িটা কুণ্ডুমাশায় ওই মাগীকে লেকাপড়া করে দিয়েছে। রাখতও রানীর মতো। দুটো চাকর, দুটো ঝি। গা-ভর্তি গয়না—কপাল বুঝুন একবার—'

দোতলায় এসে ডান ধারের প্রথম ঘরখানায় বৃন্দাবনকে নিয়ে গেল লোকটা। চমৎকার নতুন একখানা খাটে মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। বৃন্দাবন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে না। মৃতদেহের শিয়রের দিকে একটা চেয়ারে গোলগাল বাবু চেহারার একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। প্রথম দেখায় মানুষটাকে বেশ শৌখিন মনে হয়। তবে এই মুহূর্তে গিলে-করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি কি কুঁচনো দিশি ধুতি, সব দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে। চোখদু'টি আরক্ত, ফোলা ফোলা। গালে শুকনো, জলের দাগ। ভদ্রলোক যে সত্যিই শোকাচ্ছন্ন, অনায়াসেই টের পাওয়া যায়। ইনিই

যে কুণ্ডুমশায় তাতে সংশয় নেই। ক'টি লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাঁর চারধারে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গের সেই রোগা লোকটা সোজা শোকার্ত প্রৌঢ়টির কাছে গিয়ে সসম্ভ্রমে বলল, 'বাবু, কেত্তনের দল লিয়ে এয়েচি। এই যে ইন দাসমাশায়, এনারই দল—'

ভদ্রলোক বললেন, 'ভাল। দল যখন এসেই গেচে তখন শ্মশানে যাবার ব্যবস্থা করে ফেল।'

'আজ্ঞা—' বলে লোকটি বৃন্দাবনের দিকে ফিরল, 'নিচে চলেন দাসমাশায়। এট্টু জিরিয়ে লেবেন, তারপর তো বেরুতে হবে।'

এত কথা হচ্ছে কিন্তু সেসবে বৃন্দাবনের মনোযোগ নেই। একদৃষ্টে সে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি যখন নিচে যাবার কথা বলল তখন নিজের অজান্তেই বুঝিবা দু'পা ডাইনে ঘুরে চট করে মৃতের মুখটা দেখে নিল বৃন্দাবন। এতক্ষণ যে ভয়টা সে করছিল তাই—পদ্মই।

কুণ্ডুমশায় কোথাও কোনও ত্রুটি রাখেনি। শেষযাত্রায় বেরুবার আগে সাধের মেয়েমানুষকে চন্দনে, নতুন বেনারসিতে, সিঁদুরে, আলতায় আর ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিয়েছে।

বৃন্দাবন ফুল-চন্দন-সাজসজ্জা কিছুই দেখছিল না। পদ্মর মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক যেন নিমেষে শূন্য হয়ে গেছে মনে হল।

সীমাহীন আচ্ছন্নতার ভেতরে কখন যে সেই রোগা চিমড়ে লোকটার সঙ্গে নিচে নেমে এসেছে, বৃন্দাবনের খেয়াল নেই। একটা ঘরে ঢাকা ফরাসের ওপর তাকে আর তার দলবলকে বসতে দেওয়া হয়েছে।

বৃন্দাবনের মনে হল, সে যেন চিত্তিরগঞ্জে কুণ্ডুমশায়ের মেয়েমানুষের বাড়িতে লম্বা ফরাসে বসে নেই, দমকা বাতাসে ভর করে তিরিশ বছর পেছনের দিনগুলোতে ফিরে গেছে।

বৃন্দাবনের বয়স তখন পঁচিশ। বাবা-মা-ভাই-বোন, কেউ নেই। দু'চার বিঘে জমি-জিরেতও না। চেহারার তো ওই ছিরি—বাজে-পোড়া ঢ্যাঙা তালগাছ। থাকার ভেতর ছিল গানের গলা, কিন্তু তাতে তো আর পেট ভরে না। রোজগারের জন্য তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বৃন্দাবন। কোথায় বাঁকুড়া শহর, কোথায় বিষ্ণুপুর, কোথায় বর্ধমান—হেন জায়গা নেই যেখানে একবার হানা দেয়নি সে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত নয়নপুরে এসে ঠেকেছিল। তারপর কীভাবে হারান সাধুখাঁর দোকানে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল, এতকাল পর মনে পড়ে না। হারানের আর দু'জন কারিগরের সঙ্গে ভাগে বাজারের পেছন দিকে একখানা ঘর ভাড়া করেছিল। থাকত সেখানে। এখনও সেইখানেই থাকে।

সারাদিন ঘাড় গুঁজে বিড়ি বাঁধত বৃন্দাবন, রাত্তিরে ডেরায় ফিরে গান-বাজনা করত। গানটা শখ বললে শখ, নেশা বললে নেশা। গলাখানা চমৎকার, সেই বয়সে তাতে কাঁচা সতেজ ভাব মেশানো থাকত। বৃন্দাবন গাইত কীর্তন, কেষ্টযাত্রার গান, পদাবলী পালা। সব গানই তার ভক্তিমূলক।

এসব কেউ তাকে শেখায়নি, নিজেই শুনে শুনে শিখেছে।

হারানের দোকানে কাজ পেয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল বৃন্দাবন, অন্তত পেটের দুর্ভাবনা তার ঘুচেছিল। বিড়ি বেঁধে, গান গেয়ে দিন ভালই কাটছিল। এই সময় তার জীবনে ঝড় উঠল।

যে কারিগরদের সঙ্গে বৃন্দাবন থাকত তাদের একজনের নাম নিতাই। একদিন ফিসফিসিয়ে নিতাই বলেছিল, 'বেন্দাদাদা, একজন তোমার গান শুনতে চেয়েচে।'

বৃন্দাবন শুধিয়েছিল, 'কে রে?'

'সে আচে একজন।' ঠোঁট টিপে রহস্যময় হেসেছিল নিতাই, 'কবে শুনোতে যাবে বল। তোমার গান শুনবার জন্যে সে পাগল।

তখন বৃন্দাবনের সেই বয়েস যখন নিতান্ত অকারণেই গাইতে ভাল লাগে, আবার কেউ যদি শুনতে চায় তো কথাই নেই, আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে যায়। সে বলেছিল, 'শুনোবো। কবে শুনোতে হবে?'

'ধরো কাল। দুপুরবেলা তো দোকানে ছুটি। তখন তোমায় লিয়ে যাব।'

পরের দিন দুপুরে খোল-কত্তাল নিয়ে নিতাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল বৃন্দাবন। হারানের দোকান পেছনে ফেলে উত্তরে কামিনীপাড়ার কাছাকাছি আসতেই চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল বৃন্দাবনের। দম-আটকানোর গলায় বলেছিল, 'এ কুথায় লিয়ে এলি নেতাই? এখানে যে খারাপ মেয়েরা থাকে।'

'খারাপ হোক ভাল হোক, তোমার মাথাব্যথা কিসের? তুমি এসেচ গান শুনোতে। চল দিকিন।'

বৃন্দাবন ফিরে আসতে চেয়েছিল কিন্তু নিতাই ফিরতে দেয়নি। একরকম জোর করেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কামিনীপাড়ার খাপরা-ছাওয়া সারি সারি ঘরগুলোতে তখন ঢিলেঢালা আলসেমির ভাব। মেয়েমানুষগুলোর কেউ চুল শুকোচ্ছে, কেউ পুরনো শাড়ি সেলাই করছে, কেউ বা চাল বাছছে। কেউ হয়তো ঘুমোচ্ছে। দুপুরবেলাটা এ-পাড়ার পক্ষে নেহাতই অসময়।

কামিনীপাড়ার শেষ মাথায় যার ঘরে নিয়ে নিতাই তুলেছিল তার দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারেনি বৃন্দাবন। গায়ের রং বেশ মাজা মাজা, চিকন কোমর, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল পিঠময় ছড়ানো, ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় চোখে খর চাহনি। নিটোল কাঁচা বেলের মতো দুই বুক। তানপুরার খোলের মতো ভারি পাছা। পাতলা

রসে ভরা ঠোঁট, টুসকি মারলেই বুঝিবা রক্ত ছুটবে। সারি সারি মুক্তোর মতো সাজানো দাঁত। পরনে ছিল জংলা জংলা একটা শাড়ি, তাতেই তাকে যাদুকরী মনে হচ্ছিল।

নিতাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, 'এই হল গে পদ্ম।' পদ্মকে বলেছিল, 'এই হল বেন্দাদাদা—যার গান শুনবার জন্যে হেদিযে মরছিলে।'

'এসো, ঘরে এসো—' চোখেব তারায় হাসি ছলকে দিয়ে ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল পদ্ম।

ঘরখানা বিশ ছিমছাম। একধারে তক্তাপোষে ধবধবে বিছানা পাতা। ঝালরওলা বালিশ, চাদর, পাড়-বসানো হাতপাখা—সবই চমৎকার। ছোট টেবিলে আয়না-চিরুনি-গন্ধতেল-পাউডার, লাল-নীল চুলের ফিতে পরিপাটি করে সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে লাস্যময়ী সুন্দরীদের ছবি।

মনে আছে, একখানা নকশ-করা মাদুর পেতে তাদের বসিয়েছিল পদ্ম। তারপর হেসে হেসে বলেছিল, 'তোমার কথা নেতাইয়ের মুখে ঢের শুনেচি। গান আমি বড্ড ভালোবাসি। অনেক গান শুনোতে হবে। সন্ঝে অব্দি তুমি থাকতে পার, তারপর শ্যাল-কুকুরগুলোন আসবে। ত্যাখন গেলেই চলবে।'

চোখের পাতা পড়ছিল না বৃন্দাবনের। একদৃষ্টে পদ্মকে দেখছিল সে। পঁচিশ বছরের জীবনে এর আগে আর কোনও মেযেমানুষের দিকে তাকাবার সময় হয়নি তার। নিজের পেটের ভাবনাতেই অস্থির হয়ে থাকতে হয়েছে।

পদ্ম আরও কী কী বলেছিল আজ আর মনে পড়ে না। আকণ্ঠ নেশা করলে যেমন হয় তখন বৃন্দাবনের সেই অবস্থা।

এক সময় পদ্ম বলেছিল, 'এবার তা হলে গান ধর—'

খোল বার করে গাইতে শুরু করেছিল বৃন্দাবন, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—'

শুরুর মুখেই বাধা পড়েছিল। গলা শুনে একটি দুটি করে পাড়ার অন্য মেয়েরা পদ্মর ঘরের সামনে এসে ভিড় জমিয়েছিল। তারা খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। পদ্মর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল, 'একি গান ধরেচ?'

বৃন্দাবন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। রুদ্ধ স্বরে বলেছিল, 'কেত্তনের আখর—'

বাইরের মেয়েরা আগের মতো হেসে গড়াতে গড়াতে বলেছিল, 'এ কুখেকে এক বেম্মচারী জুটিয়ে আনলি লো পদ্ম। আমাদের সবাইকে একেবারে সতী-সাবিত্তির করে দিয়ে যাবে, ব্যবসা করে আর খেতে হবে না।'

পদ্মর চোখের ছটফটে তারায় হাসি নেচে বেড়াচ্ছিল। সে বলেছিল, 'আসর বুঝে তো গাইতে হয়। তোমার ও গান এখেনে চলবে না।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো বৃন্দাবন শুধিয়েছিল, 'তবে কী গাইব?'

'অন্য কিচু গাও।' পদ্ম জিজ্ঞেস করেছিল, 'রসের গান কিছু জানো?'

রসের গান বল্‌তে?'

'সারা গায়ে ঢেউ তুলে হেসেছিল পদ্ম, 'রসের গান কী জানো না? আচ্ছা বলে দিচ্চি—' সুর করে ক'টি পদ বলে দিয়েছিল সে :

'তুমি প্রেমের নাগর হে
তুমি রসের আগর হে
আমার বাঁয়ে শোয় ঘাটের মড়া, বিটলে ছোঁড়া ডাইনে
তোমাকে শোয়াব নাগর বুকের মধ্যিখানে।
তুমি পাকা এঁচড় হে
তুমি রসের নাগর হে,
স্বগ্‌গমত্ত জুড়ে আমার হাজার ভাতার হে।
তাদের গায়ে গা ঘষটিয়ে অঙ্গ জুড়োই হে।'

পদগুলো আউড়ে পদ্ম বলল, 'এই রকম গান শিখে এসো। ভগবানের গান ফান এখেনে চলবে না। ভগবান এ পাড়ায় ঢোকে না, আমরা ঢুকতে দিই না। কেনই বা দেব বল? ভগবান আমাদের দিয়েচেটা কী? এই নরকের জঞ্জালে ছুঁড়ে দিয়েচে। নরকেই য্যাখন এসেচি ত্যাখন এখেনকার মতোই চলব।' তীব্র আক্রোশ আর অভিমানে তার ঠোঁট বেঁকে গিয়েছিল। বৃন্দাবনের চোখমুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কী উত্তরে সে দিয়েছিল, আর কখন বাজনার জিনিসগুলো তুলে নিয়ে নিতাইয়ের সঙ্গে চলে এসেছিল, স্মৃতি থেকে সেসব মুছে গেছে।

বৃন্দাবনের প্রাণের ভেতর সাত্ত্বিকতার খানিকটা ছোঁয়া আছে। কামিনীপাড়া থেকে ফিরতে ফিরতে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনও ওখানে যাবে না। কিন্তু ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে কোঁচকা কোঁচকা চুল, রসে ভরা টসটসে ঠোঁট, ছটফটে চোখে খর চাহনি, তানপুরার খোলের মতো পেছন দিক, সরু কোমর, শরীরে ঢেউ তোলা হাসি তার মনে পড়ে যাচ্ছিল। মনটাকে যতই অন্য দিকে ফেরাতে চেষ্টা করছিল বৃন্দাবন ততই সেটা কামিনীপাড়ায় ছুটে যাচ্ছিল।

কাজেও মন বসছিল না। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল বৃন্দাবন। চিরকাল শান্ত ভক্তিরসের দিকেই তার ঝোঁক, কীর্তন-টীর্তন গাইতেই ভাল লাগে। গাঁজলা আড়ির মতো উগ্র উত্তেজক অন্য রসের গানও যে আছে তার খবর রাখত না সে। কিন্তু এবার থেকে রাখতে হবে এবং সেসব শিখেও আসতে হবে। হাজার হোক মেয়েটা মুখ ফুটে বলেছে গান শুনবে। তাকে না শুনিয়ে পারবে না বৃন্দাবন।

নয়নপুর ব্যবসার জায়গা, গাইয়ে বাজিয়ে মানুষের এখানে খুব অভাব। নদীটা কোণাকুণি দক্ষিণে মাইল দশেক পাড়ি দিতে পারলে রাজার হাট বলে একটা ছোট

শহর আছে। সেখানে একজন ওস্তাদ গান-টান শেখায়। হারানের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বৃন্দাবন রাজার হাট ছুটেছিল কিন্তু বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে, কেননা গানের ওস্তাদ কি একটা দরকারে কলকাতায় গেছে, ফিরতে দু'মাস।

আরেক জনের কাছে খবর পাওয়া গেল বিবিবাজারে একজন নাম-করা গাইয়ে আছে। সে ভাল তালিম দেয়। জায়গাটা রাজার হাটের চাইতেও দূরে। শোনামাত্র বৃন্দাবন ছুটেছিল কিন্তু সেখানেও সুবিধে হল না। সে যে-জাতীয় গান শিখতে চায় বিবিবাজারের ওস্তাদ তা শেখাবে না, ঘাড় ধরে সে বৃন্দাবনকে বার করে দিয়েছে।

শুধু রাজার হাট, বিবিবাজারেই না, কোনও জায়গা থেকে গাইয়ের খবর কানে এলেই হয়, বৃন্দাবন ছুটে যেত। তার আর্জি শুনে কেউ তাড়িয়ে দিত, কেউ কেউ বলত, 'কাওয়ালি শেখ, ঠুংরি শেখ। এসবও রসের গান। জমিয়ে দিতে পারবে।' পদ্ম যে গানের ফরমাশ করেছে তা কেউ শেখাতে চাইত না। তাদের মতে, শিখলে ভাল জিনিসই শেখা ভাল, নোংরা পাঁকে মুখ গুঁজে লাভ কী? অনিচ্ছা'সত্ত্বেও হারানের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে কাওয়ালি ঠুংরি জাতীয় গান শিখতে শুরু করেছিল বৃন্দাবন। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি তার খুব টান। কাওয়ালি-ঠুংরি শুনে সে খানিক আকর্ষণ বোধ করেছিল। নেহাতই শেখার জন্য শেখা। নইলে পদ্মর ঐ গানগুলোর জন্য সে ভেতরে ভেতরে আকুল হয়ে ছিল।

এদিকে পদ্ম নিতাইকে দিয়ে প্রায়ই বৃন্দাবনকে কামিনীপাড়ায় ডাকিয়ে নিয়ে যেত। বলত, 'আমার সেই গানের কী হল?'

অপরাধীর মতো মুখ করে বৃন্দাবন উত্তর দিত, 'এখনও ঠিক শিকে উঠতে পারিনি, তবে তক্কে তক্কে আচি। শিকতে পারলেই শুনিয়ে যাব।'

দুই ঠোঁটের ফাঁকে নিঃশব্দ বিচিত্র একটি হাসিকে টিপে টিপে খুন করতে করতে আর ধিক্কার দিতে দিতে পদ্ম বলত, 'তুমি কেমন ব্যাটাছেইলে, ছ'মাসে দুটো রসের গান শোনাতে পারলে না!'

বৃন্দাবনকে নিয়ে বিচিত্র এক খেলায় যেন মেতে উঠেছিল পদ্ম।

বৃন্দাবন বলত, 'এখন অন্য গান শোনাই। পরে না হয়—'

'অন্য গান বলতে তো কেত্তন-টেত্তন। তোমাকে তো পেথম দিনই বলে দিয়েচি, ওসব ভগবানের ব্যাপার এখেনে চলবে না।'

কাঁপা বিব্রত সুরে বৃন্দাবন বলত, 'না-না, কেত্তন না—ঠুংরি টুংরি—'

'সব শুনব। তার আগে যে গান বলেচি—'

কামিনীপাড়ায় যাতায়াতের খবর কেমন করে যেন রটে গিয়েছিল। খুব সম্ভব নিতাই-ই ঢাকে কাঠি দিয়ে সারা নয়নপুরে চাউর করে বেড়িয়েছে।

ফলে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হারান সাধুখাঁ বলেছে, 'কি রে বেন্দা, তোর পেটে

পেটে এত! তুমি শালা গুণের সাগর হে—'

গোঙানির মতো শব্দ করে বৃন্দাবন বলেছে, 'কী কইচ দোকানদার—'

'রোজ রোজ শালা মাগীপাড়ায় যাচ্চ!'

'না, ব্যবাপারটা হল—'

'ব্যাপারটা আবার কী। তা বেশ করচিস—মাল টাল খা, মেইয়েমানুষের গন্ধ শোঁক, তবে না পেরানে হাজার পিদ্দিম জ্বলবে।' হারান বলত, 'এতকাল তো গান ফান লিয়েই রইলি, আর কুনোদিকে তাকাতিস না। অ্যাদ্দিনে শালা মানুষ হলি।'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করত বৃন্দাবন। বলতে চাইত, হারাণ যা বলেছে তা ঠিক না, সব—সব মিথ্যে। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুত না।

গানের জন্য স্বর্গমর্ত চষে বেড়ানো, পদ্মর কাছে ছোটাছুটি, হারানের অশ্লীল ঠাট্টা—এসবের ভেতরেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন খবর এল বীজনগর বলে একটা জায়গায় একজন ওস্তাদ আছে, কলকাতায় থিয়েটারে সে বেহালা বাজাত। পদ্ম যা শুনতে চায় তার ভাঁড়ারে নাকি সেই সব ঝাঁঝালো বস্তু অফুরন্ত। সুতরাং বৃন্দাবনকে রোখা গেল না, ক'দিন ছুটি নিয়ে সে বীজনগরে পাড়ি দিল। কামিনীপাড়ার উপযুক্ত অশ্লীল গাঁজলা রসের তালিম নিয়ে দিনসাতেক পর নয়নপুরে ফিরেই প্রথমে বৃন্দাবন গেল কামিনীপাড়ায়। পদ্মকে আজ সে গান শোনাতে পারবে।

কিন্তু পদ্মর ঘরের সামনে এসে বৃন্দাবন স্তম্ভিত, ঘরটা খালি। কামিনীপাড়ার অন্য মেয়েরা জানিয়েছিল, 'পাখি ফুড়ুত করেচে।'

পদ্ম কোথায় গেছে তা-ও বলেছিল মেয়েরা। নদীর ওপারের পয়সাওলা আড়তদার নিশি কুণ্ডু নাকি তাকে নিয়ে গেছে, এখন থেকে পদ্ম কুণ্ডুমশায়ের বাঁধা মেয়েমানুষ হয়ে থাকবে, আর কামিনীপাড়ায় ফিরবে না।

শুনতে শুনতে চারিদিক যেন ফাঁকা আর নিরাকার হয়ে গিয়েছিল। টলতে টলতে মেয়েপাড়া থেকে বেরিয়ে এসেছিল বৃন্দাবন।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। নয়নপুর ছেড়ে যাওয়া হয়নি বৃন্দাবনের। হারানের দোকানেই বিড়ি বেঁধে চলছে সে, ছোটোখাটো একটা গানের দলও খুলেছে। ডাক পেলে গেয়ে আসে। তবে মেয়েমানুষকে সে গান শোনায় না। পদ্মকে শোনাতে পারেনি সেই আক্ষেপ, সেই বেদনা তার সারা জীবনে ঘুচবার নয়। কোনও দিন অন্য কোনও মেয়েকে বৃন্দাবন গান শোনাতে পারবে না।

তিরিশ বছর আগের সেই দিনগুলো কতক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বৃন্দাবনের খেয়াল নেই। একসময় কানের কাছে সেই শুকনো লোকটার গলা

ফিসফিসিয়ে উঠল 'দাসমাশায়—'

বৃন্দাবন চমকে উঠল।

লোকটা আবার বলল, 'অনেক রাত হল, এবারে মড়া লিয়ে বেরুতে হয়। তা বিষ্টিটাও ধরেচে। আবার কখন ঝেঁপে নাববে।'

জড়ানো গলায় বৃন্দাবন বলল, 'হ্যাঁ—'

একটু পরে শবযাত্রা বেরুল। দুটো লোক খই আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে আগে আগে চলেছে। পেছনে চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে চলেছে কুণ্ডুমশায়, একটা লোক তাঁর মাথায় ছাতা ধরে চলেছে। শুকনো লোকটা মিথ্যে বলেনি, সত্যি পদ্মর ভাগ্যি ভাল।

'বল হরি—হরিবোল।'

হরিধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃন্দাবনের দল গান ধরেছে, 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।'

আর বৃন্দাবন নিজে? আপন মনে সে বলল, 'তোমার জন্যে কত ঘুরেচি,কত রসের গান মজার গান শিখেচি। কিন্তু কিচুই কাজে লাগল না। ভগবানের নাম তুমি শুনতে পারতে না, তাকে তুমি ঘেন্না করতে। এই শেষ সময়ে তার নাম ছাড়া আর কী-ই বা তোমায় শুনোতে পারি? বল পদ্ম, তুমিই বল—'



নরকের পোকা

শহরের এই অঞ্চলে কিছু ধানচালের আড়ত, কাঠের গুদাম, করাত-কল আর টালিখোলা এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। সামনে দিয়ে চলে গেছে এবড়োখেবড়ো খোয়ার রাস্তা। দু'ধারের কাঁচা নর্দমা থেকে অনবরত দুর্গন্ধ উঠে এসে বাতাসে বিষ ছড়িয়ে যায়। চাপ-বাঁধা মশার ঝাঁক সারাক্ষণ নর্দমা দুটোর ওপর উড়তে থাকে।

খোয়ার রাস্তা থেকে করাত-কলের পাশ দিয়ে একটা সরু গলি ডাইনে ঢুকে যে হতচ্ছাড়া চেহারার বস্তিটায় গিয়ে ঠেকেছে সেটাকে নরকের খাস তালুক বলা যায়। টুটোফুটো টিনের চালের নোংরা কুৎসিত এই বস্তিটা হল পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা ক'টা মেয়েমানুষের শেষ আস্তানা। সুখী, ভদ্র মানুষের ভূগোল থেকে অনেক, অনেক দূরে নরকের এই সংরক্ষিত এলাকা।

বস্তি থেকে বেরিয়ে এসে দুটো মেয়েমানুষ করাত-কলের বাড়ানো টিনের শেডের তলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে।

পৌষের মাঝামাঝি। এ বছর এই শহরটায় দুর্দান্ত শীত পড়েছে।

এখন কত রাত কে জানে। আকাশ থেকে ঘন হয়ে নামছে পৌষের হিম। নিচে মাটির লক্ষ কোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে মারাত্মক শীতলতা।

মিউনিসিপ্যালিটি অসীম উদাসীনতায় এ রাস্তায় দু-আড়াই শ গজ দূরে দূরে ক'টা কাঠের খুঁটি পুঁতে সেগুলোর গায়ে বাল্ব ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। প্রায় সবগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে। দু একটা অবশ্য টিম টিম করে এখনও জ্বলে।

মেয়েমানুষ দুটো যেখানে বসে আছে তার কাছাকাছি একটা আলো জ্বলছে। গাঢ় হিম এবং কুয়াশা বাল্বটার চারপাশে এমন জমাট বেঁধে আছে যে তিন হাত দূরত্বের কিছুই প্রায় দেখা যায় না।

খোয়ার রাস্তাটা উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণে চলে গেছে। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, এখন সব সুনসান।

এমনিতে সন্ধের পর দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য চোর বাটপাড় মাতাল এবং গুণ্ডারা ঝাঁকে ঝাঁকে, পেছনের বস্তিটায় হানা দিতে থাকে। তারপরও যে মেয়েমানুষেরা নিজেদের বিকোবার মতো খদ্দের জোটাতে পারে না, সোজা সামনের রাস্তায় চলে আসে। ততক্ষণে ধানচালের আড়ত, কাঠের গুদাম-টুদাম বন্ধ হয়ে যায়।

রাত একটু বাড়লে ভদ্রপাড়ার মানুষজন পারতপক্ষে এ রাস্তা মাড়ায় না। কচিৎ

দু-একটা মড়া কাঁধে নিয়ে কিছু লোক চিৎকার করে গোটা এলাকা কাঁপাতে কাঁপাতে শ্মশানেব দিকে চলে যায়। 'বল হরি, হরিবোল। আবার বল, হরিবোল।'

এখান থেকে মাইলদেড়েক তফাতে একটা মজা নদী সাপেব খোলসের মতো পড়ে আছে। শ্মশানটা তার পাড়ে।

যে মেয়েমানুষ দুটো করাত-কলের শেডের তলায় বসে আছে, তাদের গায়ে রোঁয়াওলা খেলো উলের চাদর জড়ানো। চাদর দুটো বহুকালের পুরনো, এখানে ওখানে অজস্র তালি। পৌষের হিম চাদর ভেদ করে তাদের হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। অসহ্য ঠাণ্ডায় হাত-পা অসাড় তো হয়ে গেছেই, দাঁতে দাঁতও লেগে যাচ্ছে।

তাদের নাম টগর আর চাঁপা। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। তবে ভাঙাচোরা মুখ, কর্কশ চামড়া, চোখের তলায় চিরস্থায়ী কালির ছোপ, ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখলে মনে হতে পারে তারা চল্লিশ পেরিয়ে গেছে।

টগর বলে, 'শীতে একেবারে কালিয়ে গেলাম। এট্টু গা গরম করে লিই।' শীতার্ত শরীরে খানিকটা উত্তাপ নিয়ে আসার জন্য একটা ছোট টিনেব কৌটো থেকে দুটো আধপোড়া বিড়ি এবং দেশলাই বার কবে একটা চাঁপাকে দেয়।

বিড়ি ধরিযে টানতে টানতে চাঁপা উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমে-মোড়া ঝাপসা রাস্তাটা একবার দেখে নেয়। না, একটা লোকও চোখে পড়ছে না। এমনকি বেওয়ারিশ কুকুর-টুকুরগুলো পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে। প্রচণ্ড দুর্যোগে বা অন্য কোনও বিপর্যযের সময় কেউ না বেরুলেও মাতাল এবং লম্পটেরা পোকার মতো বুকে হেঁটে এখানে হাজিরা দেবেই। কিন্তু আজকের এই মারাত্মক ঠাণ্ডায় মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তিও বুঝি সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। আজ আর খদ্দেরের আশা নেই।

চাঁপা বলে, 'মড়াগুলোন সব আজ ব্রেহ্মচারী হয়ে গেল নাকিন লা টগরী?'

টগর বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে নাকের ফুটো দিয়ে নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'তা-ই তো মনে হচ্চে। কিন্তুন সব্বাই সন্নিসী হয়ে গেলে আমাদের চলে কী করে? উপোস দিয়ে মরতে হবে।'

চূড়ান্ত ক্ষয় এবং গ্লানির শেষ সীমান্তে পৌঁছেও রসিকতার বোধটুকু এদের একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। চাঁপা বলে, 'য্যাদ্দিন গতর আচে উপোস দেব কেন লা? আজ ঠাণ্ডায় বেরোয় নি, কাল নচ্ছারগুলোন ভাদ্দরমাসের কুত্তোর মতো জিভ লক লক করতে করতে ঠিক দৌড়ে আসবে।'

'তা যা বলেচিস। এ পবিত্তির (প্রবৃত্তির) তো মরণ লেই।'

মানুষ সম্পর্কে টগরদের অভিজ্ঞতা একটাই। নরকের একেবারে শেষ স্তরে

পৌঁছে তারা জেনেছে, জৈব প্রবৃত্তির বিনাশ নেই। একমাত্র এরই জোরে তারা টিকে আছে। যতদিন কামুক পুরুষেরা এই পৃথিবীতে রয়েছে, তারাও থাকবে।

বহুদূরে জগতের সব সুখী, সোহাগিনী নারীরা উষ্ণ লেপের তলায় কাম্য পুরুষদের বুকের ভেতর মুখ রেখে যখন ঘুমিয়ে আছে তখন দু'টি জঘন্য মেয়েমানুষ কুয়াশা এবং হিমের ভেতর আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে।

একসময় টগর বলে, 'চ, ফিরে যাই। এই ঠাণ্ডায় বসে থাকলে নিমুনি ধরে যাবে।'

চাঁপা বলে, 'তা-ই চ।'

ওরা করাত-কলের শেডের তলা থেকে সবে নিচে নেমেছে, দূরে কিসের যেন আওয়াজ পাওয়া যায়। মিউনিসিপ্যালিটির যে দু-চারটে আলো এধারে ওধারে জ্বলছে তাতে কিছুই চোখে পড়ে না।

দৃষ্টিকে ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ করে চাঁপা এবং টগর ডাইনে এবং বাঁয়ে অনবরত তাকাতে থাকে। গাঢ় কুয়াশায় এবং হিমে চারপাশের সব কিছু ঢাকা। না দেখা গেলেও শব্দটা কিন্তু কানে আসছে। সেটা ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসে।

সৃষ্টিছাড়া দুনিয়ার দুই বাসিন্দার মনে সামান্য দুরাশাই বুঝি দেখা দেয়। টগর বলে, 'কিসের আওয়াজ বুজতে পারচিস?'

চাঁপা কান খাড়া করে বুঝবার চেষ্টা করে। তারপর চোখ কুঁচকে বলে, 'মনে হচ্চে মানুষের পায়ের আওয়াজ। কেউ ইদিকে আসচে।'

'এট্টু দেঁড়িয়ে যাই, কি বলিস?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্চে, আজকের রোজগারটা মার যাবে না।'

টগর কিছু বলে না। তবে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে সামান্য হেলিয়ে দেয়।

আরও কিছুক্ষণ বাদে দু-আড়াই শ গজ দক্ষিণে মিউনিসিপ্যালিটির যে বাতিটা জ্বলছে তার তলায় ঝাপসা ক'টা চেহারা দেখা যায়। মনে হয় মানুষই। চাঁপারা রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

টগর বলে, 'আগিয়ে দেকবি?'

চাঁপা বলে, 'না, এখেনেই দেঁড়িয়ে থাকি।'

কুয়াশা এবং হিমের মধ্যেও ক'টা মানুষের কাঠামো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিছু একটা যেন তারা বয়ে নিয়ে আসছে।

এ পাড়ায় যারা মজা লুটতে আসে তারা কেউ ঘাড়ে মালপত্র চাপিয়ে আনে না। বড় জোর তাদের বগলে বা হাতে কালীমার্কা দিশি মদের বোতল থাকতে পারে।

টগর চাপা গলায় শুধোয়, 'এই মড়াগুলোন্ কারা? কাঁধে করে কী নে আসচে?'

চাঁপা বলে, 'ভগবান জানে। কাচে আসতে দে।'

কাছাকাছি আসার আগেই লোকগুলো হঠাৎ রাস্তার ওপব হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় তখনই আধফোটা কাতর গোঙানির শব্দ ভেসে আসে, সেইসঙ্গে অস্পষ্ট কিছু কণ্ঠস্বর—যার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

মেয়েমানুষ দুটো নিজেদেব অজান্তেই উদ্বেগ বোধ করতে থাকে।

টগর বলে, 'কী হল, বল দিকিন?'

চাঁপা বলে, 'ঠিক বুজতে পারচিনি।'

'দেঁড়িয়ে না থেকে, চ ওখেনে গিয়ে দেকি—'

চাঁপা সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বলে, 'যেতে তো চাইচিস। আবার কোনও হ্যাঙ্গামে গিয়ে পড়ব না তো?'

টগর নিরাসক্ত মুখে বলে, 'হ্যাঙ্গাম আর লতুন করে কী হবে? আমাদের মতোন মেয়েমানুষের ক্ষেতি যা হবার তা তো হয়েই গেচে। চ—'

চাঁপা আর কোনও প্রশ্ন করে না। খানিকটা কৌতূহল এবং খানিকটা উৎকণ্ঠা নিয়ে পায়ে পায়ে দু'জনে এগিয়ে যায়। করাত-কলের পর তিন-চারটে কাঠের গুদাম পেরিয়ে যেতেই ওরা তিনজন জ্যান্ত মানুষ এবং একটি মৃতদেহ দেখতে পায়। জীবন্ত মানুষদের তিনজনই পুরুষ। একজনের বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। বাকি দু'জনের কম। একজন বাইশ-তেইশ বছরের যুবক, অনটি অল্পবয়সী কিশোর। মৃতদেহটি একজন মধ্যবয়সী মহিলার। যুবকটি মাটিতে শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে। প্রৌঢ় এবং কিশোরটি তাকে তুলে বসাবার চেষ্টা করছে।

একধারে খেলো কাঠের একটা খাটিয়া কাত হয়ে রয়েছে। এই ধরনের খাটে চাপিয়েই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। খাটিয়াটির পাশে রাস্তায় ওপর মহিলাটির নিষ্প্রাণ শরীর পড়ে আছে।

টগররা বুঝতে পারে, যুবক কিশোর এবং বয়স্ক লোকটি মহিলার মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছিল। তার ভার ধরে রাখতে না পেরে যুবকটি হয়তো পড়ে যায়, সেই সঙ্গে খাটিয়াসুদ্ধু মৃতদেহটি। দূর থেকে এই পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিল তারা।

মারাত্মক শীতের রাতে আচমকা কুয়াশা এবং হিম ফুঁড়ে দু'টি মেয়েমানুষকে কাছে আসতে দেখে বয়স্ক লোকটি আর কিশোর চমকে ওঠে, ভীত চোখে তাদের লক্ষ করতে থাকে।

টগর আর চাঁপাও প্রৌঢ় এবং ছেলেটাকে দেখছিল। টগর জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েচে?'

প্রৌঢ় লোকটি ভাঙা ভাঙা গলায় যা জানায়, টগররা মোটামুটি তা আগেই

আন্দাজ করেছিল। নতুন যে খবরটুকু পাওয়া যায় তা এইরকম। মৃত মহিলাটি বয়স্ক লোকটির স্ত্রী। যুবক এবং কিশোর তাদের ছেলে। ভয়াবহ ঠাণ্ডায় স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে আসার মতো লোক পাওয়া যায়নি। নিরুপায় হয়ে সে আর দুই ছেলে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসছিল। কিন্তু বড় ছেলের দু'দিন ধরে প্রচণ্ড জ্বর, তার ওপর মায়ের মৃত্যুশোক। ধুঁকে ধুঁকে মৃতদেহ বয়ে আনতে আনতে তার জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে আসে। এই পর্যন্ত এসে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। এখন এই ছেলেকে কী করে সুস্থ করে তোলা যাবে এবং কিভাবেই বা স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে সৎকার করবে, ভেবে পাচ্ছে না বয়স্ক লোকটি। এই জনমানবহীন রাস্তায় এমন একটি মানুষ নেই যার সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

সব শোনার পর টগর এবং চাঁপা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কিছু পরামর্শ করে নেয়।

একসময় টগর জিজ্ঞেস করে, 'আমরা যদিন মা নক্ষীকে শ্মোশানে নে যাই—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে যায়।

মেয়েমানুষ দুটোকে আচমকা দেখার পর সেই প্রাথমিক ভীতি এবং সংশয় খানিকটা কেটে এসেছে প্রৌঢ়ের। তারা যেচে যেভাবে সাহায্য করতে চাইছে তা মেনে নেবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রৌঢ় হয়তো দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। হয়তো এতক্ষণে সে বুঝে ফেলেছে টগররা কোন স্তরের জীব এবং তাদের ক্ষয়াটে ভাঙাচোরা মুখে কিসের ছাপ মারা।

টগর ফের বলে, 'আপনারা বেপদে পড়েচেন, তাই বলতে ভরসা পাচ্চি। নইলে বুজতেই পাচ্চেন, আমরা হলুম গে নরকের পোকা—'

প্রৌঢ় এবারও চুপ।

চাঁপা বলে, 'আমরা ছুঁলে মা নক্ষীর যদিন পরকালের ক্ষেতি হয়ে যায়, তা হলে আর ছুঁচ্চি না। যাই—'

সত্যিই চাঁপারা যখন চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, প্রৌঢ় বিচলিত হয়ে পড়ে। যত জঘন্যই হোক আর গায়ে যত পাঁকই মাখানো থাক, তবু দুটো জীবন্ত মানুষ তো। এই দুর্জয় শীতের রাতে নির্জন রাস্তায় অসুস্থ ছেলে এবং মৃত স্ত্রীকে নিয়ে যখন সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে তখন এই মেয়েমানুষ দুটো এগিয়ে এসেছে। তাদের সাহায্য না নিলে বাকি রাত এই হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেটা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

প্রৌঢ়রা ব্রাহ্মণ। নিজেদের জ্ঞান বিশ্বাস এবং সংস্কার অনুযায়ী সৎভাবেই তারা জীবনযাপন করে এসেছে। বেশ্যারা ছুঁলে সাধ্বী স্ত্রীর স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা কতটা দুর্গম হয়ে উঠবে, এই মুহূর্তে তা চিন্তা করার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই তার। প্রৌঢ়

রুদ্ধ গলায় ডাকে, 'শোন—'

টগররা থেমে যায়।

প্রৌঢ় বলে, 'তোমরা যা ভাল বোঝো, কর।'

টগর এবং চাঁপা উত্তর না দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে প্রথমে মৃতদেহটি খাটিয়ার ওপর তুলে সযত্নে শুইয়ে দেয়। তারপর বেহুঁশ যুবকটিকে ধরাধরি করে সামনের একটা গুদামের শেডের তলায় নিয়ে আসে। প্রৌঢ় এবং কিশোরটিও অবশ্য তাদের সঙ্গে হাত মেলায়।

এরপর যুবকটির কপালে বুকে হাত দিয়ে তাপ পরখ করতে করতে টগর বলে, 'হিমে গা কালিয়ে গেচে। শরীল গরম না হলে হুঁশ ফিরবে নি।' একটু চিন্তা করে চাঁপাকে বলে, 'ঝট করে আমার ঘর ঠেঞে (থেকে) হারকেল (হারিকেন) আর ছেঁড়া ন্যাগুড়া (নেকড়া) নে আয়। যাবি আর এসবি।'

চাঁপা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হেরিকেন-টেরিকেন নিয়ে ফিরে আসে। এবার টগর ছেঁড়া কাপড়টা চার ভাঁজ করে হেরিকেনের মাথায় বসিয়ে গরম করে করে যুবকটির গালে গলায় কপালে সেঁক দিতে থাকে। আর চাঁপা তার হাত এবং পায়ের তেলো ঘষে ঘষে উত্তপ্ত করে তোলে।

কিছুক্ষণ পর যুবকের জ্ঞান ফেরে। আস্তে আস্তে উঠে বসে সে।

টগর বলে, 'এবেরে মা নক্ষীকে নে শ্মাশানে যাওয়া যাক।'

প্রৌঢ় এবং কিশোরটি একধারে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে টগরদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কোথাকার দুটো অধঃপতিত মেয়েমানুষ যে এভাবে সেবা করতে পারে, কে ভেবেছিল! প্রৌঢ় বলে, 'তোমরা অনেক করেছ। আর কষ্ট দেব না। আমরাই শ্মশানে নিয়ে যেতে পারব।'

দুই ওঁচা মেয়েমানুষের ওপর এই শীতের রাতে অপার্থিব কেছু যেন ভর করে বসে। মৃতদেহটি শ্মশানে পৌঁছে দেওয়া যেন তাদের দায়। যুবকটিকে দেখিয়ে টগর বলে, 'এই মাত্তর হুঁশ ফিরেচে। এই শরীলে মা নক্ষীকে বয়ে শ্মোশানে নে যেতে পারবে নি।' প্রৌঢ় এবং কিশোরকে বলে, 'আপনারা খাটের এক মুড়ো ধরুন, চাঁপা আর আমি আরেক মুড়ো ধরি।'

আপত্তি করার কিছু নেই। সবে হুঁশ ফিরেছে। এই অবস্থায় দুর্বল রুগ্‌ণ শরীরে মায়ের মৃতদেহ বয়ে দেড় কিলোমিটার দূরের শ্মশানে নিয়ে যাবার শক্তি তার নেই।

টগরের পরিকল্পনামাফিক খাটের সামনের দিকটা তুলে ধরে প্রৌঢ় এবং কিশোর, পেছন দিকটা টগর আর চাঁপা। এইভাবে তারা এগিয়ে চলে। টগরের হেরিকেন হাতে ঝুলিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে যুবকটি।

শ্মশানে পৌঁছে দেখা যায়, কেউ কোথাও নেই। একপাশে প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মেটে ঘরে ঝড়ু ডোম একাই থাকে। সে দরজা বন্ধ করে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এই প্রচণ্ড শীতের রাতে প্রৌঢ়র স্ত্রী ছাড়া আর বোধহয় কেউ মরে নি। একটি রাতের জন্য মৃত্যুও হয়তো তার হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

শ্মশানের গায়েই মজা নদী, তার ওপারে ঘন গাছপালার ভেতর চাষা-ভুষোদের গাঁ। কিন্তু এখন কিছুই চোখে পড়ে না, গাঢ় কুয়াশা এবং হিম সমস্ত চরাচর মুড়ে রেখেছে।

শ্মশানের এক ধারে মৃতদেহসুদ্ধু খাটিয়া নামানো হয়।

টগর বলে, 'আপনারা বসুন, আমরা ঝড়ুকে ডেকে আনচি।'

খাটিয়ার পাশে প্রৌঢ় তার দুই ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাশে হেরিকেনটা টিম টিম করে জ্বলে।

টগর আর চাঁপা প্রচুর ডাকাডাকি করে এবং দরজায় ধাক্কা-টাক্কা দিয়ে ঝড়ুকে জাগায়। বাইরে বেরিয়ে দুই জঘন্য মেয়েমানুষকে দেখে ঝড়ুর মাথায় খুন চড়ে যায়। কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলে, 'শালীরা মাজ রাত্তিরে জ্বালাতে এয়েচিস কেন?' টগরদের সঙ্গে তার অনেক দিনের জানাশোনা।

টগর বলে, 'মড়া নে এইচি।'

ঘুম ভাঙবার জন্য বেজায় খেপে গেছে ঝড়ু। বলে, 'মরবার আর সময় পেল নি?'

চাঁপা বলে, 'তুই ঘুমুবি বলে কেউ মরবে নি? যম তোর কাচে দাসখত নিখে দেছে—না?'

গজগজ করতে করতে ঝড়ু বলে, 'এই রাতের বেলায় হুজ্জুত না করলে চলছেল না? কাল সকালে মড়াটা আনলে কী ক্ষেতিটা হত?'

'তোর ঘুমের নেগে (জন্য) নোকে মড়া বাসি করে ফেলে রাকবে?'

'ও, টাটকা মড়া জ্বালিয়ে সগ্‌গে পাঠাতে চাইচিস নাকিন রে মাগীরা?' বলে কদর্য কিছু খিস্তি দেয় ঝড়ু।

টগররাও চুপ করে থাকে না। কিছুক্ষণ বেপরোয়া গালিগালাজের আদানপ্রদান চলতে থাকে। তারপর হয়রান হয়ে পড়ে ঝড়ু। টগরদের জিভে এমন ধার এবং তাদের ভাঁড়ারে এত অফুরন্ত খিস্তি খেউড় জমানো যে দু'হাত তুলে সে বলে, 'ঠিক আচে বাবা, এবার ক্ষ্যামা দে। কোতায় তোদের মড়া?'

ঝড়ু রণে ভঙ্গ দেওয়ায় টগর আর চাঁপা খিস্তি থামায়। টগর শ্মশানের কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওখেনে—'

'চ—'

টগরদের পাশাপাশি চলতে চলতে ঝড়ু বলে, 'তোদের পাড়ার কে মরল?'

টগর বলে, 'আমাদের পাড়ার মড়া লয়।'

ঝড়ু অবাক হয়ে থাকে খানিকটা সময়। তারপর শুধোয়, 'তবে কার মড়া লিয়ে এলি?'

সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয় চাঁপা।

ঝড়ু হাঁ হয়ে যায়। তার বিস্ময় এক লাফে কয়েক গুণ বাড়ে। সে বলে, 'এই জম্পেশ ঠাণ্ডায় লিজেদের ঘরে পাসিঞ্জার (প্যাসেঞ্জার) না ঢুইকে (ঢুকিয়ে) রাস্তার মড়া নে এলি!'

চাঁপা তাকে কড়া ধমকে থামিয়ে দেয়।

একটু পর ওরা প্রৌঢ়দের কাছে চলে আসে।

নদীর দিক থেকে শীতের উল্টোপাল্টা বাতাস ছুটে আসছিল।। প্রৌঢ় এবং তার দুই ছেলে অসহ্য হিমে হি হি করে কাঁপছে।

ঝড়ু একবার খাটে শায়িত মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়কে বলে, 'সাট্টিফিট এনেচেন?' অর্থাৎ ডাক্তার বা হাসপাতাল থেকে আনা ডেথ সার্টিফিকেট। চিতা সাজাবার আগে মহিলাটির মৃত্যু যে স্বাভাবিক, সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাইছে ঝড়ু। একবার মাঝরাতে একটা অল্প বয়সের বউকে খুন করে ক'টা লোক পোড়াতে এনেছিল। এই নিয়ে পরে প্রচুর হুজ্জুত হয়েছে। সেই থেকে ডেথ সার্টিফিকেট না আনলে মড়া পোড়ায় না ঝড়ু। দারুণ হুঁশিয়ার হয়ে গেছে সে।

প্রৌঢ় বলে, 'এনেছি।' ডেথ সার্টিফিকেটের একটা নকল বার করে দেয় সে।

ঝড়ু এবার বলে, 'কাঠের দাম আর আমার মজুরিটা দ্যান। দেড়শ ট্যাকা।'

কিছুক্ষণ বাদে ক্ষিপ্র হাতে চিতা সাজিয়ে ফেলে ঝড়ু। তারপর প্রৌঢ় এবং দুই ছেলে ধরাধরি করে মহিলার মৃতদেহ চিতায় তোলে।

মারা গেলেও এতক্ষণ মা চোখের সামনেই ছিল। দু তিন ঘণ্টার মধ্যে তার নশ্বর দেহ শ্মশানের মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দুই ছেলেই একেবারে ভেঙে পড়ে। তাদের কাতর করুণ কান্নার আওয়াজ শীতের ভারি বাতাসে বিষাদ ছড়িয়ে দিতে থাকে। প্রৌঢ়টি অবশ্য শব্দ করে কাঁদছে না, তবে তার চোখ থেকে গাল বেয়ে ঢল নেমে আসছে।

একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে টগর আর চাঁপা। প্রৌঢ়, যুবক, কিশোর বা মৃত ওই মহিলা কাউকেই তারা চেনে না। টগরদের যা জীবন তাতে কারও জন্য শোক বা দুঃখ করার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। তাদের যাবতীয় কোমল অনুভূতি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তবু দু'জনেই টের পায়, কী এক কষ্টে বুকের ভেতরটা ক্রমশ ভার হয়ে উঠছে। নিজেদের অজান্তেই তাদের চোখ জলে ভরে যায়।

শুধু কোনওরকম প্রতিক্রিয়া নেই ঝড়ুর। মৃত্যু তার কাছে আলাদাভাবে লক্ষ করার মতো কোনও ঘটনাই নয়। একটা বিড়ি ধরিয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সে প্রৌঢ়কে বলে, 'আর দেঁড়িয়ে থাকবেন নি বাবু, কাজটা শ্যাষ করে ফ্যালেন। রোদ ফুটলে ঝাঁক বেঁইধে মড়া এসতে লাগবে। আপনাদের কাজ শ্যাষ হলে এট্টু জিরিয়ে লেবো। তারপর সারাদিনই তো ঝঞ্ঝট।'

প্রৌঢ় উত্তর দেয় না। বিড় বিড় করে কী মন্ত্র পড়ে বড় ছেলেকে দিয়ে মুখাগ্নি করায়। সেটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ু চিতায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আর তখনই ব্যাকুল চিৎকার করে কিশোরটি মায়ের মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'মা, মা গো—'

প্রৌঢ় উদ্ভ্রান্তের মতো বলে, 'রাজা, রাজা—'

সে এগিয়ে আসার আগেই টগর এবং চাঁপা কিশোর অর্থাৎ রাজাকে টেনে সরিয়ে আনে। কিন্তু তাকে কি ধরে রাখা যায়! পাগলের মতো চিতার দিকে সে দৌড়ে যেতে চাইছে। কিন্তু টগররা যেতে দেয় না। শক্ত করে দু'জনে তার দু হাত ধরে রাখে। অনেক কষ্টে তাকে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বসায়। নিজেরা তার দু'পাশে বসে পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভারি গলায় বলে, 'কেঁদো নি বাবা, কেঁদো নি। বাপ মা কি কারও চেরকাল থাকে!'

রাজা উত্তর দেয় না। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফোঁপাতেই থাকে।

শেষ রাতে চিতার আগুন নিভে যায়। মহিলার শরীর বিলীন হওয়ার পর প্রৌঢ় তার দুই ছেলেকে নিয়ে নদীতে স্নান করে আসে।

টগর এবং চাঁপার মধ্যে কয়েক ঘণ্টায় কিছু একটা ওলটপালট ঘটে গিয়ে থাকবে। তারাও প্রৌঢ়দের সঙ্গেই নদীতে নেমে ডুব দিয়ে এসেছিল।

প্রৌঢ় এবার দশ টাকার পাঁচটা নোট বার করে টগরদের দিকে বাড়িয়ে কৃতজ্ঞ সুরে বলে, 'এটা ধরো। মায়েরা, তোমরা আমাদের জন্যে যা করেছ তার—' বলতে বলতে তার গলা বুজে যায়।

টগর এবং চাঁপা চমকে তিন হাত পিছিয়ে হাতজোড় করে বলতে থাকে, 'ওটা নিতে পারব নি বাবা। সারাটা জেবন লরকে মুখ গুঁজে আচি। রোজই তো গায়ে নোংরা মেখে রোজগার করি। একটা দিন না হয় বাদই থাক। ছেলেদের নে ঘরে যান বাবা। এই শীতে ভেজা কাপড়ে থাকলে অসুক করবে। আমরা যাই—'

টগররা আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে শেষ রাতে ঝাপসা অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।



তলানি

রাত্রির এই তৃতীয় যামে আরব সাগর প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। বাতাসটাও কেমন যেন নিশিতে পাওয়া। অশরীরী একটা ডাকিনীর মতো আকাশময় সেটা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। আয়োজনটা পুরোপুরি নিখুঁতই হত, যদি কিছু মেঘ আর বিদ্যুতের হানাহানি এদের সঙ্গে হাত মেলাত।

কিন্তু ষষ্ঠ ঋতুর এই মাসটিতে মেঘ-বিদ্যুতের আশা নেহাতই দুরাশা।

না মেঘ, না বিদ্যুৎ, না বাজের গুরুগুরু—কোনও দিকেই সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। বাতাসের মাতামাতি ছাড়া আর যা আছে তা হল শুধু অন্ধকার। সে অন্ধকার আদিঅন্তব্যাপী, অগাধ। যেদিকে যতদূর চোখ ফেরানো যাক, সব কিছুর ওপর নিশ্ছেদ যবনিকার মতো তা স্থির হয়ে রয়েছে।

জায়গাটা আরব সাগর থেকে আধ মাইলের মধ্যে, বোম্বাইয়ের এক শহরতলিতে।

কেবলবে এটা বিশ শতকের আধুনিক, নানা মুন্সিয়ানায় পরিকল্পিত একটা নগরীর অংশ বিশেষ। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে —চারিদিকে অগণিত ঘিঞ্জি বস্তি। এখানে বলে ঝোপড়পট্টি। সেগুলোর মাথায় টালি বা খাপরার চাল। চালগুলো নিশ্চল ঢেউয়ের মতো দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দু-পাশে ঝোপড়পট্টি। মাঝখান দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ সরু গলি। গলি বললে যথেষ্ট বলা হয় না। অতখানি মর্যাদা এদের প্রাপ্য নয়। আসলে ওগুলো যুগপৎ পায়ে চলার রাস্তা এবং নর্দমা। বেরুবার ব্যবস্থা না থাকার দরুন দু'ধারের সারিবদ্ধ ঘরগুলি থেকে যত ক্লেদ এসে ওখানে জমা হয়েছে। ফলে কুৎসিত একটা দুর্গন্ধ এখানকার বাতাসে সব সময় অনড় হয়ে থাকে।

এখন, অন্ধকারের বেষ্টনীর তলায় এই শহরতলিটাকে বাস্তব জগতের বলে মনে হয় না। সমস্ত মিলিয়ে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন যেন।

এখানকার একটা গলির মধ্যে দিয়ে নরকের দু'টি পোকা চুপিসারে, প্রায় বুকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছিল। আগে আগে হাঁটছিল দীনেশ, টলতে টলতে একটা আদিম জন্তুর মতো তাকে অনুসরণ করে চলেছে আলফ্যানসো।

আরব সাগর এখান থেকে খুব কাছেই। বস্তিটা আশ্চর্য স্তব্ধ, অতএব সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন ক্রমাগত শোনা যাচ্ছে। অস্থির বাতাস দু'পাশের টালির চালের ফাঁক দিয়ে

সুযোগ পেলেই ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

রাত্রির এই তৃতীয় যামে দু'পাশের বস্তিগুলো অথৈ ঘুমে ডুবে আছে। জীবনের কোনও লক্ষণ কোথাও অবশিষ্ট নেই। পশ্চিম বোম্বাইয়ের এই শহরতলি যেন আদ্যিকালের কোনও মৃত পরিত্যক্ত নগর।

দু'ধারের ঘরগুলিতে কেউ জেগে তো নেই-ই, একটা আলোর রেখা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য গলিটার এখানে ওখানে এবং অনেক দূরে দূরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আলোগুলো ইতস্তত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেগুলোও স্তিমিত, ভূতুড়ে।

চলতে চলতে আলফ্যানসো জড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই সোয়াইন, ঠহর্ যা—'

লোকটা গোয়াঞ্চি পিদ্রু। দীর্ঘকাল বোম্বাই থাকার কারণে হিন্দিটা বেশ ভালোই শিখেছে। সেই সঙ্গে ইংরেজির কিছু খাদ মিশিয়ে ভাষাটাকে পুরোপুরি বর্ণসংকর করে ফেলেছে। শরীর তার বিপুল, থাবা দুটো প্রকাণ্ড। মাথার চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। হাত দুটো হাঁটুর তলা পর্যন্ত নেমে এসেছে। অতিকায় দেহের ভারে স্বাভাবিকভাবে হাঁটে না আলফ্যানসো, দুলে দুলে চলে। ইতিহাসের আগের যুগের কোনও মানবেতর প্রাণীর কথা তাকে দেখামাত্র মনে পড়ে যায়।

দীনেশ তার ডাক শুনতে পায়নি। আত্মবিস্মৃত একটা ঘোরের মধ্যে সে হাঁটছিল। বার বার চেতনা আর অবচেতনায় সেই মেয়েটার মুখ ভেসে উঠছিল। সেই মেয়েটা, যার নাম শান্তি।

আলফ্যানসো আবার চেঁচাল, 'অ্যাই কুত্তিকা বাচ্চে, শুনতা নেহি? ব্যাস্টার্ড তু—'

মধুর সম্ভাষণগুলো এবার কানে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীনেশ। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'জি?'

'আর কত দূর? হাউ ফার?'

'আর বেশি দূর নয়।'

আলফ্যানসো এবার চাপা বিরক্ত গলায় আপন মনে গজ গজ করতে লাগল, 'এই ডার্টি হেলের মধ্য দিয়ে সন্ধে থেকে হাঁটাচ্ছিস। যখনই জিজ্ঞেস করছি, এক জবাব—। বেশি দূর না। হারামী, উল্লু কাঁহিকা—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের চলতে শুরু করল দীনেশ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে শান্তির মুখ আবার চোখের সামনে ফুটে বেরুল। প্রাণপণে, নিজের সমস্ত শক্তি একত্র করে তাকে ভুলতে চেষ্টা করল দীনেশ। কিন্তু না, মেয়েটা তার পিছু ছাড়ছে না। একটা অদৃশ্য আবর্তের মধ্যে তাকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেন।

শান্তির ভাবনা তাকে বেশিক্ষণ মগ্ন রাখতে পারল না। দুলতে দুলতে দীনেশের পিছু পিছু আলফ্যানসো আসছিল। সে আবার ডাকল, 'অ্যাই—'

অতএব দীনেশকে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

কাছে এসে রক্তাভ গোল চোখ দুটো তার মুখের ওপর কিছুক্ষণ স্থির করে রাখল আলফ্যানসো। তারপর বলল, 'অ্যাই শালে, তোর কোনও বদ মতলব নেই তো?'

বদ মতলব! লোকটা ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীনেশ।

'এই ঝোপড়পট্টির ভেতর ঢুকিয়ে খালি হাঁটাচ্ছিস আর হাঁটাচ্ছিস। সচমুচ বল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?'

'যেখানে নিয়ে যাবার কথা—' গলার ভেতরকার অনেকগুলো স্তর ঠেলে দীনেশের স্বরটা কোনও রকমে বেরিয়ে এল।

এবার এক কাণ্ডই করে বসল আলফ্যানসো, দুই প্রকাণ্ড থাবায় দীনেশের গলাটা টিপে ধরে গর্জে উঠল, 'আমার সাথ যদি হারামীগিরি করিস, জান একেবারে খতরা করে ছাড়ব। ইয়াদ রাখিস।'

কথাটা মনে করিয়ে না দিলেও চলত। কেননা আলফ্যানসো-চরিত্র তার অজানা নয়। বে-আইনি ভাটিখানার মালিক এই লোকটা কথায় কথায় কোমরের খাঁজ থেকে একটা বার ইঞ্চি ছুরির ফলা বার করে আনতে পারে এবং সেটা বুকে বসিয়ে দিতে তার হাত এতটুকু কাঁপবে না।

দীনেশের শ্বাসনলীটা ছিঁড়েই যেত হয়তো। তার আগেই হাতের মুঠি আলগা করল আলফ্যানসো।

কয়েকটা স্তব্ধ, নিশ্চল মুহূর্ত। তারপর আলফ্যানসোই আবার বলে উঠল, 'এ দীনেশ—' স্বরটা এবার ঈষৎ নরম, কিছুটা বা অন্তরঙ্গ।

অসহ্য যন্ত্রণায় গলার কাছটা টন টন করছে। হাত বুলোতে বুলোতে দীনেশ বলল, 'জি—'

'তুই তো বলেছিলি লড়কিটা বঙ্গালি— না?'

'হ্যাঁ।'

'খুবসুরত?'

কাঁপা গলায় কী একটা জবাব যেন দিল দীনেশ।

আলফ্যানসো যেন নেশার ঘোরে বলতে লাগল, 'বিলকুল ফিরেশ (ফ্রেস), না কি বলিস? অ্যাই?'

এবারও কী বলতে চেষ্টা করল দীনেশ কিন্তু অব্যক্ত গোঙানির মতো একটা শব্দ গলা থেকে বেরিয়ে এল মাত্র।

আলফ্যানসো বলল, 'নে, আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। জলদি চল—'

যন্ত্রচালিতের মতো ফিরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল দীনেশ। ফেরামাত্র সেই

মেয়েটা, অর্থাৎ শান্তি চেতনার স্তর ঠেলে আবার উঠে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে গেল দীনেশের।

শহরতলির এই ঝোপড়পট্টিটার উত্তর প্রান্তে, শেষ ঘরখানায় থাকে দীনেশ। একাই থাকে সে। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন জীবিকা নামে একটা চরকি-কলে অবিরাম পাক খায়। তারপর ঘরে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত।

কখন যে সে বেরিয়ে যায় আর কখন ফেরে, এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। কেননা, দীনেশের আসা-যাওয়ার সময় বস্তিটা ঘুমে অসাড় হয়ে থাকে।

খাওয়া-দাওয়া সবই তার বাইরে। শুধু কয়েক ঘণ্টা রাত কাটানোর জন্য দীনেশের এখানে ফিরে আসা। নিতান্ত ঘুমটুকুর জন্যই এখানকার সঙ্গে তার যা কিছু সম্পর্ক।

মাস দুয়েক আগে যথারীতি রাত দুটো পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে ফিরছিল দীনেশ। ঘুমে দু'চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল তার। পা-দুটো স্বাভাবিকভাবে পড়ছিল না, কেমন যেন টলছিল।

নিজের ঘরের সামনে এসে সবেমাত্র তালায় হাত দিয়েছে, হঠাৎ আধফোটা একটা গোঙানিতে গলির মন্থর, ভারি বাতাস শিউরে উঠেছিল। চকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল দীনেশ।

কিছুটা দূরে মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্প-পোস্ট। তার তলায় খানিকটা আলো-আঁধারি। সেখানে কী একটা যেন থেকে থেকে নড়ে উঠছিল। একদৃষ্টে, স্থির নিষ্পলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল দীনেশ। তারপর পায়ে পায়ে সম্মোহিতের মতো কখন যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল নেই।

মিউনিসিপ্যালিটির আলোটা যদিও নিস্তেজ, তবু এটুকু বোঝা গিয়েছিল, যে পড়ে আছে সে কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে। তার গায়ের রং, চোখমুখের চেহারা—এ-সব খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় তখন নয়। কেননা মেয়েটির সর্বাঙ্গ ছিল রক্তাক্ত। নিশ্চেতন একটা ঘোরের মধ্য থেকে অব্যক্ত আর্তনাদ করে উঠছিল সে।

অনেকখানি ঝুঁকে দীনেশ ডেকেছিল, 'এ জি, তুম কৌন?'

মেয়েটি সাড়া দেয়নি। দেবার মতো অবস্থা তখন তার নয়।

অতএব কর্তব্য স্থির করতে খুব একটা সময় লাগেনি দীনেশের। একটু ইতস্তত করে মেয়েটিকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়েছিল সে। তারপর নিজের ঘরে এনে আলো জ্বেলে বিছানা করে শুইয়ে দিয়েছিল।

মেয়েটির সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত। ধারাল কোনও অস্ত্র দিয়ে অন্ধের মতো তাকে আঘাত করা হয়েছে। সারা গায়ের রক্ত মুছিয়ে বিছানার একটা চাদর পরিয়ে দিয়েছিল দীনেশ। তা ছাড়া উপায় ছিল না। কেননা, ধুতির বালাই দীনেশের ঘরে নেই। যা আছে তা হল পায়জামা আর পাতলুন।

সেই মধ্যরাতে করণীয় প্রায় কিছুই ছিল না দীনেশের। বোম্বাইয়ের এই শহরতলিতে অত রাত্রে ডাক্তার জোটানো একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং বিমূঢ়ের মতো মেয়েটার মাথার কাছে সারা রাত বসে ছিল দীনেশ, আর মেয়েটা বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল।

ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরে এসেছিল মেয়েটার। আচ্ছন্ন রক্তাভ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে দীনেশের মুখের ওপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল।

দীনেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'নাম কেয়া তুমহারী, রহতী কিধর?'

গলায় বেশ জোর দিয়েই প্রশ্ন দুটো করেছিল দীনেশ। কিন্তু মেয়েটা যেন শুনতে পায়নি। ক্ষীণ নির্জীব সুরে সে বলেছিল, 'আমি কোথায়?'

'মতলব—' বলেই থেমে গিয়েছিল দীনেশ। যুগপৎ একটা বিস্ময় আর অথৈ বিমূঢ়তা চারিদিক থেকে তাকে বেষ্টন করেছিল যেন। সেটা অহেতুক নয়। কত, কত কাল? যেন জন্মান্তরের ওপার থেকে আবাব বাংলা ভাষাটা শুনতে পেয়েছিল দীনেশ।

জন্মান্তর! একবকম তাই তো। ছ'বছর আগে কলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছিল দীনেশ। ছ' বছর অর্থাৎ একটা যুগের আধাআধি। এই দীর্ঘ সময় দেশে ফেরেনি সে। কোনওদিন সেখানে ফেরার আর ইচ্ছেও নেই, সাহসও নেই।

কলকাতা বলতে একটা হৃদয়-বর্জিত নিষ্ঠুর ব্যাধের কথা মনে পড়ে যায়। সবসময় অস্ত্র উদ্যত রেখে তার পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে যেন শহরটা। কলকাতাকে ভুলবার জন্য, তার মৃত্যুফাঁদ এড়াবার জন্য বার শো মাইল পাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের পার থেকে আরব সাগরের পারের এই শহরে পালিয়ে এসেছে দীনেশ।

পালিয়ে এসেও নিশ্চিন্ত নেই সে। এই বিশাল শহরে যেখানে যেখানে বাঙালি রয়েছে সে-সব এলাকার ধারে কাছে ঘেঁষে না দীনেশ। খুঁজে খুঁজে পশ্চিম বোম্বাইয়ের এই শহরতলিতে লুকোবার মতো একটা বিবর বার করেছে। জায়গাটা বাঙালি-বর্জিত। ত্রিভুবনের যত ভিখিরি, কারখানার কুলি, কিছু জেলে, জনকয়েক লক্কড় বেশ্যা, চোর-পকেটমার-মাদারি খেলোয়াড় এবং জন্মপরিচয়হীন মানুষ এখানে ডেলা পাকিয়ে রয়েছে। লুকিয়ে থাকার মতো এর চাইতে চমৎকার স্বর্গ আর কোথায় আছে!

মানুষ তো নয়, অসংখ্য ঘিনঘিনে জীবাণু। তাদের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছে দীনেশ। বাংলা ভাষা সে বলে না, বাংলা পোশাক পরে না। মুখে তার অনর্গল বোম্বাইয়া হিন্দি, পরনে ডোরাকাটা বুশ শার্ট আর পাতলুন। চলায়-ফেরায়, রুচিতে-ভাষায় ছ'বছর আগের একটি বাঙালি ছেলেকে তার ভেতর থেকে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

বহুকাল পর আহত মেয়েটির মুখে বাংলা ভাষা শুনে কিছুটা আত্মবিস্মৃতই হয়ে পড়েছিল দীনেশ। ঘোরের মধ্য থেকে সে নিজেও বাংলাতেই বলে উঠেছিল, 'তুমি বাঙালি?'

'হ্যাঁ, আমার নাম শান্তি।' সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও মেয়েটির অর্থাৎ শান্তির দু'চোখে কিছুটা কৌতূহল চমকে উঠেছিল যেন, 'আপনি?'

'আমিও বাঙালি।'

'আমি আপনার এখানে এলাম কী করে?'

দীনেশ বলতে লাগল। শুনতে শুনতে চোখদু'টি স্তিমিত হয়ে বুজে গেল মেয়েটির। চেতনা আবার তার লোপ পেয়েছে।

ঘরে যখন তুলেই এনেছে, প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা অন্তত করা দরকার। অগত্যা সকাল হলে দু'মাইল দূর থেকে একজন ডাক্তার ডেকে এনেছিল দীনেশ।

ওষুধে ইঞ্জেকশানে কয়েক দিনের মধ্যেই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল শান্তি। শরীর থেকে অনেকখানি রক্ত বেরিয়ে গেছে। কাজেই সুস্থ হলেও দুর্বলতা পুরোপুরি কাটল না।

আশ্চর্যের ব্যাপার, শান্তিকে নিয়ে আসার পর থেকে ঝোপড়পট্টি ছেড়ে বিশেষ বেরুত না দীনেশ। বেরুলেও সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসত। প্রথম দিকে আহত মেয়েটাকে পরিচর্যার প্রশ্ন ছিল। পরে শান্তি যত সুস্থ হচ্ছিল, দীনেশের চোখ দু'টি তার মধ্যে একটা বিশেষ কিছুকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছিল। আগে তার দিকে তেমন লক্ষ পড়েনি। একটা ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মেয়ে—মাত্র এটুকুই দেখেছিল দীনেশ। ধীরে ধীরে সে বুঝল শান্তি অসাধারণ রূপসী নয়, গায়ের রংখানি মাজা-মাজা, চিবুকটি খাঁজ-খাওয়া, চোখ দু'টি টানা না হলেও ভাষাময়, শক্ত নিটুট গড়ন। মোটামুটি আলগা একটা চটক রয়েছে। এই দেহটিতে কিছু কারিগরি করতে পারলে (যেমন চোখে কাজল, গালে একটু রং, চুলে ফিতে) নিদারুণ এক আকর্ষণ ফুটিয়ে তোলা যায়। এই কথাটা মনে হওয়ামাত্র সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে তুমুল আলোড়ন আরম্ভ হয়ে গেছে দীনেশের। এবং সেই থেকে শান্তিকে সর্বক্ষণই আগলে আগলে রেখেছে সে।

শান্তি জানে না কোথায় কোন নরকে এসে ঠেকেছে সে। তার রক্ষাকর্তা সমাজের কোন স্তরের জীব, অন্ধকারের কোন কুটিল পথে দীনেশের আনাগোনা—সবই তার

অজানা।

ছ'বছর আগে কলকাতার সেই শহরতলিতে দীনেশের একটামাত্র পরিচয়ই ছিল—সে দুর্ধর্ষ ওয়াগন-ব্রেকার। আই. এ পর্যন্ত পড়েছিল দীনেশ। ফাইনাল পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। তার আগেই প্রায় আধ ডজন ভাইবোন এবং মায়ের দুর্বহ দায়িত্ব মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তার কেরানি বাবা সজ্ঞানে মারা গিয়েছিল। আর সেই দায়িত্বের উত্তরাধিকার নিয়ে একটা চাকরির জন্য দুটো বছর প্রায় শিকারি কুকুরের মতো দুয়ারে দুয়ারে হানা দিয়েছে দীনেশ। কিন্তু সেটা উনিশশো পঁয়ষট্টির বাংলাদেশ। কোথায় চাকরি? সৎ জীবিকার কোনও দরজাই কোনও দিকে খোলা নেই। অতএব বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে দ্বিতীয় আরেকটা জগৎ রয়েছে, সেখানকার কালো অন্ধকার গহ্বরে এই যুগটা ধীরে ধীরে তাকে ঠেলে দিয়েছিল। হাতেখড়ি হয়েছিল ট্রেনের তার কাটা দিয়ে। দেখতে দেখতে সমস্ত পাট চুকিয়ে ওয়াগন-ব্রেকার হযে দাঁড়িয়েছিল দীনেশ। সেই সূত্রে শহরতলি থেকে এক্সটার্ন করে দেওয়া হয়েছিল তাকে। দিনের বেলাটা বাইরে কোথাও গিয়ে থাকত সে। সন্ধে হলেই ফিরে আসত। অন্ধকারে ওয়াগন ভেঙে রাতারাতি মাল পাচার করে ভোর হবার আগেই আবার পালাত। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু শেষবার ওয়াগন লুট করতে গিয়ে বোঝা গেল রেল-পুলিশ ফাঁদ পেতে বসে আছে। ধরাই পড়ে যেত, হাতে একটা লোহার প্রকাণ্ড সাঁড়াশি ছিল। সেটা একটা সেন্ট্রির মাথায় সমস্ত শক্তিতে নামিয়ে দিয়ে বোম্বাই পালিয়ে এসেছে। পরে জেনেছিল সেন্ট্রিটা সেদিনই মারা যায়। এবং মরার আগে তার কিঞ্চিৎ উপকার করে গেছে। দীনেশকে চিনতে পেরেছিল, মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে দীনেশের নাম বলে গেছে সে। এরপর স্বাভাবিক কারণেই দীনেশের নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে।

এ দিকে, বার শো মাইল দূরের এই বোম্বাই শহরটাও তাকে সুস্থ জীবনের নিশানা দেখাতে পারেনি, একটা সৎ জীবিকা দিতে পারেনি। বাংলাদেশ যে অন্ধকার সুড়ঙ্গে তাকে ঠেলে দিয়েছিল, বোম্বাই সেখানে তাকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়েছে। এখানে তার পরিচয় ওয়াগন-ব্রেকার হিসেবে নয়। চারপাশের মারাঠি গ্রামগুলো থেকে কিংবা শহরতলির গরিব মানুষের সংসার থেকে যুবতী ফুসলে ফুসলে বার করে আনে সে। তারপর নারীমাংসলোভী নেকড়েদের হাতে তুলে দেয়। এখন এ-ই তার জীবিকা, তার প্রাণধারণের একমাত্র পথ। এই পথে যে অর্থ আসে তার একটা বড় অংশই বেনামে মায়ের নামে পাঠিয়ে দেয় দীনেশ। মনুষ্যত্বের এটুকু তলানিই এখন পর্যন্ত তার মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে।

সুতরাং শান্তিকে দেখতে দেখতে তার ভেতরকার বিষাক্ত সাপটা ধীরে ধীরে কুণ্ডলি পাকাচ্ছিল। যতদিন না মেয়েটা সম্পূর্ণ সবল হয়, তাকে চোখে চোখে

রাখছিল দীনেশ।

এদিকে শান্তি তার জীবনের সকল দিক অনর্গল করে দিয়েছিল। যে মানুষ প্রাণে বাঁচিয়েছে, তার কাছে আর যাই হোক, সঙ্কোচের কোনও অবকাশই নেই।

ইতিহাসটা প্রায় পরিচিতই। দেশভাগের পর ফরিদপুরের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা। কিছুদিন শিয়ালদার প্ল্যাটফরমে কাটিয়ে খিদে নামে একটা অন্ধ জৈব তাড়নায় বাবা-মা, ভাই-বোন ছেড়ে অন্ধকারে ভেসে যাওয়া। কত মানুষেরই না নিশিসঙ্গিনী হয়েছে শান্তি! পুরুষ নামে কত শ্বাপদের নখরাঘাতেই না রক্তাক্ত হয়েছে। কত আড়কাঠির হাত-ফেরতা হয়ে ভাসতে ভাসতে সে শেষ পর্যন্ত বোম্বাই এসেছিল। থাকার কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না। আজ এখানে, কাল সেখানে। অর্থাৎ প্রতি রাত্রেই একটা করে সঙ্গী জুটে যেত। তারা যেখানে নিয়ে তুলত সেখানেই রাতটা কেটে যেত।

জীবনটা প্রায় অনুভূতিশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সুখ-দুঃখ ভালোমন্দের সমস্ত বোধই বিলুপ্ত। নিষ্ঠুর যান্ত্রিক একটা নিয়মে তার জীবনে দিনান্তে রাত্রি, নিশান্তে দিনের আবির্ভাব ঘটছিল।

তবে শান্তির একটা ভয় ছিল। কিছু নগদ টাকা আর গয়না এরই মধ্যে সে জমিয়েছে। সেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। টাকা-গয়নার লোভে কেউ না আবার ক্ষতি করে বসে!

শান্তির ভয়টা অকারণে নয়। শেষ পর্যন্ত যা সে আশঙ্কা করেছিল তা-ই ঘটল। দিনকয়েক আগে একটা সিদ্ধি তাকে বোম্বাইয়ের শহরতলিতে নিয়ে এসেছিল। তারপর টাকা-গয়না ছিনিয়ে এলোপাথাড়ি ছোরা মেরে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল।

রুদ্ধশ্বাসে বলেছিল শান্তি, 'সেদিন রাস্তা থেকে কেন আপনি আমাকে তুলে এনেছিলেন? মরে যেতাম, সে-ই ছিল ভালো। কেন আমাকে বাঁচালেন?'

দীনেশ উত্তর দেয়নি। শান্তির জীবনের যন্ত্রণাময় কাহিনী শুনতে শুনতে তার মনে কোনও প্রতিক্রিয়াই হয়নি। চেতনার কোথাও করুণার এতটুকু বাষ্পও জমেনি। সমাজের যে স্তর থেকে দীনেশ উঠে এসেছে এবং এখনও যে স্তরে জীবিকার জন্য তার ঘোরাফেরা, সে-সব জায়গায় এমন কাহিনী প্রায় সর্বক্ষণই শুনতে হয়। কেন রাস্তা থেকে শান্তিকে তুলে এনেছিল সে জবাব দিতে গেলে জন্মগত একটা সংস্কারের কথাই বলতে হয়। আহত মুমূর্ষু দেখলে সেই সংস্কারটা মানুষকে হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়।

সংস্কারবশেই শান্তিকে ঘরে তুলে এনেছিল দীনেশ, তাকে বাঁচিয়েছিল। আর এই বাঁচাতে গিয়েই হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, সে ঠিক কাজই করেছে। মেয়েটা রূপসী না হলেও আকর্ষণ করার মতো কিছু-কিছু ব্যাপার তার আছে। আর দীনেশের যা

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই শান্তি আবার বলে উঠেছিল, 'ভালো হয়ে উঠেছি। এবার তো আমায় চলে যেতে হবে। আবার সেই নরককুণ্ডে ফিরে যাব।'

দীনেশ বলেছিল, 'যাবে কেন, যদ্দিন খুশি থাক না।'

শান্তি উত্তর দেয়নি। কৃতজ্ঞতায় তার দু-চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

শান্তিকে নিয়ে আসার পর প্রথম দুটো রাত্রি তার সঙ্গে এক ঘরে কাটিয়েছে দীনেশ। সেই দুটো দিন প্রায় বেহুঁশ হয়ে ছিল মেয়েটা। অতএব তার শিয়রে বসে থাকতে হয়েছে। তৃতীয় দিন থেকে সুস্থতার লক্ষণ যখন দেখা দিতে লাগল তখন রাত কাটাবার ব্যবস্থা বদলে ফেলল দীনেশ।

একখানা মাত্র ঘর। বাইরের বারান্দাটা অবশ্য ভাঙাচোরা টিন দিয়ে ঘেরা। ঠিক হল, রাত্রিবেলা শান্তি ঘরের মধ্যে থাকবে। বাইরেব বাবান্দায় দড়ির খাটিয়া পেতে দীনেশের শোবার বন্দোবস্ত হল।

যতদিন শান্তি শয্যাশায়ী ছিল, দোকান থেকে খাবার কিনে আনত দীনেশ। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠে বলল, 'দেখুন, এভাবে ভালো লাগছে না।'

'কী?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল দীনেশ।

'মেয়েমানুষ, দিনরাত নিষ্কর্মা বসে থাকি। দোকান থেকে খাবার কিনে আনেন। ভারি খারাপ লাগে আমার।'

'কী করতে চাও তুমি?'

দ্বিধান্বিতভাবে শান্তি বলেছে, 'আপনার তো দেখছি বাউণ্ডুলের সংসার। সংসার বলছি কাকে। হাঁড়ি নেই, কড়া নেই, উনুন নেই। নেই বলতে কিচ্ছু নেই। ও-সব কিনে আনুন। কাল থেকে রান্নাবান্না করব। দিনরাত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না।'

শান্তির ফরমাশমতো ধীরে ধীরে সবই কিনে দিয়েছে দীনেশ। তারপর বারান্দার এক প্রান্তে বসে মেয়েটার চলাফেরা গতিবিধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছে।

দিন দুয়েকের মধ্যেই সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়েছে শান্তি। নতুন হাঁড়ি, কড়া, ডেকচি, বালতি ঘরের এক দিকে সব সাজিয়ে রেখেছে। তোলা উনুন, কয়লা ঘুঁটে দিয়ে বারান্দার একটা অংশকে নিখুঁত রান্নাঘরই করে তুলেছে সে।

সকালবেলা উনুনে আঁচ ধরিয়ে একরকম তাড়া দিয়েই দীনেশকে বাজারে পাঠায় শান্তি। সে ফিরে এলে বাজারের থলেটা উপুড় করে ঢেলে ফেলে গালে হাত দেয়, 'নাঃ, আপনাকে নিয়ে পারা যায় না। দুটো তো খাবার লোক, তাতে মাছ এনেছেন, আবার মাংসও আনা হয়েছে! পয়সা বুঝি খুব সস্তা!'

কোনও দিন বা বলে, 'আপনার কিছুই ছাই মনে থাকে না। হলুদ আর কালোজিরে

আনতে বলেছিলাম না?'

আরেক দিন হয়তো বলল, 'আপনি কিচ্ছু জানেন না। আজ না মঙ্গলবার, মঙ্গলবারে গেরস্ত ঘরে কেউ মোচা আনে?'

বাজার করে আসার পর ক্ষিপ্র হাতে চা করে দেয় শান্তি। তারপর বাটনা বেটে, আনাজ এবং মাছ কেটে রান্না বসায়। রান্না যখন শেষের মুখে দীনেশকে স্নানের জন্য তাড়া লাগায়। ঝোপড়পট্টির এজমালি কলে দীনেশ স্নান সেরে এলে নিজে ছোটে।

স্নানের পর খাওয়া-দাওয়ার পালা। খেতে বসিয়ে দীনেশের পাতে ক্রমাগত এটা-ওটা দিতেই থাকে।

দীনেশ যদি বলে, 'কত দিচ্ছ, আমি আর খেতে পারব না।'

শান্তি বলে, 'না খেলে আপনাকে ছাড়ছে কে? এতকাল বাজারের ছাইভস্ম খেয়ে খেয়ে শরীরের কী হাল করেছেন, খেয়াল আছে? আমি যখন আছি, তিন দিনে আপনার শরীর ঠিক করে দেব।'

'এই রকম ফাঁসির খাওয়া খাইয়ে?' মৃদু হেসেছে দীনেশ।

'ফাঁসি-টাসি এ সব অলুক্ষণে কথা বলতে হবে না। লক্ষ্মী ছেলের মতো তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠুন তো।' শান্তি ঝাঁঝিয়ে উঠেছে।

সে যেন এক কিশোরী বধূ। কখনও রাগ করে, কখনও অভিমান করে, আবার কখনও বা ধমক দিয়ে রোজ দীনেশকে প্রয়োজনের বেশিই খাওয়ায়। শান্তির কথামতো না খেলে নিস্তার নেই। কোনও দিন যদি বিকেলের দিকে দীনেশ বেরোয় এবং ফিরতে ফিরতে তার বেশ রাত হয়ে যায়। এসে দেখে শান্তি তাব জন্য বসে আছে। দীনেশকে খাইয়ে তবে খেতে বসে মেয়েটা, তা সে যত রাতই হোক।

দীনেশ যদি বলে, 'আমার জন্যে বসে আছ কেন? খাবার ঢাকা দিয়ে নিজে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেই পারতে।'

শান্তি ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে, 'আহা কথার কী ছিরি! পুরুষমানুষ বাইরে বাইরে রইল, আর আমি খেয়ে নাক ডাকাই। এমনটা আর কোনও দিন বলবেন না।'

এ-কথার উত্তর দিতে পারেনি দীনেশ। কী উত্তরই বা দেবে। এমন করে কাছে বসিয়ে একমাত্র মা ছাড়া আর তো কেউ কোনও দিন খাওয়ায় নি। তার প্রতীক্ষায় মা ছাড়া আর কি কেউ বসে থেকেছে? মায়ের স্নেহ বহুদূরের বিস্মৃত অতীত। হাজার চেষ্টাতেও তা মনে করতে পারে না দীনেশ। কিন্তু শান্তি প্রতিদিনের স্পর্শের মধ্যে রয়েছে। তার মমতা, সেবা প্রতি মুহূর্তের অনুভূতিকে বেষ্টন করে আছে।

জীবন নামে একটা নিষ্ঠুর ব্যাধ প্রায় এক যুগ ধরে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে আসছে। তার ভয়ে সবসময় জর্জরিত দীনেশ। তার চেতনা আর অবচেতনার সকল দিকেই সেই ভয়টা ঘিরে রয়েছে। কিন্তু শান্তি আসার পর আকণ্ঠ উদ্বেগের বেষ্টনী

থেকে ক্ষণকালের জন্য হলেও মুক্তি পায় দীনেশ। ঘরকন্না আর প্রতিনিয়ত আবদার-অভিমানের মোহ দিয়ে তার জীবনের অন্ধকারটাকে প্রায়ই ভুলিয়ে রাখে শান্তি।

এতকাল বোম্বাইয়ের এই শহরতলিতে নিষুতি নামবার পর কৃমির মতো বুকে হেঁটে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতে আসত দীনেশ। ঘরের সঙ্গে মাত্র এটুকুই ছিল তার সম্পর্ক। ইদানীং শান্তি রাত কাটাবার সেই আস্তানাটাকে নিপুণ হাতে একটা পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ সংসার করে তুলেছে।

শান্তির মুখে প্রথম প্রথম যখন তার জীবনের যন্ত্রণাময় করুণ ইতিহাস শুনেছিল, বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি দীনেশ। সে শুধু ভেবেছিল, মেয়েটা যখন স্বেচ্ছায় তার ঘরে থেকেই গেছে, তাকে দিয়ে টাকা ধরার একটা ফাঁদ পাতবে। নিজের জীবিকার জন্যই প্রথম প্রথম তাকে চোখে চোখে রাখত দীনেশ, যতক্ষণ সম্ভব তার কাছে থাকত। পরেও অবশ্য থাকত, তবে নিজের সেই কদর্য জীবিকার ধান্দায় নয়, শান্তিকে ঘিরে কিসের এক ঘোরের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল দীনেশ। একটা অনাস্বাদিত গৃহীজীবন তাকে একটু একটু করে মগ্ন করে ফেলছিল।

এইভাবে কতদিন আর চলত বলা অসম্ভব। হঠাৎ দিন দুই আগে মায়ের চিঠি এসেছে। ছোট বোনটার বিয়ে স্থির হয়েছে। চিঠি পাওয়ামাত্র দীনেশ যেন অন্তত কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয়। ভাই যার ফেরারি আসামী, তার বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করা যে কী নিদারুণ ব্যাপার, আকারে ইঙ্গিতে মা তা জানিয়েছে। অতি কষ্টে ছেলেটি জোগাড় হয়েছে। পাত্রপক্ষ দীনেশের নোংরা ইতিহাস জানবার আগেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা উচিত। অতএব টাকা পাঠাতে যেন দেরি না হয়।

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই টাকার জোগাড়ে বেরিয়েছে দীনেশ। নিজের কাছে হাজার খানেকের মতো আছে। আরও দরকার। প্রথমে ধার করতেই চেয়েছিল সে। কিন্তু টাকা দিয়ে বিশ্বাস করার মতো বন্ধু বোম্বাইতে একটিও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দুটো দিন অস্থির উদ্‌ভ্রান্তের মতো টাকা টাকা করে ঘুরে বেড়িয়েছে দীনেশ। চারপাশের গ্রামে গ্রামে আর শহরতলির বস্তিতে গিয়ে হানা দিয়েছে, কিন্তু তার যা জীবিকা, সেদিক থেকে বিন্দুমাত্রা সুবিধে হয়নি। অবশেষে বিদ্যুৎচমকের মতো শান্তির মুখটা মনে পড়ে গেছে।

অনেক দ্বিধার পর মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত আজ সন্ধ্যায় আলফ্যানসোর কাছে গিয়েছিল দীনেশ। তার কাছ থেকে কয়েক শো টাকা নিয়েছে। মৌখিক চুক্তি হয়েছে পুরো একটি সপ্তাহ শান্তির কাছে নিয়ে আসবে তাকে।

পেছন থেকে আলফ্যানসো চিৎকার করে উঠল, 'এ উল্লু, রাস্তা কি তোর শেষ হবে না?'

চলতে চলতে চকিত হয়ে উঠল দীনেশ। এতক্ষণ যেন সজ্ঞানে হাঁটছিল না। চারপাশে সারিবদ্ধ ঘর, পায়ের তলায় আঁকাবাঁকা গলি, দীর্ঘকালের সঞ্চিত আবর্জনা, কিছুই তার নজরে পড়ছে না। পড়লেও চেতনায় রেখাপাত করতে পারছিল না। শান্তি নামে সেই মেয়েটা তার প্রাণের সকল দিককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

আলফ্যানসোর চিৎকারে সচেতন হয়ে উঠল দীনেশ। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মাত্র কয়েক গজ দূরে সেই ঘরটা, যেখানে শান্তি তার ফিরতে দেরি দেখে ভাত নিয়ে বসে বসে ঢুলছে। আর সে কিনা আলফ্যানসো নামে একটা আদিম জন্তুকে সঙ্গে নিয়ে তার মুখে মেয়েটাকে সঁপে দিতে চলেছে! ভাবতে ভাবতে চেতনার মধ্যে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেল যেন। সমস্ত অস্তিত্ব একটা অতল গহ্বরে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হতে লাগল।

এ কী করছে সে!

যে ঘরটি ছিল রাত কাটাবার আস্তানা, সেটাকে চমৎকার একখানা সংসার করে তাকে উপহার দিয়েছে শান্তি। নিজের সেই সংসারটাকে কিনা ধ্বংস করতে চলেছে দীনেশ! এমন করে কেউ কখনও হঠকারিতা করে! এ এক নিষ্ঠুর আত্মহনন। ভাবতে ভাবতে কর্তব্য স্থির করে ফেলল দীনেশ।

আলফ্যানসো আবার হুমকে উঠল, 'এ হারামী—'

মুখ ফিরিয়ে দীনেশ বলল, 'আইয়ে, আউর থোড়া—'

এরপর আলফ্যানসোকে নিয়ে আরেকটা সরু গলির মধ্যে ঢুকল দীনেশ। মিনিট কয়েক হাঁটিয়ে একসময় বস্তির বাইরে বার করে দিয়ে এল।

বাইরে এসে আলফ্যানসো গর্জে উঠল, 'এ কৌন দিল্লাগি রে কুত্তা! এ দীনেশ—'

তার কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে ঝোপড়পট্টির মধ্যে ঢুকে পড়ল দীনেশ। বস্তির এই গোলকধাঁধা থেকে তাকে খুঁজে বার করা আলফ্যানসোর সাধ্যের বাইরে। অন্তত আজকের রাত্রিটার জন্যে তো বটেই।

নিজের ঘরখানার দিকে ছুটতে ছুটতে দীনেশ ভাবল, জীবনব্যাপী বিষের মাঝখানে অমৃতের একবিন্দু তলানি অন্তত থাক।

আলফ্যানসো কেন, আর কাউকেই নিজের ঘরে শান্তির কাছে এমনভাবে নিয়ে যেতে পারবে না দীনেশ।



সুদীপ এবং একটি মেয়ে

এই দুপুর বেলায় ডাউন লোকাল ট্রেনটায় একেবারেই ভিড় টিড় নেই। সুদীপ যে কম্পার্টমেণ্টে জানলার ধার ঘেঁষে বসে আছে সেখানে মাত্র দশ বারোটি প্যাসেঞ্জার। তারা এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

দুপুরের দিকে দু-এক ঘণ্টা বাদ দিল সাবার্বন লাইনের ট্রেনগুলোতে ছুঁচ গলাবার জায়গা থাকে না। এখন কামরাগুলো এমনই ফাঁকা, ইচ্ছা করলে শুয়েও যাওয়া যায়।

এই সময়টা কোনও দিন বাড়ি ফেরে না সুদীপ। আচমকা অফিসে স্ট্রাইক হয়ে যাওয়ায় করার কিছুই ছিল না। এয়ার-কণ্ডিশানড সিনেমা হলে গিয়ে কোনও বিদেশি রোমাণ্টিক ছবিটবি দেখে ঘণ্টা তিনেক আরামে কাটিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু ফিল্ম দেখতে আজ ভাল লাগছিল না।

কলকাতা থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে বীরপুরের নতুন টাউনশিপে বাড়ি করেছে সুদীপরা। এ লাইনের সে একজন ঝানু ডেইলি প্যাসেঞ্জার। সকালে আটটা পঁচিশের ট্রেন ধরে কলকাতায় আসে, ফেরে ছ'টা চল্লিশ কি সাতটা আটের ডাউন লোকালে। একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে ছোট মাপের একজন একজিকিউটিভ সে।

সুদীপের বয়স আটাশ উনত্রিশ। ছ ফিটের মতো হাইট, মেদহীন টান টান চেহারা, স্পোর্টসম্যানদের মতো দারুণ স্বাস্থ্য, গায়ের রং বাদামি, চুল ব্যাক ব্রাশ করা, পরনে দামি সাফারি স্যুট।

এখনও বিয়ে টিয়ে হয়নি সুদীপের। এ নিয়ে বাড়ি থেকে নিয়মিত চাপও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনস্থির করে উঠতে পারেনি সে। আরও দু-তিনটে বছর ভারহীন ফুরফুরে জীবন কাটাতে চায় সুদীপ। তারপর ওই ব্যাপারে ভাবা যেতে পারে। আসলে ভেতর থেকে কোনও রকম তাড়াই অনুভব করে না সে।

সচ্চরিত্র যুবক হিসাবে বীরপুরে সুদীপের বেশ সুনাম। তার বিরুদ্ধে এই নতুন শহরে কোনও দিন তেমন কিছু শোনা যায়নি।

জানালার বাইরে দূরমনস্কের মতো তাকিয়ে আছে সুদীপ। শিয়ালদা থেকে তিন-চার কিলোমিটার যেতে না যেতেই দু'ধারে অবারিত সবুজ ধানখেত, কানায় কানায় ভরা খাল, খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, সাঁকোর মাথায় মুনি ঋষিদের স্টাইলে বসে থাকা মাছরাঙা কি বক। মাথার ওপর দিয়ে বাতাস চিরে চিরে বুনো পাখির ঝাঁক

উড়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে পেন্সিলের আঁচড়ের মতো এক-আধটা আবছা গ্রাম কিংবা উদ্বাস্তু কলোনি।

একেকটা স্টেশন আসে, আধ মিনিটও থামে না ট্রেনটা। শশব্যস্তে দু-চারজন প্যাসেঞ্জার নামিয়ে, কয়েকজনকে তুলে আবার দৌড় লাগায়।

আকাশের গায়ে বোহেমিয়ান কিছু মেঘ, আদিগন্ত ধানের খেত বা পাখি টাখি, একটানা এই দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে একসময় কামরার ভেতর মুখ ফেরায় সুদীপ। আর তখনই দেখতে পায় তিন চারটে 'রো' পর কোণাকুণি একটি জানালার পাশে বসে আছে প্রীতি। লক্ষ করে, প্রীতিও পলকহীন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। হয়তো অনেকক্ষণ সে ওভাবে তাকে দেখে যাচ্ছে, সুদীপ টের পায়নি।

প্রীতির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মতো। গায়ের রং কালো না ফর্সাও না, দুইয়ের মাঝামাঝি। মুখ ডিম্বাকৃতি, ছোট্ট কপালের ওপর ঘন চুলের ঘের। চুল অবশ্য লম্বা নয়, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। বড় বড় টানা চোখ প্রতিমার কথা মনে করিয়ে দেয়, গলাটি যেন নিখুঁত ফুলদানি। নিটোল হাত দুটি কাঁধ থেকে সটান নেমে এসেছে, আঙুল লম্বাটে, পাতলা ঠোঁট, ম্যানিকিওর করা নখ।

প্রীতির পরনে এই মুহূর্তে রঙিন সিনথেটিক শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউজ, পায়ে হালকা ফ্যাশনেবল স্লিপার। গলায় সরু চেইন। বুকের কাছে যে লকেটটা ঝুলছে সেটা মীনে-করা ছোট্ট একটা নৌকো।

কতদিন পর প্রীতিকে এত কাছ থেকে দেখল সুদীপ? পাঁচ ছ'বছর তো নিশ্চয়ই। তখন তার মুখ ছিল আরো ভরাট, মসৃণ ত্বক থেকে দ্যুতি বেরিয়ে আসত যেন, চুল খুলে দিলে কোমর ছাপিয়ে যেত।

একটু ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায় প্রীতির সমস্ত চেহারায় কালচে সরের মতো একটা ছোপ পড়েছে, চোখে মুখে পৃথিবীর যাবতীয় ক্লান্তি। মুখের সেই ভরাট ভাবটা আগের মতো নেই, সেখানে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে, কণ্ঠার হাড় খানিকটা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। দৃষ্টিতে আর নিষ্পাপ সারল্য নেই, সেখানে এক কর্কশ রুক্ষতা। হয়তো বা আক্রোশও।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল সুদীপের। চোখ দুটো সরিয়ে আবার যে জানালার বাইরে তাকাবে, তা-ও পারছিল না। যাদুকরীর মতো রহস্যময় কোনও শক্তিতে প্রীতি তার চোখ দু'টিকে নিজের চোখের ভেতর আটকে রেখেছে।

রোজ এই লাইনে সকালে কলকাতায় গিয়ে সন্ধেয় ফিরে আসে সুদীপ। আগেই তার কানে এসেছে, প্রীতিও নাকি নিয়মিত কলকাতায় যায়। কিন্তু অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। হয়তো তার যাতায়াতের সময় আলাদা।

আজ এতকাল বাদে দুপুরের এই ফাঁকা ট্রেনে প্রীতির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে

যাওয়াটা যেন অদৃশ্য নিয়তিরই নির্দেশ। স্বয়ংক্রিয় কোনও নিয়মে কখন যে সুদীপ তার মুখোমুখি এসে বসে, নিজেই জানে না।

কত দিন পর এত কাছে এসে বসল সুদীপ? পাঁচ ছ'বছর তো হবেই। প্রীতির শরীরের অল্পস্বল্প ভাঙচুর শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও থেকে গেছে অভ্রান্ত তীব্র আকর্ষণ, অবিকল যেমনটি ছিল পাঁচ ছ'বছর আগে। সুদীপের হৃৎপিণ্ডে হাজারটা ঘোড়া ঝড় তুলে ছুটতে থাকে। তার নিশ্বাস গাঢ় হয়ে আসে।

হঠাৎ সুদীপ বলে, 'অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল।'

প্রীতি স্থির চোখে তাকিয়েই আছে। তার চাউনি বুঝিয়ে দেয় পৃথিবীর কাউকেই সে বিশ্বাস করে না। আস্তে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'হ্যাঁ।'

'অথচ একসময় রোজ আমাদের দেখা হত। তারপর— 'বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় সুদীপ।'

প্রীতি উত্তর দেয় না।

সুদীপের কথাটা ঠিক। বছর ছয়েক আগে পর্যন্ত বীরপুরে তাদের পাড়াতেই বাড়ি ভাড়া করে থাকত প্রীতিরা। সুদীপদের বাড়ির পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর ওদের ছোট্ট একতলা। বাড়িওলার বদলির চাকরি। আজ দিল্লি, কাল হায়দ্রাবাদ, পরশু বরোদা, এই করে অনবরত ছুটতে হত তাকে। প্রীতিরাই গোটা বাড়িটা নিয়ে থাকত।

চমকে দেবার মতো কোনও ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই প্রীতিদের। সাদামাটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি যেমন হয় অবিকল তা-ই। প্রীতির তিন চার ভাইবোন। প্রীতি সবার বড়। এ ছাড়া মা, বাবা। বাবা একটা প্রাইভেট ফার্মে মাঝারি ধরনের কাজ করতেন। অঢেল টাকা পয়সা, পর্যাপ্ত আরাম না থাকলেও অভাব ছিল না।

প্রীতিরা ছিল সুদীপদের সব চেয়ে কাছের প্রতিবেশি। দু বাড়ির লোকজনদের মধ্যে মেলামেশা, যাতায়াত ছিল যথেষ্ট। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও ওরা প্রায় আত্মীয়র মতোই।

সুদীপ যখন সায়েন্স কলেজে এম. এসসি পড়ছে তখন প্রীতি বীরপুর কলেজে বি. এ ফার্স্ট ইয়ারে। যৌবনের সেই গোড়ার দিকে সুদীপ আর প্রীতির মনে হয়েছিল পরস্পরকে ছাড়া বেঁচে থাকার মানে নেই।

হয়তো তারা যা চেয়েছিল একদিন তা-ই পেয়ে যেত। দুই বাড়ির অভিভাবকদেরও সেইরকম ইচ্ছাই যে ছিল, মোটামুটি তা তারা জানতো। কোথাও কোনও বাধা ছিল না। শুধু সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়ে সুদীপের একটা চাকরি টাকরি পাওয়া আর প্রীতির বি. এ'টা পাশ করা, তারপরেই হয়তো দু বাড়ির মা-বাবারা আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন।

কিন্তু ভবিষ্যতের যে ছকটি তারা কেটে রেখেছিল, সেটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। তাদের ঠুনকো স্বপ্ন একদিন তছনছ হয়ে যায়। সুদীপ সবে সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়েছে আর প্রীতির সেকেণ্ড ইয়ার চলছে, হঠাৎ অফিসে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হল প্রীতির বাবার। হাসপাতাল বা নার্সিং হোম পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যাবার সুযোগ পাওয়া যায় নি।

বাবার মৃত্যুর পর প্রীতিদের সংসার একেবারে অথৈ জলে গিয়ে পড়ে। সুদীপের মা-বাবা যতটা পেরেছেন, করেছেন। প্রীতির বাবার অফিস থেকে তাঁর পুরনো লোনটোন কেটে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং গ্র্যাচুয়িটির টাকা যা পাওয়া গিয়েছিল তাতে কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিন কাটতে থাকে।

কিন্তু এভাবে তো চিরদিন চলে না। প্রীতি কলেজ ছেড়ে দিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আর কলকাতার অফিস পাড়ায় ঘুরতে লাগল কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনদের ভেতর কেউ মিনিস্টার বা এম. পি নেই যে চাইলেই চাকরি জুটে যাবে।

সুদীপ তাকে অনেক বার বুঝিয়েছে, বি. এ'টা অন্তত পাশ করা অত্যন্ত জরুরি। একটা ডিগ্রি টিগ্রি না থাকলে চাকরি বাকরি অসম্ভব। প্রীতি সেটা ভাল করেই জানতো কিন্তু সংসাার যখন ডুবে যাচ্ছে, পড়াশোনা চালানোর মতো শৌখিনতা তার মানায় না।

অবশ্য সুদীপ এবং তার বাবাও প্রীতির একটা কাজের জন্য একে ওকে ধরেছেন। কিন্তু তাঁরাও সাধারণ মধ্যবিত্ত। তাঁদের সামর্থ্য আর কতটুকু! ক্ষমতাবান আত্মীয়-স্বজন বা জানাশোনাও তাঁদের তেমন কেউ নেই যাকে ধরলে কাজ হয়।

এদিকে হাতের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রীতিদের। কয়েক মাস বাড়িভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওলা উঠে যাবার জন্য নোটিশ দিয়েছে

নিজেদের সংসার চালিয়ে পাঁচ ছ'জনের আরেকটি পরিবার টানা অসম্ভব, বিশেষ করে সুদীপদের পক্ষে। তাদের বাড়িতেও বাবা ছাড়া তখন আর কারও চাকরি টাকরি হয়নি।

যতদিন প্রীতির বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড টাণ্ডের টাকা ছিল, তার সঙ্গে সুদীপদের সাহায্য মিলিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে ওরা চালিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু হাতের টাকাটা ফুরিয়ে যাবার পর সংসার প্রায় অচল হয়ে যায় প্রীতিদের।

এদিকে যথেষ্ট সহানুভূতি সত্ত্বেও ক্রমশ সুদীপের মা বাবা বিরক্ত হতে শুরু করেছিলেন। নিজেদের সংসার বাঁচিয়ে তবে তো অন্যের সম্বন্ধে উদারতা দেখানো যায়। পরের দিকে প্রীতিদের বাড়ির কেউ এলে মুখ গম্ভীর হয় যেত মা-বাবার।

এই সময় দু-বছরের একটা ট্রেনিং নিতে হায়দ্রাবাদ চলে যায় সুদীপ। যাবার আগে প্রীতিকে বলেছিল, কোনওরকমে কষ্ট টষ্ট করে দুটো বছর যেন কাটিয়ে দেয় সে। ট্রেনিংয়ের পর ফিরে এলে ভাল কিছু একটা সে পাবেই। তখন আর দুশ্চিন্তার

কিছু থাকবে না।

হায়দ্রাবাদে গিয়ে ট্রেনিং পিরিয়ডে সুদীপ যে অ্যালাওয়েন্স পেত তাতে টায়টোয় তার খরচটাই চলে যেত। তা থেকে বাঁচিয়ে যে কিছু পাঠাবে তার উপায় ছিল না।

হায়দ্রাবাদে যাবার পর প্রীতিকে সপ্তাহে একখানা চিঠি লিখত সুদীপ। প্রথম একটা মাস নিয়মিত উত্তর পেয়েছে সে। তারপর থেকে প্রীতির চিঠি বন্ধ হয়ে যায়।

সুদীপ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। মাকে চিঠি লিখে প্রীতিদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল সে। মা উত্তর দিতেন ঠিকই কিন্তু প্রীতিদের ব্যাপারে একটি লাইনও লিখতেন না।

অনেক বার লেখার পর মা জানিয়েছিলেন, প্রীতিরা তাঁদের পাড়া থেকে উঠে গেছে, তাদের নতুন ঠিকানা তাঁর জানা নেই। আরও যে কথাটা লিখেছিলেন সেটা খুবই মারাত্মক। এরপর থেকে প্রীতিদের সম্পর্কে সুদীপ যেন মাথা না ঘামায়। প্রীতি এমন কিছু কাণ্ড করেছে যা মা হয়ে তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব না।

সুদীপ একবার ভেবেছিল, হায়দ্রাবাদ থেকে সেই মুহূর্তে বীরপুর ফিরে আসে। কিন্তু মিডল ক্লাস মানসিকতা তাকে ফিরতে দেয়নি। হায়দ্রাবাদের এই ট্রেনিংটা তাকে অনেক কিছুই দেবে। ভাল চাকরি, ভবিষ্যতের নিবাপত্তা, এমন কি বিদেশে যাবার সুযোগ। এটা হাতছাড়া করা যায় না। একটি মেয়ের চেয়ে এই ট্রেনিং অনেক বেশি মূল্যবান। তবে প্রীতির জন্য চাপা একটা কষ্ট তার বুকের ভেতর থেকেই যায়।

দু'বছর পর হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে প্রীতিদের সম্পর্কে সব খবরই পেয়ে যায় সুদীপ। একসঙ্গে পুরোটা কেউ তাকে বলেনি, টুকরো টুকরো ভাবে এর তার কাছ থেকে সে যা শুনেছে জোড়া লাগালে এরকম দাঁড়ায়।

চাকরি বাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সেই পুরনো রাস্তায় নেমে গেছে প্রীতি। সংসার বাঁচবার জন্য সে রোজ কলকাতায় গিয়ে হোটেলে হোটেলে রাত কাটিয়ে আসে। নিজের শরীরের দামে ভাই-বোন এবং মাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে।

এতে নতুনত্ব কিছু নেই। সেই পুরনো গল্প, পুরনো সমস্যা।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা গোপনই ছিল। জানাজানি হবার পর পাড়ার লোকেরা জোর করে প্রীতিদের তুলে দেয়। এমন একটি মেয়ে থাকলে আবহাওয়া দূষিত হয়ে যাবে।

তাড়িয়ে দেবার পর বীরপুরের উত্তর দিকের শেষ মাথায় প্রীতিরা একটা বাড়িতে উঠে যায়।

সব জানার পর বিষাদে মন ভরে গেছে সুদীপের। ভেবেছে, তখনই প্রীতির কাছে ছুটে যায় কিন্তু বাধাটা এসেছে নিজের ভেতর থেকেই। তার চরিত্রে বিস্ফোরণ ঘটাবার শক্তি বা সাহস কোনওটাই নেই। নেহাতই সব দিক বাঁচিয়ে, নিজের সুনাম

এবং ভবিষ্যৎ রক্ষা করে যদি কিছু করা যায়, এমনই মাঝারি মাপের অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবক সে। প্রীতি নরকের যে লেভেলে নেমে গেছে সেখান থেকে তাকে তুলে আনার শক্তি বা দুর্জয় সাহস সুদীপের নেই। প্রীতির কাছে তার আর যাওয়া হয়নি। নিজের সুরক্ষিত দুর্গে দাঁড়িয়ে প্রীতির জন্য তার কষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই কষ্টের তীব্রতা ক্রমশ ফিকে হয়ে গেছে।

হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরার পর বেশিদিন বসে থাকতে হয়নি, তিন মাসের মধ্যেই মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে একজিকিউটিভের পোস্ট পেয়ে যায় সুদীপ।

তারপর এতদিন বাদে ফাঁকা ট্রেনের কামরায় প্রীতির সঙ্গে দেখা হল।

সুদীপ এবার জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছ প্রীতি?'

প্রীতির মুখ আগের মতোই নিরাসক্ত। আবেগশূন্য গলায় সে বলে, 'বেঁচে আছি।' একটু চুপ করে থাকে সে। তারপর আবার শুরু করে, 'আপনি তো বেশ ভালই আছেন, মনে হচ্ছে।'

'আপনি' শব্দটা সুদীপের কানে সামান্য ধাক্কা দিয়ে যায়। সে বলে, 'ভাল আর কি। একটা চাকরি পেয়েছি, সেটাই করে যাচ্ছি। কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি কিন্তু একসময় 'তুমি' করেই বলতে।'

'হয়তো বলতাম। ঠিক মনে পড়ে না। আর পড়লেই বা কী?' বলে অদ্ভুত হাসে প্রীতি।

সে কী ইঙ্গিত দিয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুদীপ ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করে। একবার ভাবে, নিজের সিটে ফিরে যায় কিন্তু প্রীতির শরীরে এখনও এমন প্রবল আকর্ষণ রয়েছে যা দুর্দান্ত কোনও শক্তিতে তাকে মুখোমুখি বসিয়ে রাখে।

সুদীপ সামনের দিকে অল্প ঝুঁকে বলে, 'হায়দ্রাবাদ থেকে তোমাকে রেগুলার চিঠি লিখেছি। প্রথম দিকে তোমার উত্তর পেলেও—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রীতি বলে ওঠে, 'ওসব কথা থাক। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনাদের পাড়া থেকে আমাদের গায়ের জোরে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কারণটাও আপনার অজানা নেই। এরপর আপনাকে চিঠি লেখার কোনও মানে হয়?'

সুদীপ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'তবু—'

প্রীতি উত্তর দেয় না, তার কপাল সামান্য কুঁচকে যায় শুধু।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর প্রীতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'হায়দ্রাবাদ থেকে কবে ফিরেছেন?'

'বছর চারেক হবে—' বলেই থমকে যায় সুদীপ। কেননা এর পর নিশ্চয়ই একটি

মারাত্মক প্রশ্ন করে বসবে প্রীতি। বীরপুর তো খুব বড় শহর নয় আর প্রীতির এতই দুর্নাম যে তার বাড়িটা সবাই চেনে। খোঁজখবর নিয়ে একবারও কি সেখানে যেতে পারত না সুদীপ? অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠায় শ্বাস আটকে যায় তার।

প্রীতি শুধু বলে, 'ও', কিন্তু সেই ভয়ানক প্রশ্নটা আর করে না।

একটু অপেক্ষা করে সুদীপ। ফুসফুসের আবদ্ধ বাতাস আস্তে আস্তে বার করে দিয়ে কী ভেবে সে একেবারে আলাদা প্রসঙ্গে চলে যায়, 'এই দুপুরবেলা কোত্থেকে ফিরছ?'

প্রশ্নটা অপ্রয়োজনীয়। সুদীপ ভাল করেই জানে প্রীতি কোত্থেকে ফিরছে। কিন্তু অন্য পক্ষের যেখানে আদৌ কৌতূহল নেই, শুধুই গভীর অনাসক্তি, সেখানে কথা চালিয়ে যেতে হলে কিছু না কিছু বলতেই হয়।

প্রীতি বলে, 'আর কোত্থেকে? কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফিরছি।'

জেনেশুনেও সুদীপ এবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি রেগুলার কলকাতায় যাও?'

'না গিয়ে উপায় কী? বেচাকেনার অত বড় বাজার আর কোথায় পাব?'

প্রীতি সঠিকভাবে কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে সুদীপ বলে, 'বাজার মানে?'

এদিকে ইলেকট্রিক ট্রেন ঝড় তুলে মাঠ-ঘাট ধানখেত পেরিয়ে যেতে থাকে।

প্রীতি বলে, 'বাজার মানে বাজার।' বলতে বলতে ঝপ করে গলা নামিয়ে দেয়, 'নিজেকে রোজ আমি ওখানে বেচতে যাই।'

হঠাৎ সমস্ত চরাচরের ওপর আশ্চর্য স্তব্ধতা নেমে আসে। ট্রেনের শব্দ, বাইরে উল্টাপাল্টা হাওয়ার আওয়াজ বা হকারদের হাঁকাহাঁকি, কিছুই যেন শুনতে পায় না সুদীপ। এত স্পষ্ট করে কঠিন সত্যটা প্রীতি যে বলতে পারে, তা ছিল অভাবনীয়। অনেক পালটে গেছে সে।

কিছুক্ষণ বাদে ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামলে চমকে ওঠে সুদীপ। প্ল্যাটফর্মে পাথরের ফলকে বাংলা হিন্দি এবং ইংরেজিতে নাম লেখা রয়েছে উদয়পুর।

উদয়পুরের পরই বীরপুর। মাঝখানে চার কিলোমিটারের দূরত্ব। এই রাস্তাটুকু পেরুতে ইলেকট্রিক ট্রেনের পাঁচ মিনিটও লাগবে না। সুদীপ ভাবে এখনই তার উঠে পড়া উচিত। কেননা বীরপুরে পৌঁছলে স্টেশনে চেনাজানা কেউ যদি প্রীতির সঙ্গে তাকে নামতে দেখে, তার পরিণতি সুখকর হবে না। অথচ এবারও নিজের সিটে ফিরে যেতে পারছিল না সে।

ট্রেন ছেড়ে দেয়।

বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্থানপতন অনুভব করতে করতে সুদীপ বলে, 'তোমার সঙ্গে আর কি দেখা হবে না?'

প্রীতি উত্তর দেয় না, অদ্ভুত চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে।

সুদীপ টের পায় তাব স্নায়ুমণ্ডলী এই মুহূর্তে প্রচণ্ড উত্তেজনায় টান টান হয়ে যাচ্ছে। বলে, 'কাল বিকেলে সাড়ে পাঁচটার সময় মেট্রোর নিচে আমি ওয়েট করব। তুমি কি আসবে? মানে বুঝতেই পারছ, বীরপুরে দেখা করাটা—'

ঘাড় ঈষৎ কাত করে প্রীতি, তার চোখে আগুনের ফুলকির মতো কিছু একটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। অত্যন্ত শান্ত গলায় সে বলে, 'আমার সময়ের কত দাম আপনার ধারণা আছে?'

কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল সুদীপ কিন্তু ট্রেনের স্পিড আচমকা কমে যাওয়ায় চমকে জানালার বাইরে তাকায়। আর তখনই খানিকটা দূরে বীরপুর স্টেশনের লাল বাড়িটা তার চোখে পড়ে। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর ট্রেন ওখানে পৌঁছে যাবে। শশব্যস্তে ধড়মড় কবে উঠে দরজার দিকে পা বাড়ায় সুদীপ।

প্রীতি তাকিয়েই ছিল। সুদীপের মনোভাব বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি। চাপা কর্কশ গলায় ডাকে, 'শুনুন।'

থমকে দাঁড়িয়ে যায় সুদীপ।

প্রীতি বলে, 'আমি খুব খারাপ কিন্তু আপনি আমার চেয়েও অনেক খারাপ।' বলে আঙুল বাড়িয়ে দরজা দেখিয়ে দেয়, 'যান।'

উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সুদীপ। ট্রেন স্টেশনে থামতে না থামতেই লাফিয়ে নেমে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে। পেছন ফিরে তাকাতে তার আর সাহস হয় না।



প্রদর্শনী

সন্ধেবেলা বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরুতে পেরুতে ওধারের বাস স্ট্যাণ্ডে মেয়েটাকে দেখতে পেল অনিমেষ। মাসখানেক ধরে কি তারও বেশি, প্রায় রোজই ঠিক এই সময়ে মেয়েটাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে সে। অনিমেষ যখন কলকাতা থেকে ফেরে, খুব সম্ভব মেয়েটা তখন কলকাতায় যায়।

রাত্তিরে কলকাতার অর্ধেক ফাঁকা করে কয়েক লাখ মানুষ যখন বেরিয়ে যায় তখন মেয়েটা ওই বিশাল মেট্রোপলিসে গিয়ে কী করে? সেখানে তার কী কাজ? অনিমেষ এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। মনে মনে একটা পছন্দসই উত্তরও খাড়া করেছে। তার ধারণা মেয়েটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কাজ করে, কিংবা কোনও হাসপাতালে। দুটোই এমার্জেন্সি সারভিস। রাতে সেখানে ডিউটি দিতে হয়।

এ ধারে আসতেই চোখাচোখি হয়ে গেল, রোজই হয়। হলেই একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নেয় মেয়েটা। আজ কিন্তু নামালো না, তাকিয়েই রইল।

তার বয়স তেইশ-চব্বিশ। গায়ের রঙ ফর্সাও না কালোও না, দুইয়ের মাঝামাঝি। লম্বাটে মুখ, পাতলা নাক, ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় টানা চোখ। সরু মসৃণ গলা। কোমর-ছাপানো অজস্র চুল একবেণী কবে পিঠের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে।

এই এক মাস ধরে একই পোশাকে তাকে দেখে আসছে অনিমেষ। বাটিকের কাজ-করা একটা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে ব্লাউজ। গলায় সস্তা দার্জিলিং স্টোনের একটা হার, কানে ওই পাথরেরই ইয়ার রিং। বাঁ হাতে ছোট্ট চৌকো ঘড়ি। তবে দুই ভুরুর মধ্যবর্তী কপালে কোনওদিন সবুজ টিপ থাকে, কোনওদিন লাল। আজকের রংটা গোলাপি। হাত-পা, মুখ, আলাদা আলাদাভাবে দেখতে গেলে মনে হবে, তেমন কিছু না, খুবই সাধারণ। কিন্তু সব মিলিয়ে মেয়েটার চেহারায় এমন একটা ম্যাজিক আছে যে চোখ ফেরানো যায় না।

মেয়েটা আজ ওভাবে তাকিয়ে থাকায় খুবই অস্বস্তি হচ্ছে অনিমেষের। সেই সঙ্গে এক ধরনের আকর্ষণও বোধ করছে। কী করবে যখন সে ভাবছে সেই সময় মেয়েটাই এগিয়ে এল। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

মেয়েটার মধ্যে কোথাও আড়ষ্টতা নেই। খুবই স্মার্ট আর স্বচ্ছন্দ সে। তবু হুট করে সে যে কাছে চলে আসবে, এটা ভাবা যায় নি। অনিমেষ ব্যস্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ-

হ্যাঁ, করুন না—'

'এক মাস ধরে আপনাকে দেখছি। আমি যখন কলকাতায় যাই আপনি তখন ফেরেন।'

মেয়েটা তা হলে তাকেও লক্ষ করেছে। আধফোটা গলায় অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ।'

মেয়েটা আবার বলল, 'আমার মনে হয়, আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

অনিমেষ হকচকিয়ে যায়। বিব্রতভাবে বলে, 'হ্যাঁ। মানে—'

'আমার সম্বন্ধে আপনার খুব কৌতূহল, তাই না অনিমেষবাবু?' মেয়েটা তখনও চোখ সরায় নি। পলকহীন অনিমেষের দিকে তাকিয়েই আছে।

অনিমেষ চমকে উঠল, 'আপনি আমাকে চেনেন!'

'আপনাকে আমাদের শহরে কে না চেনে! এম. এ'তে কত ভাল রেজাল্ট করেছিলেন। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়েছিল। সবার মুখে মুখে আপনার নাম।' বলে একটু থামে মেয়েটি। পরক্ষণেই আবার শুরু করে, 'আপনার মতো ভাল ছেলে এ শহরে আর কেউ নেই।'

প্রায় অচেনা এক তরুণীব মুখে নিজের প্রশংসাটুকু শুনতে ভালই লাগল অনিমেষের। সেই সঙ্গে একটু সঙ্কোচও। লাজুক হেসে সে বলল, 'কী যে বলেন!'

এ জায়গাটা কলকাতা থেকে মাইল পনের দূরে। ইদানীং গ্রেটার ক্যালকাটা ডেভলাপমেণ্ট স্কিমের ভেতর পড়ে গেছে। নইলে এটা কলকাতারই প্রায় সমবয়সী ছোট শহর। এইটিনথ সেঞ্চুরিতে ইংরেজরা এখানে কিছু ঘরবাড়িটাড়ি বানিয়েছিল। সেগুলো ঘিরে ক্রমশ টাউনশিপ গড়ে উঠেছে।

অনিমেষরা এখানকার পুরনো বাসিন্দা। পুরনো এবং বনেদি। পাঁচ-ছ জেনারেশান ধরে তারা এখানে আছে। ব্রিটিশ রাজত্বে এজেন্সির বিজনেসে তার ঠাকুর্দার বাবা এবং ঠাকুর্দা প্রচুর পয়সা করেছিলেন। এখন অবশ্য অত রমরমা নেই। বাবার আমলে বংশানুক্রমিক ব্যবসা উঠে গেছে। অবস্থা এখন পড়তির দিকে। তবু ব্যাংকে এবং কোম্পানির শেয়ারে যা আছে তাতে নিচের দুই পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে খেয়ে যেতে পারবে। তা ছাড়া রয়েছে বিঘেখানেক জায়গা জুড়ে গথিক স্ট্রাকচারের মোটা মোটা থামওলা প্রকাণ্ড বাড়ি।

এই রকম পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ড নিয়ে কিছু না করলেও পারত অনিমেষ। বখে গেলেও কারও কিছু বলার ছিল না। কিন্তু অনিমেষ অন্য রকম মেটিরিয়ালে তৈরি। তার [illegible] এখন হ্যাবিটস। এখন পর্যন্ত কোনও নেশা নেই তার। সিগারেট পর্যন্ত খায় না। স্কুল ফাইনাল থেকে এম. এ পর্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছে। তারপর কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ব্যাংকে ভাল চাকরি পেয়েছে। আপাতত জুনিয়র

অফিসারের গ্রেড। তবে প্রোমোশন পেতে দেরি হবে না।

রোজ আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলকাতায় যায় অনিমেষ, ফেরে সন্ধেবেলা।

মেয়েটা বলল, 'এবার আমার নামটা বলি, তাতে কথা বলতে সুবিধে হবে। আমি সুচরিতা।' একটু থেমে কী ভেবে অন্যমনস্কর মতো বলল, 'নামের যোগ্য অবশ্য আমি নই।' বলে গলার ভেতর তীক্ষ্ণ শব্দ করে একটু হাসল।

অনিমেষের মনে হল ঠাট্টা। সে বলল, 'আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক খবর জানেন। আমি কিন্তু আপনার কিছুই জানি না।'

সুচরিতা ফের অনিমেষের দিকে তাকাল। আস্তে করে বলল, 'জানতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' মৃদু হেসে মাথা নাড়ল অনিমেষ।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুচরিতা। তারপর বলল, 'এক কাজ করুন।'

'কী?'

'আমাদের বাড়ি চলুন। ভাল করে আলাপও হবে। আমার সম্বন্ধে আপনার অনেক কিছু জানাও হয়ে যাবে।' সুচরিতার তাকানোর ভঙ্গি অন্য রকম হয়ে উঠতে লাগল। কেমন যেন ধরাল আর দূরভেদী।

অনিমেষ তার চাউনির এই পরিবর্তন ভাল করে লক্ষ করল না। বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি তো কলকাতায় যাবার জন্যে বেরিয়েছিলেন।'

অনিমেষকে থামিয়ে দিয়ে সুচরিতা বলল, 'একদিন কলকাতায় না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কলকাতা যেমন চলছে তেমনই চলবে। আসুন—'

সুচরিতার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারল না অনিমেষ। বলল, 'আপনাদের বাড়ি কোথায়?'

'নিউ কলোনিতে।'

এ শহরের পেছন দিক দিয়ে গঙ্গা চলে গেছে। নিউ কলোনি তারই পাড়ে। এই বাস স্ট্যাণ্ডটা থেকে কম করে দু-আড়াই মাইল দূরে।

অনিমেষ একটু ভেবে বলল, 'আপনাদের বাড়ি গেলে কেউ কিছু মনে করবেন না তো? মানে আমাকে কেউ চেনেন না। আমার সঙ্গে—'

'কেউ কিছু মনে করবে না। গেলেই বুঝতে পারবেন।' গলার স্বরে অদ্ভুত একটা টান দিয়ে কথাগুলো বলল সুচরিতা। তারপর শব্দ করে হাসল।

অদম্য কৌতূহলে দ্বিধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত অনিমেষ ঠিক করে ফেলল, সুচরিতার সঙ্গে যাবে। বলল, 'নিউ কলোনি অনেকটা দূরে। কীভাবে যাবেন?'

'কেন, সাইকেল রিকশায়।'

এ কথাটা আগেই মনে হয়েছিল অনিমেষের। কিন্তু প্রায় অচেনা এক তরুণীকে রিকশায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে যাবার প্রস্তাব দিলে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ভাবতে অস্বস্তি হচ্ছিল। সুচরিতা রিকশার কথা বলায় সে আরাম বোধ করল। সারাদিন কাজের পর ভিড়ের বাসে গাদাগাদি করে এসে এখন আর দু-আড়াই মাইল হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। তবে পাশে বসে যেতে হবে, এটা ভাবতে এক ধরনের অস্বাচ্ছন্দ্যও হতে লাগল।

সুচরিতা এবার তাড়াই লাগাল, 'কী হল, আসুন।'

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ক'পা দূরে ঝাঁকড়া-মাথা দুটো রেন-ট্রি। তার তলায় রিকশা স্ট্যাণ্ড। সেখানে গিয়ে দু'জনে একটা রিকশায় উঠল। সুচরিতাই রিকশাওলাকে বলল, 'নিউ কলোনি চল।'

রিকশা মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। রাস্তাটা এ শহরেরর শিরদাঁড়া হয়ে সোজা গঙ্গার ধারে চলে গেছে।

বেশির ভাগ দিনই কলকাতা থেকে ফিরে এখানে আলো দেখতে পাওয়া যায় না। লোডশেডিং-এর অন্ধকারে চারিদিক ডুবে থাকে। আজ অঢেল আলো।

ঝোঁকের মাথায় বা দুর্বোধ্য কোনও আকর্ষণে সুচরিতার সঙ্গে সাইকেল রিকশায় উঠবার পরই অনিমেষের মনে হয়েছে, না গেলেই ভাল হত। এ শহরের অনেকেই তাকে চেনে। বাবা-মা, দাদা-বৌদিরা মাঝে মাঝে কেনাকাটা করতে বা অন্য দরকারে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের কেউ একটি মেয়ের সঙ্গে তাকে এভাবে যেতে দেখলে খুবই অবাক হয়ে যাবেন। এ নিয়ে অনেক কিছু ভাববেনও। সেটাই স্বাভাবিক।

একটি তরুণীর পাশে বসে রিকশা-ভ্রমণ এমন কোনও চমকপ্রদ ঘটনা নয়। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা আখছার এখানে ওখানে ঘুরছে। কিন্তু অনিমেষের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। ভাল ছেলে হিসেবে এ শহরে তার যথেষ্ট সুনাম। কেউ কখনও তাকে মেয়ে নিয়ে ঘুরতে দেখেনি। অনিমেষকে খানিকটা মরালিস্টই বলা যায়।

এ শহর যেন আদ্যিকালের কোনও নগর। এখানকার সব কিছুই প্রাচীন। ফাঁকা জায়গা নেই বললেই হয়। পুরনো বাড়িঘর আর মন্দিরে চারিদিক ঘিঞ্জি হয়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে চমক দেবার মতো এক-আধটা নতুন বাড়ি। দু'ধারে খোলা ড্রেনের পাশে ডাঁই-করা আবর্জনা। এই মেইন রোডটা থেকে সরু সরু অগুনতি গলি দু'পাশে বেরিয়ে গেছে।

অনিমেষদের সাইকেল রিকশাটা যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেটা শহরের সব চাইতে জমজমাট অংশ। এটা বাজারপাড়া। দু'ধারে দোকানপাট, মুখোমুখি দুটো সিনেমা হল। লোডশেডিং না হওয়ায় চারিদিক ঝলমল করছে।

রাস্তায় এখন প্রচুর লোকজন। তবে সব চাইতে বেশি ভিড় সিনেমা হল দুটোর সামনে। থিকথিকে মানুষজনের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে বেল বাজাতে বাজাতে গাদা গাদা সাইকেল রিকশা ছুটছে। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রাইভেট বাস। সেগুলো মানুষে ঠাসা, এমন কি ছাদের ওপরও প্যাসেঞ্জার তোলা হয়েছে।

অনিমেষের ছেলেবেলায় এত মানুষ এ শহরে ছিল না। জায়গাটা ছিল মোটামুটি নিরিবিলি, শান্ত, নিরুত্তেজ কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যে হুড়হুড় করে পপুলেশান বেড়ে গেছে। কলকাতা মেট্রোপলিস উপচে জলোচ্ছ্বাসের মতো মানুষের ঢল নেমে এসেছে শহরতলিগুলোতে। 'পপুলেশান এক্সপ্লোসান' কাকে বলে, এখানে পা দিলেই টের পাওয়া যায়।

সুচরিতার পাশে নিজেকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে বসে আছে অনিমেষ। তবু গায়ে গা ঠেকেই যাচ্ছে।

একান্তভাবে অনিমেষ এই মুহূর্তে লোডশেডিং চাইছে আর ভয়ের চোখে অনবরত রাস্তার দু-পাশে তাকাচ্ছে। ঈশ্বর বা ভগবান-টগবান নিয়ে কখনও সে মাথা ঘামায় না। এখন মনে মনে সে বলতে লাগল, 'হে ঈশ্বর, চেনাশোনা কারও চোখে যেন পড়ে না যাই।' তার চোখমুখ দেখে মনে হয়, প্রকাশ্যে সে যেন ভয়াবহ পাপকর্ম করে ধরা পড়েছে।

অনিমেষ একবার ভাবল, রিকশা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। কিন্তু তা-ও পারল না।

হঠাৎ পাশ থেকে সুচরিতা ডাকল, 'অনিমেষবাবু—'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল অনিমেষ।

সুচরিতা ফের বলল, 'খুব বিপদে পড়ে গেছেন, না?'

অনিমেষ চমকে উঠল। বিমূঢ়ের মতো বলল, 'বিপদ! কিসের?'

'এই যে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, সেটা বিপদ নয়?' বলে দূরভেদী চোখে অনিমেষের দিকে তাকাল সুচরিতা।

অনিমেষ উত্তর দিল না। জামার তলায় অদৃশ্য পোকা হাঁটার মতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

সুচরিতা এবার বলল, 'এভাবে আমার সঙ্গে রিকশায় উঠে পড়া ঠিক হয় নি। তাই না?'

চাপা নিচু গলায় অনিমেষ বলল, 'এ কথা বলছেন কেন?'

উত্তর না দিয়ে সুচরিতা প্রশ্ন করল, 'কেউ আপনাকে আমার সঙ্গে দেখে ফেলে, সেই ভয়টা কিছুতেই কাটাতে পারছেন না, কেমন?'

মেয়েটা কি থট-রিডার? মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যের মনের কথা পড়তে পারে?

ঢোক গিলে অনিমেষ বলল, 'না-না ভয় আবার কী?' বলল বটে, গলার স্বর খুব নিস্তেজ শোনাল।

'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'রিকশাওলাকে থামতে বলি। আপনি এখানে নেমে যান। ভাল ছেলের সুনামটা অন্তত বজায় থাক।'

নিজের মধ্যে কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগল। হয়তো পৌরুষে বা দুর্জ্ঞেয় কোনও অহঙ্কারে। সে বলল, 'রিকশা থামাতে হবে না।'

মজার গলায় সুচরিতা বলল, 'নাঃ, আপনাকে আর ভীরু বলা যাবে না।' বলে রিনরিনে শব্দ করে একটু হাসল।

এক সময় বাজারপাড়ার জমকালো অংশটা পেরিয়ে সাইকেল রিকশা অনেকটা এগিয়ে যায়। তবু ভয় কাটে না অনিমেষের। তার চেনাশোনা মানুষ এ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আজ লোডশেডিং-এর কোনও সম্ভাবনাই নেই। তার রক্তচাপ ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়ে এ শহরে আলো জ্বলতেই থাকে।

হঠাৎ অনিমেষের মনে হয়, সুচরিতার সঙ্গে আলাপ করতে এসে এভাবে চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় না। সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা এখানে নতুন এসেছেন, না?'

সুচরিতা বলে, 'ঠিক নতুন না, তিন চার বছর আছি।'

গঙ্গার ধারের নিউ কলোনিটা হয়েছে বছর পাঁচেক আগে। ওখানকার লোকজনের বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। তার মানে কলোনি বসবার প্রায় শুরু থেকেই সুচরিতারা আছে। অনিমেষ বলল, 'এই মাসখানেক ধরে আপনাকে দেখছি। তার আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে দেখেছি।'

'তাই বুঝি?'

'আপনাদের বাড়িটাও বাইরে থেকে দেখেছি। শুনেছি আপনারা এখানে একশো বছরেরও বেশি আছেন। খুব অ্যারিস্টোক্রাট ফ্যামিলি।'

অনিমেষ বলল, 'অ্যারিস্টোক্রাট আবার কী। তবে অনেক দিন এখানে আছি এটা ঠিক।'

একটু চুপ।

তারপর সুচরিতা বলল, 'আপনাদের মতো এমন ব্রিলিয়ান্ট ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড আমাদের নেই।'

অনিমেষ বিব্রত হল। বলল, 'আমার পূর্বপুরুষেরা চান্স পেয়ে কিছু টাকা পয়সা বাড়ি-টাড়ি করে গেছেন। কিন্তু আমি এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। এর

ভেতর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আসছে কেন?'

'একটু ধৈর্য ধরুন। আমাদের বাড়ি গিয়ে আপনাকে একটা একজিবিশন দেখাব। তখন আপনার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যাবেন।'

একসময় সাইকেল রিকশাটা নিউ কলোনিতে পৌঁছে গেল। এখানে বেশির ভাগই টিন বা টালির ঘর। মাঝে মধ্যে দু-একটা একতলা বাড়ি। দেখেই টের পাওয়া যায় মিডল ক্লাসের একেবারে নিচের স্তরে যারা রয়েছে এটা তাদেরই উপনিবেশ।

রিকশা থেকে নেমে ভাড়াটা অনিমেষই মিটিয়ে দিল। তারপর তাকে সঙ্গে করে কলোনির শেষ মাথায় একটা টালির চালের বাড়িতে নিয়ে এল সুচরিতা।

মোট খানতিনেক ঘর। দুটো ঘরে তিন ইঞ্চি ইটের দেয়াল। বাকি ঘরটায় বাঁশের বেড়া। সবগুলো ঘরের মেঝে অবশ্য পাকা। উঠোনের একধারে উঁচু বাঁধানো জায়গায় তুলসীমঞ্চ। এধারে ওধারে দু-চারটে গাঁদা এবং সন্ধ্যামালতীর গাছ চোখে পড়ে।

সুচরিতা একটা ঘরে অনিমেষকে বসিয়ে বলল, 'প্লিজ একটু একলা থাকুন। আমি আসছি।' বলেই বেরিয়ে গেল।

আর্থিক দিক থেকে সুচরিতারা কোন লেভেলে পড়ে আছে ঘরটার দিকে এক পলক তাকালেই টের পাওয়া যায়।

অল্প পাওয়ারের একটা বাল্‌ব জ্বলছে টিম টিম করে। তাতেই দেখা গেল, ডান দিকে তিন পা-ওলা একটা তক্তাপোষ। বাকি পায়ার জায়গায় ইট বসানো। সেটার ওপর ময়লা বিছানা পাতা। চিটচিটে বালিশের ওয়াড় ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। তক্তাপোষটার তলায় পুরনো টিনের বাক্স, হাঁড়িকুড়ি, ভাঙাচোরা হারমোনিয়ামের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি। এক কোণে দড়িতে ক'টা ময়লা শাড়িটাড়ি ঝুলছে।

অনিমেষ যে ঘুণে-ধরা চেয়ারটায় বসেছে সেটার হাতল ভাঙা। সামনের ছোট টেবলটায় খবরের কাগজের কভার। তার ওপর অসংখ্য চায়ের দাগ। ক'টা মলাট ছেঁড়া সিনেমা ম্যাগাজিন এলোমেলো পড়ে আছে। মাথার ওপর এধারে ওধারে ঝুল জমেছে।

ডান দিকের দেয়ালে বিড়ি কোম্পানির বাংলা ক্যালেণ্ডারে একটা সেক্সি চেহারার মাংসল মেয়েমানুষ কুৎসিত 'পোজ' নিয়ে বসে আছে। সেদিকে থেকে চোখ ফেরাতেই বাঁ দিকের দেয়ালে দৃষ্টি আটকে গেল অনিমেষের। একটা বাইশ তেইশ বছরের যুবকের ফোটো সেখানে ঝুলছে। মুখটা খুবই চেনা। কিন্তু নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এই সময় সুচরিতা আবার ফিরে এল। বলল, 'দুঃখিত, আপনাকে চা খাওয়াতে পারলাম না। বাড়িতে চা আছে, দুধ-চিনি নেই।'

এই জন্যই তা হলে তাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিল সুচরিতা? দ্রুত মুখ

ফিরিয়ে অনিমেষ ব্যস্তভাবে বলল, 'না না, চায়ের দরকার নেই।' বলতে বলতেই তার চোখ আবার বাঁ-দিকের দেয়ালে ফিরে গেল।

সুচরিতা অনিমেষকে লক্ষ করছিল, বলল, 'কী দেখছেন?'

ফোটোটা দেখতে দেখতে অনিমেষ বলল, 'এ কে বলুন তো? খুব চেনা লাগছে।'

সুচরিতা বলল, 'যাক, ভালই হল। ছোটদাকে দিয়েই আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা শুরু করি।'

মুখ ফিরিয়ে অনিমেষ প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'ছোটদা?'

'হ্যাঁ, ওই যার ফটো দেখছিলেন। ওর নাম অনল।'

এবার মনে পড়ে গেল অনিমেষের। ক'বছর আগে যখন উগ্র রাজনৈতিক মুভমেণ্টে সারা দেশ তোলপাড় হচ্ছে সেই সময় এই শহরে অনলের নামটা লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। পরে অনিমেষ জেনেছে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে সে মারা গেছে। অনল তা হলে সুচরিতার ভাই!

সুচরিতা বলতে লাগল, 'আপনি যখন এই শহরেরই ছেলে তখন ছোটদার সব খবরই জানেন।'

অনিমেষ বলল, 'সব না হলেও কিছু কিছু জানি।'

'ছোটদা ছিল আমাদের ফ্যামিলির সব চাইতে ব্রাইট ছেলে। এম. এসসি পড়ছিল। আমরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।' বলে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুচরিতা। তারপর বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'বা রে, বাড়িতে নিয়ে এলাম কেন? সবার সঙ্গে আলাপ করবেন না? আসুন আসুন—'

একরকম জোর করেই অনিমেষকে নিয়ে শেষ ঘরটায় চলে এল সুচরিতা। একটা নোংরা বিছানায় অথর্ব এক বৃদ্ধা শুয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। সারা শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই।

সুচরিতা বলল, 'আমার মা। ছোটদা মারা যাবার পর শকে স্ট্রোক হয়েছিল। তারপর প্যারালিসিসে ডান দিকটা পড়ে গেছে, কথা বলতে পারে না। লোক চিনতে পারে না। আসুন।'

এবার সুচরিতার সঙ্গে মাঝখানের ঘরটায় এল অনিমেষ। এখানে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের একটি লোককে দেখা গেল। মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। চোয়াল ভাঙা, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রুক্ষ চুল, চোখ দু আঙুল গর্তে। পরনে তালিমারা লুঙ্গি আর ঢলঢলে ছেঁড়া পাঞ্জাবি।

সুচরিতা বলল, 'আমার বড়দা শরদিন্দু মিত্র।' শরদিন্দুকে বলল, 'ইনি অনিমেষ

সান্যাল। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন, এখন বড় চাকরি করেন। এখানকার সব চাইতে বড় বাড়িটা ওঁদের। বিরাট বড়লোক। ভীষণ অ্যারিস্টোক্রাট।'

শরদিন্দু নমস্কারের ভঙ্গিতে দুটো হাত তুলল। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল অনিমেষ। হাত কোথায়? কনুই পর্যন্ত আছে শরদিন্দুর, নিচের দিকটা নেই।

পাশ থেকে সুচরিতা বলল, 'বড়দা একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। একটু অসাবধান হওয়াতে অ্যাকসিডেন্টটা হয়ে গেল। পাঁচ হাজার টাকা কমপেনসেশান পেয়েছিল। কবেই শেষ হয়ে গেছে। আসুন—'

বাইরে আসতে আসতে 'রানিং কমেন্টারি' দেবার মতো সুচরিতা বলতে লাগল, 'অ্যাকসিডেন্টটার কিছুদিন পরই বৌদি একটা ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেল। দুটো বাচ্চা নিয়ে দাদা এখন বেকার। এ অবস্থায় কে কাজ দেবে বলুন। একমাত্র ভিক্ষে ছাড়া রোজগারের আর কোনও পথ নেই ওর। সেই লেভেলে এখনও ও নামতে পারে নি। চলুন, এবার রান্নাঘরের দিকটায় যাওয়া যাক। আমার ছোট বোন শোভা আর দাদার বাচ্চা দুটো ওখানে রয়েছে। ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

আর্টিস্ট যেমন আর্ট গ্যালারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার একজিবিশন দেখায় অবিকল সেইভাবে সুচরিতা তাদের ফ্যামিলিটা দেখাচ্ছে। কিন্তু এই পরিবেশে এদের দেখতে দেখতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল অনিমেষের। সে বলল, 'আজ থাক, আমাকে ফিরতে হবে। একটা জরুরি কাজের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

অদ্ভুত হাসল সুচরিতা। বলল, 'জানতাম আমাদের বাড়িতে আসার পর আপনার জরুরি কাজ মনে পড়ে যাবে। ঠিক আছে, শোভার সঙ্গে আলাপ করতে হবে না। ওর সম্পর্কে একটা খবর দিচ্ছি। এখনও শোভার বিয়ে হয়নি।' বলেই ঝুপ করে গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে দেয়, 'কিন্তু এর মধ্যেই একবার অ্যাবরশন করতে হয়েছে।'

অনিমেষ চমকে উঠল।

সুচরিতা এবার বলল, 'আর বড়দার বাচ্চা দুটোর মারাত্মক খিদে। একেক জন পুরো দুটো অ্যাডাল্ট লোকের মতো খায়।'

নার্ভগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছিল অনিমেষের। সে বলল, 'এবার আমাকে যেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'যে জন্যে এতদূর এলেন সেটাই তো বাকি থেকে গেল।'

'কিসের কথা বলছেন?'

'আমার সম্বন্ধে তো কিছুই শুনলেন না। চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। যেতে যেতে বলব।'

'আপনি আর কষ্ট করে যাবেন না।'

'কষ্ট আবার কী?'

বড় রাস্তায় সাইকেল রিকশার স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যেতে যেতে নিজের কথা বলে গেল সুচরিতা, 'এই যে ফ্যামিলিটা দেখলেন, এর সব দায়িত্ব এখন আমার। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারি পর্যন্ত পড়েছি। তাতে তো চাকরি হয় না। তাই সন্ধেবেলা আমাকে কলকাতায় যেতে হয়। সারা রাত হোটেলে কাটিয়ে ভোরে ফিরে আসি। বুঝতেই পারছেন—' একটু থেমে বলল, 'আশা করি আমার ব্যাপারে আপনার সব কৌতূহল মিটে গেছে। নিশ্চয়ই আর আমাদের দেখা হবে না। হওয়া উচিতও নয়।'

নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল অনিমেষের। শেষের দিকটা কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না যেন। লাফিয়ে সামনের একটা রিকশায় উঠে পড়ল সে।

দ্রুত রিকশাটার পাশে এসে সুচরিতা বলল, 'একটা কথা—

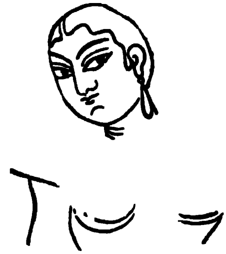
সুচরিতার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না অনিমেষ। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কী?'

'শোভা জানিয়েছে ঘরে চাল-আটা কিছু নেই। গোটা পঁচিশেক টাকা দিতে পারেন। ধার বলে নিচ্ছি, কিন্তু কোনওদিনই ফেরত দিতে পারব না।'

পার্স খুলে টাকা বার করে সুচরিতাকে দিয়েই অনিমেষ শ্বাসরুদ্ধের মতো রিকশাওলাকে বলল, 'চ্যাটার্জিপাড়া চল। জলদি—'

ঝড়ের গতিতে সাইকেল রিকশা ছুটতে লাগল।

সুচরিতা অনিমেষের রিকশার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ওধারের দোকানগুলোর দিকে চলল। আটা-টাটা কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে তো।



আকাশের চাঁদ এবং একটি জানালা

এই ছোট্ট মফস্বল শহরটার শেষ মাথায় নরকের খাসমহল একেবারের জমজমাট। এখানে ফুটিফাটা টিনের চালের বস্তির ভেতর দুনিয়ার সবচেয়ে ওঁচা তিরিশ-চল্লিশটি মেয়েমানুষ কতকাল ধরে যে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে!

খুব সম্ভব একশো বছর আগে এই শহর যেদিন তৈরি হয় সেদিন মেয়েমানুষদের ওই সৃষ্টিছাড়া উপনিবেশটারও পত্তন হয়েছিল। সেদিনকার প্রথম বাসিন্দাদের কেউ আর বেঁচে নেই, মরে হেজে সাফ হয়ে গেছে। কিন্তু এদের ব্যবসার যা রীতি, পরম্পরা বা ট্র্যাডিশান তা তো বজায় রাখতে হবে। তাই পনের-বিশ বছর পর পর পুরনোরা বাতিল হয়ে নতুনেরা এসেছে। এখন পঞ্চম জেনারেশান চলছে।

বস্তিটার সামনে দিয়ে খোয়া-ওঠা একটা রাস্তা বাঁ দিকে সোজা মরা নদীতে গিয়ে ঠেকেছে। সেখানে একধারে রয়েছে শিবমন্দির, আরেক পাশে শ্মশান।

ওই রাস্তাটাই ডান ধারে বরাবর মূল শহরে চলে গেছে। জঘন্য মেয়েমানুষগুলোর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অনেক দূরে এই শহরের ভদ্র সুখী সংসারী মানুষেরা থাকে। মেয়েদের এই কলোনি আর ভদ্রপাড়ার মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা কাঁকুরে জমি। বস্তিটার মুখোমুখি, রাস্তার ওধারে একটা চায়ের দোকান। সেটার গায়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত শুঁড়িখানা এবং তিন-তিনটে তেলেভাজার দোকানও। এই দোকানগুলোর পেছন দিক থেকে যত দূর চোখ যায়, ছাড়া-ছাড়া ভাবে করাত-কল, কাঠের গোলা, কাচের কারখানা আর অজস্র ইটভাটি। ডজন ডজন কারখানার চিমনি খাড়া আকাশের দিকে উঠে গিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করে তুলছে।

মেয়েমানুষদের ওই কলোনি থেকে বাঁ পাশের মরা নদী এবং নদীর ওপারটা দেখা যায়। ওপারেও ইটভাটির অগুনতি চিমনি আকাশের গায়ে বিঁধে আছে।

আশ্বিন মাস শেষ হয়ে এল। এখন সূর্য পশ্চিমে হেলতে শুরু করেছে। রোদের তেজ নেই। আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে আছে সমস্ত চরাচরের ওপর। পরিষ্কার নীলাকাশে পেঁজা তুলোর মতো ধবধবে মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেক উঁচুতে প্রায় আকাশের নীল ছুঁয়ে ক'টা চিল সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে।

বস্তির রাস্তার দিকের একটা ঘরের জানালার শিকে মুখ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা। বেলা যখন বিকেলের দিকে গড়াতে শুরু করে, সেই সময় রোজ তাকে

ওইভাবে ওখানে দেখা যায়।

দূরের নদী, নদীর ওপারের ইটভাটির চিমনি, আকাশ, চিল বা অন্য কোনও দিকে ললিতার লক্ষ্য নেই। বড় বড় চোখ মেলে রাস্তার ওধারে একমাত্র চায়ের দোকানটার দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে সে।

সারাদিন পাড়াটা নিঝুম পড়ে থাকে বিশেষ এই সময়টা অনন্ত আলস্য তাকে জড়িয়ে রাখে। ক্বচিৎ দু-একটি মানুষ তখন ভুলে এদিকে এসে যেতে পারে। অবশ্য শবযাত্রীর দল মড়া কাঁধে নিয়ে যখন তখন চলে আসে। মৃত্যুর তো আর সময় অসময় নেই। তবে সন্ধে নামতে না নামতেই নরকের এই খাসতালুক সমস্ত আলস্য ঝেড়ে আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে। দুনিয়ার যত মাতাল দাঁতাল চোর ফেরেব্বাজ খুনী বদমাশ এখানে হানা দিতে শুরু করে। এমনকি যে ভদ্রপাড়া এখানক্কার ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য দূরে সরে গেছে, সেখান থেকেও দু-চারজন লুকিয়ে চুরিয়ে, মুখে কাপড় ঢেকে সুড়ুৎ করে ছিঁচকে চোরের মতো এখানে ঢুকে পড়ে।

ললিতা তাকিয়েই আছে। চায়ের দোকানে এখন মধ্যবয়সী ক্ষয়াটে চেহারার ফটিকমামা চুপচাপ বসে বসে ঝিমোচ্ছে। খদ্দের নেই, ঝিমুনি ছাড়া তার কী-ই বা করার আছে আর। বেলা আরেকটু পড়লে মেয়েপাড়া থেকে অনেকে চা নিতে আসবে, তখন শুরু হবে ব্যস্ততা। ললিতার সঙ্গে ফটিকের আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। তার মা ফটিককে দাদা ডাকে, সেই সুবাদে সে তার ফটিকমামা।

ফটিককে প্রয়োজন নেই ললিতার। কখন শিবু স্কুল থেকে ফিরবে, সে জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। শিবু ফটিকের ছেলে, ক্লাস সিক্সে পড়ে। স্কুল ছুটির পর এখানে এসে দু-আড়াই ঘণ্টা বাপকে সাহায্য করে যায়। সন্ধেবেলা মেয়েমানুষদের বস্তিতে যখন নরক গুলজার হয়ে ওঠে, তার অনেক আগেই ফটিক ছেলেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। ওদের বাড়িটা ভদ্রপাড়া আর মেয়েমানুষদের কলোনির মাঝামাঝি জায়গায়।

ললিতার বয়স তের। স্বাস্থ্যটি ভালো হওয়ার কারণে আরও বড় দেখায়। মনে হয় পরিপূর্ণ এক যুবতী। গায়ের রংটি পালিশ-করা কাঁসার মতো। নরকের থিকথিকে জীবাণুর মধ্যে থাকলেও তার ওপর এখানকার কোনও ছাপই পড়েনি। পানপাতার মতো মুখ ললিতার, সেই মুখে জগতের সবটুকু সারল্য যেন মাখানো। ছোট্ট কপাল। তরতাজা আনাজের মতো তার মসৃণ, টান-টান হাত-পা-গলা বা চিবুক। চোখ দু'টি ভাসা-ভাসা এবং ঘন পালকে-ঘেরা।

এই মুহূর্তে ফুল লতাপাতার ছাপ-দেওয়া একটা শাড়ি অগোছালো করে পরে আছে ললিতা। তের বছর বয়স হলেও এখনও শাড়ি সামলাতে পারে না সে। কোঁচকানো ঘন চুল রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা। দু-হাতে সবুজ কাচের চুড়ি, গলায় রুপোর হার, নাকের পাটায় লাল পাথর বসানো নাকফুল। রক্তবিন্দুর মতো সেটা

যেন জ্বলছে। কানে সোনার মাকড়ি।

শিবু ললিতারই বয়সী, তারা একসঙ্গে স্কুলে পড়ত। বছর খানেক আগে ললিতার শরীর যখন আচমকা ভরে উঠতে শুরু করল, তার মা রজনী দুম করে স্কুল ছাড়িয়ে দেয়। এই নিয়ে প্রচুর কান্নাকাটি করেছে ললিতা কিন্তু মা অনড়। যুবতী হয়ে উঠছে যে মেয়ে, তাকে নিয়ে সে তখন থেকে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। এদিকে তাকে নিয়ে কে কী ভাবছে, বা স্বপ্ন দেখছে সে ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই ললিতার। স্কুলে যে ক'টা বছর সে যাতায়াত করেছে সেটুকুই তার কাছে সবচেয়ে সুখের সময়। এখনও তা-ই নিয়ে সে বিভোর হয়ে আছে।

শিবুর ফেরার সময় হয়নি, তবু ললিতা ডাকে, 'ও ফটিকমামা—'

ফটিকের ঝিমুনি কেটে যায়। সামান্য চমকে উঠে এধারে ওধারে তাকিয়ে ললিতাকে দেখতে পায়। মস্ত হাই তুলে বার কয়েক তুড়ি বাজাবাব পর আলস্যের গলায় বলে, 'অ, তুই! তা কী কইচিস?'

'ক'টা বেজেছে, দেখো তো।'

ফটিকের দোকান একটা নড়বড়ে পাল্লা ভাঙা আলমারির মাথায় মান্ধাতার বাপের আমলের গোল টেবল ক্লক রয়েছে, সেটার কাচ ফেটে চৌচির। ঘড়িটা তিন চার ঘণ্টা পর পর দম না দিলে চলে না।

ঘড়ি দেখে ফটিক বলে, 'পৌনে তিনটে। শিবের ছুটি হতে এখনও এক ঘণ্টা।'

ললিতা চুপ করে থাকে।

ফটিক জানে, রোজ কার জন্য ওভাবে জানালায় মুখ চেপে দাঁড়িয়ে থাকে ললিতা। সে এবার বলে, 'কেন যে তোর মা সাত তাড়াতাড়ি স্কুল ছাড়িয়ে তোকে ঘরে বসিয়ে দিলে! লেকাপড়ার অ্যাত ঝোঁক, আর দু-চারটে বচ্ছর পড়ালে কী অ্যামন ক্ষেতিটা হত! কত করে ত্যাখন কইলাম, তা রজনী একেবারে ঘাড় বেঁকিয়ে রইল।'

ফটিক তার যৌবনে ছিল বেশ্যার দালাল। এ পাড়ার মেয়েমানুষদের জন্য খদ্দের জুটিয়ে দিয়ে সিকি ভাগ কমিশন নিত। সে ধরেই নিয়েছিল, এইভাবে জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু আচমকা দুম করে এই পাড়ারই একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসে। এই ঘটনাটা তার জীবন আমূল পালটে দেয়। যাকে সে বিয়ে করেছে সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে উচ্চাকাঙক্ষা ছিল, একটা ভদ্র রকমের ঘর-সংসারের স্বপ্ন দেখত সে। তার স্বামী আমৃত্যু বেশ্যার দালাল থেকে নর্দমার পোকার মতো জীবন কাটিয়ে দেবে, এটা একেবারেই তার কাম্য ছিল না। ভদ্র পাড়ায় তাদের কেউ ঘর ভাড়া দেয়নি, আবার মেয়েমানুষদের কলোনিতেও থাকা যাচ্ছিল না, দুই পাড়ার মাঝামাঝি এক টুকরো জমি কিনে তারা ঘর তুলে নিয়েছিল। শুধু তাই না, বেশ্যার দালালগিরি

ছাড়িয়ে ফটিককে দিয়ে জ্যোৎস্না চায়ের দোকান খুলিয়েছিল। পনের ষোল বছর বিয়ে হয়েছে। এর ভেতর তাদের দুই ছেলে। শিবু আর জগা। শিবুই বড়। নিজের উচ্চাশাটা ফটিকের ভেতরেও চারিয়ে দিতে পেরেছিল জ্যোৎস্না। ফলে ফটিক ছেলেদের নষ্ট হয়ে যেতে দেয়নি, স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। শুধু তাই না. সামনের বস্তিটায় যে মেয়েমানুষদের বাপের পরিচয়হীন ছেলেমেয়েরা রয়েছে তাদেরও হাজার বার বুঝিয়ে বাচ্চাগুলোকে স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। নরকে পোকার মতো জন্মালেও মনুষ্য জীবন তো। সেটা অবহেলায় নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া ঠিক নয়। দু-চারটে কালির অক্ষর তাদের পেটে ঢুকিয়ে দিতে পারলে আখেরে কাজ হতে পারে। এইভাবেই রজনীর মেয়ে ললিতাও স্কুলে গিয়েছিল।

শিবু আর ললিতার একই বয়স। এক সঙ্গে, একই দিনে তারা একই ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। তারপর ছ'টা বছর কাটতে না কাটতেই আচমকা রজনীর মাথায় কী পোকা যে নড়ে উঠল, স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে এনে মেয়েকে ঘরে বসিয়ে দিলে। কারণটা অবশ্য আন্দাজ করতে পেরেছে ফটিক কিন্তু বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া তার আর কী করার থাকতে পারে। ফটিক বলে, 'তা আর কতক্ষণ দেঁড়িয়ে রইবি! শুয়ে থাক গে। শিবে এলে তো তোকে ডেকে তুলবেই।'

'দুপুরবেলা শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। থাকি না একটু দাঁড়িয়ে।'

'তোর য্যামন ইচ্ছে।' বলে চোখ বুজে ফের নতুন উদ্যমে ঝিমোবার তোড়জোড় করে ফটিক।

জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ, চিল, দূরের নদী, নদীর ওপারে ইটভাটির চিমনি আর পড়ন্ত বেলার নিঝুম সব দৃশ্য দেখে একটা ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে থাকে ললিতা। মাঝে মাঝে ভেতরের একটা ঘর থেকে রজনীর ঘুম-জড়ানো অলস ভারি গলা ভেসে আসে, 'লতি, অ্যাই লতি—'

ললিতার ডাক-নাম লতি। সে অন্যমনস্কর মতো সাড়া দেয়, 'কী মা?'

'বিকেলে গানের মাস্টের আসবে। হারমোনিটা লিয়ে গলাটা খানিক সেধে নে।'

ললিতা উত্তর দেয় না।

ঠিক একটি ঘণ্টা বাদে শিবু এসে হাজির। রোগা পটকা, ফড়িংয়ের মতো চেহারা। কে বলবে সে ললিতার সমবয়সী!

অনেকটা রাস্তা হেঁটে আসার কারণে তার কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। পরনে সস্তা খেলো কাপড়ের ফুল প্যান্ট আর শার্ট, পায়ে তালি-মারা চটি। কাঁধ থকে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে, তার ভেতর বই খাতা-টাতা।

শিবুকে দেখে চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে ললিতার। সে বলে, 'সেই কখন থেকে তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি!'

শিবু জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'কী করব, স্কুল ছুটি হলে তো আসব।'

'আজ ইতিহাসের ক্লাস ছিল না?'

'হুঁ।'

'অবিনাশ স্যার পড়ালে?'

'হ্যাঁ।'

'কী পড়ালে?'

'মুঘল সাম্রাজ্যের পতন।'

আগ্রহে মুখটা চক চক করতে থাকে ললিতার। সে বলে, 'কী করে পতনটা হল বল তো।'

ঘণ্টা পাঁচেক স্কুলে কাটিয়ে ভীষণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল শিবুর। পড়াশোনার কথা এখন ভালো লাগছে না তার, চোখমুখ কুঁচকে বলে, 'সে অনেক ব্যাপার। পরে বলব। এখন আমি যাচ্ছি।'

জানালার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে শিবুর কাঁধটা ধরে ফেলে ললিতা। বলে, 'ঠিক আছে, পরেই বলিস। হ্যাঁ রে শিবু, সেদিন বলছিলি তপতীর খুব জ্বর হয়েছে। ও কি ভালো হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'স্কুলে আসছে?'

'চারদিন পর আজ এল।'

খানিকটা নিজের মনেই যেন ললিতা বলে, 'ও আমার ভীষণ বন্ধু। আমার কথা বলে রে?'

শিবু বলে, 'আগে বলত, এখন কিছু বলে না।'

মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে যায় ললিতার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'গণেশ, অধীর, মোহন, দীপ্তি, নমিতা, ওরা রোজ স্কুলে আসে?'

'হুঁ।'

'আমার কথা কেউ বোধহয় জিজ্ঞেস করে না?'

'না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ললিতার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'সবাই আমাকে ভুলে গেছে, না?'

শিবু বলে, 'ধুৎ, সবাই ভুলবে কেন? নগেন স্যার তোর কথা রোজ বলে।'

চোখ মুখ ফের আলো হয়ে যায় ললিতার। শিবুর কাঁধটা জোরে আঁকড়ে ধরে সে। উৎসুক গলায় বলে, 'আজ কিছু বলেছে?'

'হুঁ।'

'কী বলেছে রে?'

'এই তুই ভালো মেয়ে, অঙ্কে আর বিজ্ঞানে তোর ভীষণ মাথা, কেন যে তোকে রজনী পিসি স্কুল ছাড়িয়ে দিলে, এই সব।'

ললিতার মুখ দেখে মনে হয়, অবিশ্বাস্য কিছু শুনছে। চোখ বড় বড় করে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'সত্যি বলছিস!'

শিবু বলে, 'সত্যি না কি মিথ্যে? সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

ললিতার চোখ শিরশির করতে থাকে। এখনই বুঝি জল বেরিয়ে আসবে। সে ভারি গলায় বলে, 'নগেন স্যার আমায় খুব ভালোবাসে, না রে?'

শিবু তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয়। গলার স্বরে লম্বা টান দিয়ে বলে, হুঁ উ-উ-উ। নগেন স্যার আরো কী বলেছে জানিস?'

'কী?'

'একদিন এখানে আসবে।'

ললিতা হাঁ হয়ে যায়। তারা কোথায়, কী পরিবেশে থাকে, সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে তার। কোনও ভদ্রলোক যে এ পাড়া মাড়ায় না, সেটা ভালোই জানে সে। নগেন স্যারের মতো মানুষ এখানে আসতে পারে তা একেবারেই অভাবনীয়। জানলার সরু জং-ধরা শিকে মুখটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে, 'তুই ঠিক শুনেছিস?'

শিবু বলে, 'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। একবার না, তিন-চারবার বলেছে।'

'কেন আসবে, বললে?' আগ্রহে, উত্তেজনায়, অসহ্য আবেগে ললিতার গলা কাঁপতে থাকে।

'রজনী পিসির সঙ্গে দেখা করে ফের তোকে স্কুলে ভর্তি করার কথা বলবে।'

যে জলটা চোখের ভেতর ললিতা আটকে রেখেছিল, এবার সেটা ফোঁটায় ফোঁটায় বেরিয়ে আসে। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাশের ঘর থেকে রজনীর চাঁচাছোলা তীক্ষ্ণ গলা ভেসে আসে, 'লতি, অ্যাই লতি—'

মুখ ফিরিয়ে ললিতা সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

'জানলা ধরে কার সন্‌গে ভ্যাজর ভ্যাজর করচিস? নিঘ্‌ঘাত শিবে?' শিবু যে স্কুল ছুটির পর এখানে এসে খানিকক্ষণ ললিতার সঙ্গে গল্প করে যায়, রজনী তা জানে। শুধু রজনীই না, মেয়েপাড়ার সবাই।

'হ্যাঁ।'

'শিবেকে অ্যাখন যেতে বল।'

'পরে যাবে। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

রজনী গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে বলে, 'কথার ক্যাঁথায় আগুন। গানের

মাস্টের যে আমার ঘরে বসে রয়েচে, সে হুঁশ আচে মুখপুড়ির? হারমুনিটা লিয়ে আসবি?'

শিবু শশব্যস্তে বলে, 'যা যা, আর দাঁড়িয়ে থাকিসনি। রজনী পিসি এবার কিন্তু খেপে যাবে।'

'খেপুক গে।' শিবুর দিকে ফিরে বিরক্ত কোঁচকানো মুখে ললিতা বলে, 'ওই গানের মাস্টেরটা কী সব নোংরা নোংরা গান শেখায়, তোকে কী বলব শিবু! আমার নাড়ি উলটে বমি উঠে আসে।'

ওধার থেকে রজনী ফের তাড়া লাগায়, 'কী লা লতি, মরলি নাকিন?'

শিবু ভয়ে ভয়ে বলে, 'আর দেরি করিস না, আমি পালাই।' সে এক ছুটে রাস্তা পেরিয়ে তাদের চায়ের দোকানের দিকে চলে যায়।

পেছন থেকে ললিতা বলে ওঠে, 'নগেন স্যারকে তাড়াতাড়ি আসতে বলিস।'

শিবু ছুটতে ছুটতে জবাব দেয়, 'বলব।'

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ায় ললিতা। মেয়েমানুষদের এই কলোনিতে তাদের দু'খানা ঘর। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটা, ডান পাশের ঘরটাও তাদেরই। এই ঘরটায় সে থাকে, পাশের ঘরটায় মা। ললিতাব ঘরের একধারে পরিষ্কার বিছানা পাতা বয়েছে। আরেক ধারে টিনের পার্টিশান ওয়ালের গা ঘেঁষে কাচ-বসানো কাঠের আলমারিতে ললিতার বইপত্র। ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসের সমস্ত বই আর খাতা ওটার ভেতর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আছে রামায়ণ, মহাভারত, বেতাল পঞ্চবিংশতি, জাতকের কাহিনী, সহজ করে লেখা মহাপুরুষদের জীবনী, ম্যাপের বই। শরৎচন্দ্র এবং হাল আমলের লেখকদের কিছু গল্পের বইও রয়েছে। বিছানার পাশে ক'টা বাক্স, আলনা ইত্যাদি। একটা লম্বা-চওড়া জলচৌকির ওপর কাপড়ের ঢাকনা-দেওয়া পুরনো হারমোনিয়াম। চারিদিকের দেওয়ালে দেবদেবী এবং মহাপুরুষদের বিস্তর ছবি ঝুলছে। ওঁচা মেয়েমানুষদের এই উপনিবেশে এমন একটা ঘর একেবারেই অভাবনীয়। নরকের মঝখানে এক টুকরো পবিত্রতা যেন। ডান পাশের দেওয়ালে নানা ছবির ফাঁকে আটকানো রয়েছে একটা গোলাকার আয়না, সেটার তলায় লম্বাটে তাকে চিরুনি, পাউডারের কৌটো, সস্তা সেন্ট, চুলের কাঁটা, আলতার শিশি ইত্যাদি।

ঢাকনা সরিয়ে দু'হাতে হারমোনিয়ামটার আংটা ধরে পাশের, অর্থাৎ রজনীর ঘরে চলে আসে ললিতা।

রজনীর ঘরটা ললিতার ঘরের চেয়ে অনেক বড়। এখানেও ঢালা তক্তাপোষে ধবধবে বিছানা। দেওয়ালে আয়না এবং কাঠের দু-তিনটে তাকে সাজগোজের জিনিস। একধারে বাক্স-পেঁটরা আর নানা লটবহর। আলনার শাড়ি-টাড়ি পাট করে

রাখা। মেঝেতে বসার জন্য বেতের সস্তা ক'টা মোড়া। এক দেওয়ালে মা কালীর একটা ছবি। বাকি তিন দেওয়ালে তাকানো যায় না। অগুনতি ছবি ঝুলছে ওগুলোর গায়ে। ন্যাংটো পুরুষ আর যুবতীরা এমনভাবে জড়াজড়ি করে রয়েছে যে তাকানো মাত্র মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে।

এই ঘরটায় দিনের বেলা রজনীর গেরস্থালি, কিন্তু সন্ধের পর থেকে এটা নরকের খাস তালুক হয়ে ওঠে। দু-এক ঘণ্টা পর পর মাতাল দাঁতাল চোর ডাকাত বা খুনীকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজায় হুড়কো দিয়ে দেয় রজনী। সারা রাত হাড়গোড়সুদ্ধ তার শরীরটাকে ডলে পিষে কামড়ে খিমচে, প্রায় চুরমার করে দিয়ে ভোর হলে শেষ খদ্দেরটি চলে যায়। অনেকটা বেলা পর্যন্ত নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ডের মতো ধামসানো বিছানায় পড়ে থাকে সে।

এই মুহূর্তে রজনীর বিছানার একধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে গানের মাস্টার বিনোদ সাধুখাঁ। খানিক দূরে একটা বেতের মোড়ায় রজনী।

বিনোদের বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। বৃষকাঠের মতো চেহারা। হেন নেশা নেই, সে করে না। গাঁজা, ভাং, দিশি মদ থেকে তাড়ি কোনও ব্যাপারেই তার অরুচি নেই। ফলে এই বয়সেই স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। গাল ভাঙা, চোখের কোলে চিরস্থায়ী কালির পোঁচ। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। পিঠটা বেঁকে গেছে, ফলে কুঁজো দেখায়।

বিনোদের ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া বাবরি চুল। শিরা বের-করা হাত, আঙুলগুলো গাঁট পাকানো। তার পরনে চোঙা পায়জামা আর কলিদার গোলাপি পাঞ্জাবি। গলায় সোনার সরু চেইন, দু-হাতে গোটা চারেক আংটি।

বিনোদ স্থানীয় যাত্রাদল নবদুর্গা অপেরায় ক্ল্যারিওনেট বাজায় আর সকালে বা বিকেলে মেয়েদের পাড়ায় এসে গান শেখায়। গানটান জানা থাকলে এখানকার বাসিন্দাদের দাম অনেক বেড়ে যায়।

হারমোনিয়মটা রজনীর বিছানায় রেখে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে ললিতা।

বিনোদ বলে, 'কী হল, বসো।' নেশাভাং করার কারণে তার গলাটা খসখসে, চেরা চেরা।

ললিতা বসে না। আসলে লোকটাকে তার ঘোর অপছন্দ।

রজনী চোখ সামান্য কুঁচকে মেয়েকে লক্ষ করছিল। বিরক্ত গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'কী হল, তক্তপোষে উঠে বসবি, না ঠায় দেঁড়িয়েই রইবি?'

রজনীর বয়স চল্লিশের নিচেই হবে। তার চেহারায় এখানকার জঘন্য জীবন যাপনের ছাপ এমনভাবে পড়েছে যা কোনও দিনই মোছা যাবে না। তার চোখের দৃষ্টি খর। চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, দুটো দাঁত রুপো বাঁধানো। তিন চার বছর

আগেও অঢেল স্বাস্থ্য ছিল তার। শরীরের বাঁধুনি কবেই ঢিলে হয়ে গেছে। সারা গা জুড়ে এখন শুধুই ভাঙচুরের চিহ্ন।

এই মুহূর্তে একটা খেলো ডুরে শাড়ি ঘবোয়া ধরনে পরে আছে রজনী। গলায় রুপোর গোট হার, কানে লাল পাথর বসানো কানফুল, নাকের পাটায় সবুজ পাথরের নাকছাবি।

ললিতা বলে, 'আমি গান শিখব না।'

রজনী ভেংচে ওঠে, 'গান শিখব না! আখেরে যা কাজে দেবে তা কেন শিখবি! লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, ইস্কুলে পেঁঠিয়ে কী পাপ যে কবেচি! উঠে বস।' তাব গলা ক্রমশ চড়তে থাকে।

মায়ের মারমুখী চেহারা দেখে ভীষণ দমে যায় ললিতা। আস্তে আস্তে বিছানার একধাবে বসে পড়ে সে।

বিনোদ বলে, 'আহা, বকাবকি করোনি লতিব মা, গান শিখতে য্যাখন ভালো লাগচেনি ত্যাখন না হয় থাক।'

'থাকবে কি গ! তুমি আর ধুনোর গন্ধ দিওনি মাস্টের। ব্যবসা কবে খেতে হবে। পালধি মাশায় পই পই করে বলে দিয়েচে, গানটা ঝ্যানো (যেন) লতিকে শেখানো হয়।'

পালধির নামটা কোথায় কাব কাছে যেন শুনেছিল ললিতা। তাব গান শেখার সঙ্গে পালধির কী সম্পর্ক, বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো একবাব মুখ তুলে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

বিনোদের চোখ চকচক করে ওঠে। অসীম আগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'কোন পালধি মাশায় গ রজনীদিদি?'

'লটবর পালধি।'

'ইটখোলার মালিক?'

'হ্যাঁ।'

'তেলকল, ধানকল, বাজারে আড়ত, এমনি কত সব কারবার পালধি মাশায়ের। 'ট্যাকার কুমির।' চোখেব ইশারায় ললিতাকে দেখিয়ে, তার নামটি উচ্চারণ না করে বিনোদ গলাটা ঝপ করে খাদে নামিয়ে দেয়, ষড়যন্ত্রকারীর মতো বলে, 'লজর পড়েচে বুঝিন?'

নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে দেয় রজনী।

'বেশ বেশ। বড় ভালো খপরটি দিলে গ দিদি। ভগমান ঝ্যানো তোমার আশাটি পূণ্য করে।'

যাকে নিয়ে এত কথা সে প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না। চুপচাপ নতমুখে বসেই

থাকে ললিতা।

রজনী বলে, 'তোমরাও আশীব্বাদ কর।'

বিনোদ বলে, 'সে তো সব্বক্ষণই করচি। ওটি হলে সারা জীবনের জন্যে হিল্লে হয়ে যায়।'

'হুঁ। বেলা পড়ে আচে। খানিকটা পরে তো লরকের পিদিম জ্বালাবার জন্যে সাজতে গুজতে বসতে হবে। তার আগে আরম্ভ করে দাও মাস্টের।'

বিনোদ নড়েচড়ে বসে, 'হ্যাঁ, এই করচি। লতি আমার সন্‌গে ধরে ফেল।' বলে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে রিডের ওপর আঙুল চালাতে চালাতে গাইতে শুরু করে :

'লাগর হে,
আমার কাঁচা যৈবন সারা গায়ে
রেখিচি সাজিয়ে
কাচে এসে বুকে টেনে
দাও না পাকিয়ে।
লাগর হে
তোমার তরে জীবন যৈবন
দেবো গ ভাসিয়ে।
বুকের ভেতর হু হু আগুন
জ্বইলে মরি দিবারাতি।
লাগর হে,
অঙ্গে অঙ্গ ঘষে ঘষে
দাও না আগুন নিভিয়ে।
কাচে এসে বুকে টেনে
দাও না আমায় পাকিয়ে...'

দু-চার বার বাবরি ঝাঁকিয়ে গাওয়ার পর হঠাৎ বিনোদের চোখে পড়ে আগের মতো মুখ নিচু করে বসে আছে ললিতা। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটা লাইনও গাইছে না। বিনোদ অবাক হয় না, কেননা এর আগেও ক'দিন গান শেখাবার সময় চুপচাপ তাকে বসে থাকতে দেখা গেছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'মুখ বুজিয়ে রইলে যে। ধর আমার সন্‌গে।'

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ললিতা।

'না, কেন?'

'গানটা খুব খারাপ।'

'গানের আবার খারাপ ভালো আছে নাকিন? য্যামনটা নেকা (লেখা) ত্যামনটাই

তো গাইতে হয়।'

প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে ললিতা বলে, 'কথাগুলো নোংরা। শুনতে শুনতে গা গুলিয়ে ওঠে।'

বিনোদ যখন গান ধরেছিল সেই ফাঁকে মুখে একটা পান পুরে দিয়েছে রজনী। চিবানো স্থগিত রেখে সে হুমকে ওঠে, 'ভদ্দরনোকদের বাড়ির মেয়ের মতো কথাবাত্তা। থাকতে তো হবে এই নরকে ঘাড় গুঁজে। ভালো মোন্দ আর বাচতে হবেনি। মাস্টের যা শেকাচ্ছে শিকে ফ্যাল। সুকের মুখ দেখতে পাবি। গান ধর—'

মারাত্মক জেদ যেন ললিতার মাথায় ভর করে। সে বলে, 'না না না—'

'উঃ', কপালের দু'পাশে রগ টিপে ধরে রজনী। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'পেটে কী শয়তানের ঝাড় ধরেছিলুম গ। ইস্কুলে পেঠিয়ে সব্বোনাশ করেচি। ধর শোরের বাচ্চা।' অশ্রাব্য গালাগালিতে আবহাওয়াকে বিষাক্ত করতে করতে মেয়ের দিকে আগুনখাকীর মতো তেড়ে যায় সে।

হাত তুলে শশব্যস্তে বিনোদ বলে, 'আহা, অত চটাচটি করোনি। ইস্কুলে গিয়ে দশজনের সন্‌গে মেলামেশা করে মনটা অন্যরকম হয়ে গেচে। ক'দিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রজনী বিনোদের কথাটা মেনে নেয়। তবে তার রোখটা পুরোপুরি পড়ে না। গজগজ করতে করতে ফের গিয়ে বেতের মোড়ায় বসে পড়ে, 'আর দু-একদিন দেকব। তারপরও ব্যাগরবাই করলে মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবো।'

বিনোদ ললিতাকে বলে, 'তোমার ওপর মায়ের কত আশা ভরসা। কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেচে, সে তো আমরা দেকেচি। তুমি গান শিকলে মা যদিন খুশি হয়, সেটা সন্তান হয়ে ভাববে না? তুমি ছাড়া মায়ের আর আচে কে? লাও পুরোটা যদি ন ইচ্ছে না হয়, দু-এক ছত্তর আমার সন্‌গে ধর।'

ঘোর অনিচ্ছায় হেলাফেলা করে দু-চার লাইন গেয়ে নিজের ঘরে চলে যায় ললিতা।

পেছন থেকে রজনী চেঁচিয়ে ওঠে, 'দরজায় ভালো করে হুড়কো দিয়ে রাকবি। নইলে শকুনগুলোন কখন কী করে বসবে—' রোজই সন্ধের আগে আগে মেয়েকে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে বলে রজনী। সমস্ত রাত সে দরজা আর খোলে না। এটা একেবারে নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কেননা অন্ধকার নামতে না নামতেই চোর খুনী মাতালেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে হানা দিতে থাকে। এদের সবাই রজনীর চেনা। তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সে বলে দিয়েছে, ভুলেও কেউ যেন ললিতার ঘরে হামলা না করে। তবু সাবধানের মার নেই। মেয়েপাড়ায় যে খদ্দেররা বিষ্ঠার পোকার মতো হাজিরা দেয় তাদের পেটে তাড়ি কি কালীমার্কা

দিশি মদটি ঢুকলে তখন কি আর মাথার ঠিক থাকে? নেশার ঘোরে যে ললিতার ঘরে ঢুকতে চাইবে না, তার কি কোনও গ্যারান্টি আছে? ফলে রজনীকে নিজের ধরে খদ্দের ঢুকিয়েও কান খাড়া করে রাখতে হয়। কেউ ললিতার ঘরের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করলে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'অ্যাই ঘাটের মড়ারা ওখেনে লয়, ওখেনে লয়। ভাগ ভাগ।' আসলে ললিতাকে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তির মতো আগলে আগলে রেখেছে রজনী। ললিতার তো বটেই, তার নিজেরও ভবিষ্যৎ মেয়ের সঙ্গেই জড়ানো। হাতে সোনার মোহর থাকলে হয় না, তাকে বুদ্ধি করে কাজে লাগাতে হয়। নইলে উড়নচণ্ডীর মতো নগদ নগদ সুখের আশায় উড়িয়ে দিলে আখেরটি একেবারেই মাটি।

পরদিন শিবু স্কুল ছুটির পর দুর্দান্ত এক খবর নিয়ে আসে। বলে, 'জানিস লতি, মানুষ চাঁদে যাচ্ছে!' উত্তেজনায় তার চোখমুখ ঝকমক করতে থাকে।

যথারীতি নিজের ঘরের জানালায় মুখটা চেপে ধরে শিবুর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল ললিতা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোন চাঁদে?'

'কোন চাঁদে আবার? আকাশে চাঁদ দেখিসনি?'

'সেখানে!'

'হ্যাঁ।'

মুহূর্তে শিবুর উত্তেজনা ললিতার মধ্যেও চারিয়ে যায়। যদিও এখন বিকেল, চারিদিকে পরিষ্কার ঝকঝকে রোদ, সুদূর নীলাকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে বলে, 'ওই ওখানে মানুষ যাবে? যা!'

শিবু বলে, 'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।'

'কে বললে তোকে?'

'নগেন স্যার।'

ললিতার মনে যেটুকু বা সংশয় ছিল, পলকে মুছে যায়। কারণ নগেন স্যারের প্রতিটি কথা তার কাছে বেদবাক্য। পৃথিবী উলটে গেলেও নগেন স্যার যা বলে তা ভুল হতে পারে না। ললিতার ধারণা এই মাস্টারটির মতো বিদ্যার জাহাজ ভূভারতে দ্বিতীয়টি নেই।

ললিতা বলে, 'কবে মানুষ চাঁদে যাবে রে?'

শিবু বলে, 'নগেন স্যার তা বলেনি। মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই যাবে।'

'যখন যাবে আমাকে বলিস কিন্তু।'

'বলব।'

'কোন দেশের লোক যাচ্ছে কিছু শুনেছিস?'

একটু ভেবে অনিশ্চিত ভাবে শিবু বলে, 'রাশিয়া আর আমেরিকার নাম জানিস?' আসলে নগেন স্যার ঠিক কোন দেশেব নাম বলেছে এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে না।

'জানব না কেন?'

'ওরই ভেতর কোনও একটার। আচ্ছা, আমি এখন যাই রে লতি।'

শিবু তাদের চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়িয়েছিল, হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় তাকে থামিয়ে দেয় ললিতা, 'এই শোন শোন—'

শিবু বলে, 'কী?'

'নগেন স্যারকে এখানে আসার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলি?'

'এই যাঃ, একদম মনে ছিল না। মানুষের চাঁদে যাওয়ার কথা শুনতে শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

চোখেমুখে সামান্য হতাশার ছায়া পড়ে ললিতার। সে বলে, 'কাল কিন্তু বলিস।'

তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে দেয় শিবু, 'হ্যাঁ বলব।' বলে রাস্তার উলটোদিকে চলে যায়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রজনীর গলা ভেসে আসে পাশের ঘর থেকে, 'লতি, মাস্টের এয়েচে। তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

আজ আর আপত্তি করে না ললিতা। অন্যমনস্কের মতো মায়ের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ গান শিখে ফের নিজের ঘরে এসে দরজায় খিল দিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। আসলে মানুষের চাঁদে যাবার খবরটি তাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে অন্য কিছুই সে ভাবতে পারছিল না। ম্যাপ-বই খুলে তন্ময় হয়ে সে রাশিয়া আর আমেরিকার অবস্থান খুঁজে বার করে মগ্ন হয়ে দেখতে থাকে।

দেখতে দেখতে সন্ধে নামে। খুব সম্ভব এটা শুক্লপক্ষ। দিগন্তের তলা থেকে রুপোর থালার মতো পরিপূর্ণ চাঁদ উঠে আসে। দুধের স্রোতের মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় দূরের নদী, গাছপালা, আকাশ। মফস্বল শহরের নোংরা, জঘন্য এই অঞ্চলটাকে এখন আর যেন চেনাই যায় না। চাঁদের আলোয় সেটাকে আশ্চর্য মায়াবী দেখায়।

অবশ্য ললিতার ঘরের বন্ধ দরজার ওধারে নরকের পোকারা হানা দিতে শুরু করেছে। তাদের জড়ানো গলায় হই-হল্লা এবং চারিদিকের ঘর থেকে হারমোনিয়ামের আওয়াজের সঙ্গে দু-চার টুকরো গান ভেসে আসছে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই ললিতার। প্রচণ্ড উত্তেজনায় সে পলকহীন চাঁদের দিকে তকিয়ে আছে। ভূগোলের বইতে ললিতা পড়েছে তাদের এই পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে আকাশের ওই চাঁদ। সে জানে উড়োজাহাজ অত উঁচুতে উঠতে পারে না। তবে কিভাবে, কোন আকাশযানে চড়ে মানুষ ওখানে পৌঁছুবে? ভাবতে ভাবতে মাথাটা গুলিয়ে যায় ললিতায়। কতক্ষণ ঘোরের মধ্যে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল, ললিতার খেয়াল নেই।

অনেক রাতে কামিনী এসে দরজায় ধাক্কা দিতে তার হুঁশ ফেরে যেন। এই সময়টা তার জন্য রাতের খাবার নিয়ে আসে কামিনী। ঘরে ঢুকে ভাত-ডাল-তরকারি একধারে গুছিয়ে দিয়ে সে ব্যস্তভবে বলে, 'আমি যাই। দোর বন্ধ করে দাও।' মাঝবয়সী কামিনী তাদের রান্নাবান্না করে দেয়।

ললিতা দরজায় খিল তুলে দিলে কামিনী বাইরে থেকে বলে, 'খেয়ে লিও কিন্তুন। বেশি রাত করোনি।'

'আচ্ছা।'

ললিতা আবার জানালার পাশে এসে চাঁদ দেখতে থাকে। একটা কথা ভেবে তার অদ্ভুত লাগে। এ বছরের গোড়ার দিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনার পর থেকে রজনী তাকে মেয়েপাড়ার চৌহদ্দির বাইরে বেরুতে দিচ্ছে না। এখানেই তার বন্দিজীবন। ক্বচিৎ কখনো বেরুলে মা পাহারাদারের মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকে, মোট কথা রজনী তাকে সর্বক্ষণ আগলে আগলে রাখছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ তা তার ঘরের এই জানালাটা দিয়ে। সে মেয়েপাড়ার এই ছোট্ট সীমানার মধ্যে আটকে আছে, আর মানুষ কিনা তাদের বিশাল গ্রহের আয়তন ছাড়িয়ে চলেছে বহুদূরের ওই চাঁদে। বিপুল আকাশের মাঝখানে ওই উপগ্রহটি এখান থেকে কত লক্ষ মাইল তফাতে, তার কল্পনা সেখানে পৌঁছয় না।

আরও ক'টা দিন কেয়ে যায়।

এর মধ্যে ললিতার দৈনন্দিন রুটিনে কোনওরকম হেরফের ঘটেনি। একই নিয়মে সেই বিকেল পর্যন্ত বদ্ধ ঘরে ছটফট করে কাটায় সে। পড়ন্ত বেলায় রুদ্ধশ্বাসে জানালার পাশে শিবুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। শিবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বিনোদ মাস্টার হাজির হয়ে যায়। কোনওরকমে গান-টান শিখে নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার নামে। এদিকে সারাদিন গড়িমসি চালে কাটিয়ে দেবার পর নরকের এই খাসতালুক আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে। আর অন্য সব দিনের মতো দরজার খিল তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে চাঁদ দেখে যায় সে। অবশ্য পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে। কাজেই চাঁদ ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে। চাঁদ দেখার ফাঁকে এক সময় কামিনী এসে ভাত-টাত দিয়ে যায়।

এ ক'দিনে শিবু এসে যা খবর দিয়েছে তা এই রকম। এখনও মানুষ চাঁদে রওনা হয়নি, তবে তার প্রস্তুতি চলছে। বার বার জানানো সত্ত্বেও নগেন স্যার আসেনি। শিবুকে সে জানিয়ে দিয়েছে, খুব শিগগিরই একদিন চলে আসবে।

এইভাবে চেনা ছকে দিন কেটে যেতে যেতে হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে যায়। আজ দুপুরে মেয়েপাড়াটা যখন ঘোর আলস্যে ঝিম মেরে আছে, সেই সময় বাইরে হইচই শোনা যায়। সাড়া পড়ে গেছে চারিদিকে। এখানকার বাসিন্দারা হঠাৎই যেন

ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সবাই একসঙ্গে বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু বলছে। ফলে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে নিচু ক্লাসের পুরনো কিছু বই নাড়াচাড়া করছিল ললিতা। সেগুলোর পাতা ওলটাতে ওলটাতে সে তার স্কুলের দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিল। বাইরে চেঁচামেচি শুনে খোলা দরজা দিয়ে তাকায়।

তার তক্তাপোষ থেকে মেয়েপাড়ার ভেতর দিকের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। মনে হল, কেউ যেন ওধারের দরজা দিয়ে ঢুকে উঠোনের ওপর দিয়ে সোজা রজনীর ঘরের দিকে গেল। টিয়া মাসি, টগর মাসি, মোহিনী মাসি এমনি কয়েকজনকে চকিতের জন্য দেখা গেল। তাদের চোখমুখ উত্তেজনায় চকচক করছে। বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ললিতা। এই দুপুরবেলায় অন্যদিন কোনওরকম চাঞ্চল্য বা ব্যস্ততা থাকে না। মেয়েপাড়ার বেশির ভাগ বাসিন্দাই পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কেউ কেউ গোলোকধাম কি লুডো-টুডো খেলে, কেউ বা সেলাই-ফোঁড়াই করে, কেউ কেউ স্রেফ গল্প করেই সময় কাটায়। হঠাৎ কে এমন আসতে পারে যাতে পাড়াটা এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে!

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। একটু পরেই রজনী ললিতার ঘরে চলে আসে। চাপা উত্তেজিত গলায় বলে, 'তাড়াতাড়ি ওঠ। তোর চুল বেঁধে দিই।'

বিস্ময়টা বহুগুণ বেড়ে যায় ললিতার। দুপুরবেলা সে কোনওদিন চুল বাঁধে না। বলে, 'কেন মা?'

এখন নষ্ট করার মতো অঢেল সময় হাতে নেই রজনীর। বলে, 'এট্টুস পরেই জানতে পারবি। ওঠ শিগগিরি।'

ললিতাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে একরকম টেনেই তুলে বসায়। তারপর ক্ষিপ্র হাতে পরিপাটি খোঁপা বেঁধে রুপোর কাঁটা গুঁজে দিয়ে বলে, 'এবেরে তোর সেই ময়ূর ছাপ দেওয়া নীল সিল্কের শাড়িটা করে ফেল।'

'এখন সিল্কের শাড়ি পরতে বলছ কেন? কোথাও যেতে হবে নাকি?'

'যা বলচি তাই কর।'

রজনীর গলায় এমন এক কঠোরতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে যাতে চমকে ওঠে ললিতা। এভাবে আগে আর কখনও কথা বলেছে কিনা মা, সে মনে করতে পারে না। অচেনা এক ভয় ঠাণ্ডা স্রোতের মতো তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটতে থাকে। এই ভয়টাই তাকে তাড়া করে ঘরের এক কোণে একটা বড় টিনের ট্রাঙ্কের কাছে নিয়ে যায়।

ট্রাঙ্ক খুলে ময়ূর ছাপ দেওয়া সিল্কের শাড়ি বার করে পরতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না ললিতার। তারপর নিজের আঁচলের খুঁটে মেয়ের মুখটি ভালো করে মুছিয়ে সযত্নে

তার চোখে কাজল টেনে, দুই ভরুর মাঝখানে গোলাপি একটি টিপ পরিয়ে রজনী বলে, 'আয় আমার সন্‌গে।'

মায়ের ঘরে সন্ধের পর কখনও ঢোকে না ললিতা কিন্তু দিনের বেলা যখন ইচ্ছে চলে যায়। কিন্তু এই ভরদুপুরে রজনীর সঙ্গে যেতে যেতে তার শরীর ভয়ানক কাঁপছিল।

রজনীর ঘরের সামনের দাওয়ায় এ পাড়ার কয়েকটি মেয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঈর্ষাকাতর লুব্ধ চোখে ঘরের ভেতর কী যেন দেখছে তারা। রজনী তাদের বলে, 'কেন একেনে ঝঞ্ঝট করছিস? পালধিমাশাই খেপে যাবে। যা বাপু, পরে আসিস।'

কথাগুলো শান্ত মুখে ভালোভাবেই বলেছে রজনী। কিন্তু সেভাবে নিল না মেয়েরা। যার নাম টগর তার জিভে একেবারে ক্ষুরের ধার। সে বলে, 'পালধিমাশায় ঘরে ঢুকেচে বলে দেমাকে আর পা পড়ে না। অ্যাকন মেয়ে দেকাচ্চিস! একদিন আমাদেরও বয়সে ছিল লা, গতরও ছিল।'

কী কথার কী উত্তর! টগরের জিভে ক্ষুর বসানো থাকলে রজনীর জিভেও একখানা শানানো ছুরি রয়েছে। সারা শরীরের রক্ত তার মাথায় চড়ে গিয়েছিল। নটবর পালধির মতো লোক তার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছে আর সেই কারণেই যে টগরেরা হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ইচ্ছে করলে খিস্তিখেউড় আর চিৎকারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত রজনী। কিন্তু ঘরের ভেতর এ তল্লাটের সবচেয়ে পয়সাওলা মানুষটি বসে আছে। তাদের মা এবং মেয়ের ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ নটবরের কৃপায় পুরোপুরি বদলে যাবে বলে রজনীর বিশ্বাস। আর মাত্র ক'টা তো দিন। তাই নটবরের সামনে নিজের স্বরূপটা আর বার করল না রজনী। শুধু জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে, ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'হিংসুটি শাঁকচুন্নির পাল, অ্যাকন ভাগ বুলচি, পরে তোদের নিকুচি করব।' তুলকালাম কাণ্ডটা আপাতত স্থগিত রাখল সে।

টগরেরা অবশ্য এক কথায় ভেগে যাবার পাত্রী নয়। গলা তিন পর্দা চড়িয়ে দেয় তারা, 'তোর বাপের জায়গা লা জলার পেত্নী যে বললেই ভাগব? এই আমরা দেঁড়িয়ে রইলুম। দেকি কী করতে পারিস।'

রজনী কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ঘরের ভেতর থেকে নটবর বাজখাঁই গলায় হুমকে ওঠে, 'কী হচ্ছে, অ্যাঁ? যাও তোমরা এখেন থিকে। যাও বুলচি।'

নটবরের হুঙ্কারে কাজ হয়। কেননা তার পয়সার এমন জোর যে তাদের কারও ওপর খেপে গেলে এখানে আর টিকতে হবে না। গলা নামিয়ে টগররা জানিয়ে যায়, 'ঠিক আচে, যাচ্চি। পরে এর শোধ তুলব।'

অর্থাৎ পরিপাটি হয়ে আসা ঝগড়াটা লাগবার মুখে বাধা পড়লেও একেবারে শেষ হয়ে যায় না। শুভক্ষণ দেখে আবার সেটা শুরু হবে।

টগররা গজর গজর করতে করতে চলে যাবার পর রজনী ললিতাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

তক্তাপোষের ধবধবে বিছানায় বসে ছিল নটবর পালধি। বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। মাংসল-চেহারা। কুচকুচে কালো গায়ের রং। চামড়া এই বয়সেও এমন টান টান, মনে হয় ঘামতেল মাখানো রয়েছে। বাবরি চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। চৌকো ভারি মুখ। চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু এবং লালচে। বোঝা যায়, এই ভরদুপুরেও কিঞ্চিৎ নেশা করে এসেছে সে।

হাত-পায়ের হাড় তার মোটা মোটা, সাঁড়াশির দাঁড়ার মতো শক্ত আঙুল। নটবরের পরনে এই মুহূর্তে পাতলা ফিনফিনে ধুতি আর কলিদার আদ্দির পাঞ্জাবি। ভেতরে জালি-কাটা গোলাপি গেঞ্জি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ হাতে সোনার ব্যাণ্ডে দামি ঘড়ি। গলায় সোনার চেইন, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, দু'হাতে কম করে গোটা সাতেক আংটি। পালধির নিচের পাটিতে দুটো আর ওপরের পাটিতে তিনটে দাঁত সোনা বাঁধানো।

নটবরকে এই প্রথম দেখল ললিতা। তবে তার কথা মা কিংবা এ পাড়ার বাসিন্দাদের মুখে অনেক শুনেছে। এখানে আগে আর কখনও নটবর এসেছে কিনা, সে মনে করতে পারল না। টগরদের কথায় কিছু একটা আঁচ করেছিল ললিতা। নটবরকে দেখার পর তার ভয়টা আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আতঙ্কে পেটের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকে।

মাথাটা ধীরে ধীরে ডাইনে থেকে বাঁয়ে হেলিয়ে ললিতাকে দেখতে দেখতে অকপট তারিফের ভঙ্গিতে নটবর বলে, 'বাঃ, বেড়ে তৈরি হয়ে উটেচে তো।' তার গলাটি ভারি নরম শোনাচ্ছে। একটু আগে টগরদের উদ্দেশে যে হুঙ্কার ছেড়েছিল সে যেন অন্য কেউ।

রজনীও খুবই নম্র গলায় বলে, 'সব ভগমানের দয়া পালধিমাশায়।'

ললিতার মুখ থেকে চোখ সরায় নি নটবর। পলকহীন তাকে দেখতে দেখতে বলে, 'বসো গ।'

ললিতার ওপর তার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেন কাজ করছিল না, সে থর থর কাঁপছিল। রজনী তার হাত ধরে তক্তাপোষের একধারে, নটবর যেখানে বসে ছিল তার থেকে খানিকটা দূরে বসিয়ে দিল।

নটবর ললিতার দিক থেকে চোখ ফেরায় না। লোভী মুগ্ধ চোখ তার ওপর আটকে রেখে রজনীকে বলে, 'লোকের মুখে খপর পাচ্চিলুম, আর তুমিও বলে

আসছেলে, মেয়ে তোমার বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেচে। ইস্কুলে ক' কেলাস যেন পড়েচে। অ্যামনটাই মনে মনে চাইছিলুম। পেটে দু-চারটে কালির অক্ষর ঢোকা ভালো। তাতে মেয়েমানুষের জেল্লা বাড়ে।' কথা বলতে বলতে নটবরের চোখ ধারাল ফলার মতো চকচক করতে থাকে।

নটবর যেমন ললিতাকে দেখছিল, রজনীর চোখ দুটোও তেমনি নটবরের মুখে স্থির হয়ে আছে। পালধির প্রতিটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে শ্বাসরুদ্ধের মতো। যেন এর ওপর তাদের মা-মেয়ের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

নটবরের কথাবার্তায় কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। লজ্জা-শরম বলে বস্তুটা তার হাজার মাইলের মধ্যে ঘেঁষতে পারে না। স্পষ্টাস্পষ্টি সে বলে, 'বড় খুশি হয়েচি তোমার মেয়েকে দেকে। ঘরে পরিবার আচে, বড় বড় ছেলেমেয়ে রয়েচে, তাদের বে' থা দিয়েচি, নাতিফাতি হয়ে গেচে। লইলে তোমার মেয়েকে পুরুত ডেকে মন্তর পড়ে বে' করে ফেলতুম। অ্যাকনও করতে পারি, কিন্তু ঘরের বে-করা মাগী আর ছেলেপুলেগুলান জবর হুজ্জুত করে বসবে। দশটা লোক আমায় চেনে। এই লিয়ে হুলুস্থুলু হলে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড।'

ললিতাকে বিয়ে করার কথাটা যে নটবর বলেছে তাতেই কৃতার্থ হয়ে যায় রজনী। তোষামোদের সুরে বলে, 'তা তো বটেই। আপনার মতো মানী লোকের লজরে যে লতি পড়েচে তাতেই তার জেবন সাত্থক।'

নটবর গলার স্বর খাদে নামিয়ে হেসে হেসে বলে, 'আমার জেবন যে সাত্থক হয়নি তা কে বললে? মেয়ে তোমার সোনার চেয়ে দামি গ রজনী দাসী। তা কাজের কথাটা এবেরে হয়ে যাক।'

শশব্যস্তে রজনী বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন পালধিমাশায়।'

'তোমার মেয়েকে বে' করতে না পারলেও আমার ঘরের বে'-করা মাগের থিকেও সুখে আর আরামে রাখব।'

'আপনার দয়া।'

'নদীর হেই ওপারে—' খোলা জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে নটবর বলে, 'একটা নতুন দোতলা বাড়ি করিয়েচি। ওখেনে ললিতাকে লিয়ে রাখব। দুটো ঝি, একটা চাকর, রাঁধাবাড়ার লোক সব থাকবে। ওধারে ইলকটিরি এসে গেচে। মাথার ওপর কলের পাখা, বোতাম টিপলে আলো, এসবেরও ব্যবোস্থা করে ফেলিচি। আর—'

ফুটিফাটা ঝরঝরে টিনের চালের এই ঘর, কালি-পড়া লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলো, উঠোনে আবর্জনা, দুর্গন্ধ এই নরক থেকে বহুদূরের সেই দোতলা বাড়ির আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ফিরিস্তি রজনীর কাছে স্বপ্নবৎ মনে হয়। সে জিজ্ঞেস করে, 'আর কী?'

আশায় এবং প্রবল উত্তেজনায় তার স্বর কাঁপতে থাকে।

'যার মেয়েকে মাথায় করে লিয়ে যাব তাব সন্‌গে সম্পক্কটা তো সোজা লয়।' বলে রজনীর দিকে ঘুরে বসে নটবর।

রজনীর হৃৎপিণ্ডের ভেতর একসঙ্গে হাজারটা ঢাক বেজে ওঠে যেন। সে তীব্র চাপা গলায় বলে ওঠে, 'আমার কথাই কি কইচেন পালধিমাশায়?'

'তা ছাড়া আর কার?'

উত্তর না দিয়ে অসীম আগ্রহে তাকিয়ে থাকে রজনী।

নটবর এবার বলে, 'তোমাব মেয়ে আমার পরিবার না হলেও পরিবারের থিকেও বেশি। সিদিক থিকে তুমি হলে গে আমার এক রকমের শাউড়ি। তা মেয়ে অমন আদর যত্নে থাকবে আর মা এই লরকে মুখ গুঁজে পড়ে রইবে তা কিন্তুন আমার মন থিকে মেনে লিচ্চে না। তাই ঠিক করেচি, এখেনকার পাট চুকিয়ে দিয়ে মেয়ের সন্‌গে তোমাকেও ওকেনে লিয়ে যাব। আমি তো আর সব্বোক্ষণ ও বাড়িতে থাকতে পারব না। ব্যবসা, সোমসার, এ সব সামলে তবে না তোমার মেয়ের ওকেনে যাওয়া। তুমি মাথার ওপর থাকলে আমি নিচ্চিন্তি থাকতে পারি।'

অসহ্য সুখে বুকের ভেতরটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে রজনীর। তার গলার ভেতর থেকে তোড়ে অজস্র কথা বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু সে শুধু বলতে পারে, 'আপনার দয়া পালধিমাশায়।'

'দয়ার কথা লয় গ নতুন শাউড়ি। য সত্যি তাই কইচি। তা আমার একটা ইচ্ছে আচে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন কী ইচ্ছে।'

'য্যাত তাড়াতাড়ি হয় তোমাদের লিয়ে যেতে চাই। পারলে দু-চারদিনের ভেতর।'

'কিন্তুন—' কথা শেষ না করে আচমকা থেমে যায় রজনী।

ভুরু কুঁচকে যায় নটবরের। সংশয়ের সুরে সে বলে, 'কিন্তুনটা আবার কী? তোমার ঝ্যানো আপত্তি আচে!'

'না না—' রজনী দু'হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'আপত্তি হবে কেন? এ তো আমাদের সৌভাগ্যি। তবে কিনা আপনার দয়ায় লতির লতুন জেবন শুরু হচ্চে। আমার বড্ড ইচ্ছে, আরম্ভটা এট্টা ভালো দিন দেকে হোক।'

'এই কথা?' নটবরের কপাল ফের মসৃণ হয়ে যায়। সে হেসে হেসে বলে, 'তা তোমার হ্যাকন মন হয়েচে ত্যাখন তা-ই হোক। মন্দিরে গিয়ে পুরুতমাশায়ের কাচ থিকে দিন ঠিক করে এসো। তবে—'

'তবে কী?'

'পুরুতমাশায়কে বলো, দিনটা ঝ্যানো কাচাকাচিই হয়। শুভ কাজ ফেলে রাকতে লেই।'

রজনী মুখ টিপে হাসে। নেহাত মুখ ফুটে নটবর তার সঙ্গে জামাই-শাশুড়ি সম্পর্ক পাতিয়েছে, নইলে বেশ রগরগে অশ্লীল ঠাট্টাই করে বসত। অতি কষ্টে মুখটাকে সামাল দেয় সে। শুধু বলে, 'আচ্চা।'

'তা হলে এখন আমি উঠি।' বলতে বলতে বিছানা থেকে নিচে নামে নটবর।

হঠাৎ রজনীর খেয়াল হয়, এতবড় মানুষটাকে, যে কিনা তাদের মা-মেয়ের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিয়েছে, সেভাবে আদর আপ্যায়ন করা হয়নি। সে-ও দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'না না, এই পেরথম এলেন। এট্টু মিষ্টিমুখ না করে গেলে—'

হাত তুলে রজনীকে থামিয়ে দিতে দিতে নটবর বলে, 'আজ থাক। এরপর তোমাদের হাতে কত খাব! খাওয়া কি পালাচ্চে নাকিন? দু'দিন পর খবর নেবো। ওর ভেতর ভালো দিন ঠিক করে রেকো।' দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে ললিতার দিকে তাকায়, 'চলি গ।'

বিছানার একধারে কাঠ হয়ে বসে ছিল ললিতা। প্রচণ্ড ঘামছে সে। মা তার সর্বস্বত্ব কার হাতে তুলে দিতে চলেছে, কেন তাকে স্কুল ছাড়িয়ে আনা হয়েছে, কেন বিনোদকে দিয়ে তাকে নোংরা নোংরা জঘন্য সব গান শেখানো হচ্ছে, আজ সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ভয়ে আতঙ্কে তার বুকের ভেতরটা চৌচির হয়ে যাবে যেন।

ওদিকে নটবর ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে সোজা মেয়েপাড়ার বাইরের রাস্তায় চলে যায়। সেখানে পুরনো মডেলের একটা দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেটায় উঠে পড়তেই ড্রাইভার স্টার্ট দেয়।

রজনী সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। নটবরকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে রজনী দেখে ললিতার দু-চোখ থেকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো ফোলা ফোলা এবং আরক্ত। ভীষণ কাঁদছিল সে।

রজনী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর মেয়ের পাশে বসে বলে, 'কী হয়েচে, কাঁদচিস কেন?'

মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ললিতা। মুখটা তার পেটের ভেতর গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে, 'আমাকে তুমি মেরে ফেল মা, মেরে ফেল।'

রজনীর বিস্ময় বেড়েই যায়। সে বলে, 'কী হল তোর, সেটা কইবি তো!'

'ওই রাক্ষসটার হাতে আমায় তুলে দিও না।'

রাক্ষসটা যে কে, বুঝতে অসুবিধা হয় না রজনীর। সে এতই হকচকিয়ে যায় যে কী বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে মেয়ের পিঠে হাত

বুলোতে বুলোতে বলে, 'কী বলচিস লতি! আমাদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি পালধিমাশায়ের লজরে পড়েচিস। সারা জেবন রানীর হালে থাকতে পারবি। লইলে আমাদের হাল হবে। খালি কষ্ট আর কষ্ট। দু বেলা দু মুঠো ভাতের জন্যে শ্যাল-শকুনদের হাতে শরীল তুলে দেওয়া।'

ভবিষ্যতের রঙিন সুখ-স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কান্না থামে না ললিতার, বরং সেটা আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

রজনী বলে, 'দেখ মেয়ের কাণ্ড। কোতায় আনন্দ করবে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে তা না, শুদু কাঁদাকাটি। অন্য মেয়ে হলে অ্যাতক্ষণে খুশির ঠ্যালায় হাওয়ায় উড়ে বেড়াত।'

মাকে দু হাতে আরও আঁকড়ে ধরে তার গায়ে অবুঝ বালিকার মতো মুখ ঘষতে ঘষতে ললিতা বলে, 'আমার সর্বনাশ করো না মা।'

আরও কিছুক্ষণ বোঝাবার পরও ললিতা যখন কোনও কথাই শুনতে চায় না, রজনী খেপে ওঠে। বলে, 'আমি তোর সব্বোনাশ করচি! কোতায় তোর সুখের জন্যে কত কষ্ট করে, কতদিন পেচনে লেগে থেকে পালধিমাশায়ের সন্‌গে ব্যাবোস্থা করলুম, আর তুই কিনা মড়াকান্না জুড়ে দিলি! মুখপুড়ি, ওলাউঠোর বেটি, নিজের আখেরটাও বোঝে না। কী মেয়েই যে গভ্ভে ধরেছিলুম! যা ওঠ, ওঠ এখেন থিকে—'

ললিতা চমকে ওঠে। রজনীর কোল থেকে মুখ তুলতেই সে মায়ের মারমুখী চেহারা দেখতে পায়। ভয়ে ভয়ে এক দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে। পাশের ঘর থেকে রজনীর ক্রুদ্ধ কর্কশ গলা ভেসে আসে, 'কেঁদে কেটে যতই পাড়া মাত কর না, আমি যা ঠিক করেচি তাই হবে।'

ললিতা উত্তর দেয় না। একটানা অনেকক্ষণ কান্নার পর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সেই জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সামনের রাস্তাটা সুনসান। এখন বেলা তেমন হেলে পড়েনি। রোদে যথেষ্ট তেজ রয়েছে, হাওয়াও বেশ গরম। যতদূর চোখ যায়, দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি এই সময়ে পাড়াটা নিঝুম হয়ে আছে।

ভেতরে ভেতরে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল ললিতা। মাকে সে ভালো করেই চেনে। যেমন জেদী তেমনই একগুঁয়ে। সে যা ঠিক করে সেখান থেকে এক চুল তাকে সরানো যায় না। নটবর পালধির হাতে সে তাকে তুলে দেবেই। ললিতা একবার ভাবে, এখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় পালাবে? সে যে পাড়ার মেয়ে, কোনও ভদ্র বাড়িতে তার আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া এই বয়সেই মোটামুটি জেনে গেছে, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের মতো মানুষ চারিদিকে ওত পেতে আছে। একবার তাকে একা পেলে সবাই ছিঁড়ে খাবে। অদ্ভুত এক হতাশা ললিতকে অস্থির, ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত করে তুলতে থাকে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল

খেয়াল নেই, হঠাৎ শিবুর ডাকে চকিত হয়ে ওঠে ললিতা। আজ দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে শিবুকে। সোজা স্কুল থেকেই সে যে আসছে সেটা বোঝা যায়। তার কাঁধ থেকে বই-খাতার ব্যাগটা ঝুলছে।

শিবু ঝড়ের গতিতে বলে যায়, 'জানিস লতি, সব ঠিক হয়ে গেছে। আসছে সপ্তাহে মানুষ চাঁদে চলে যাবে। নগেন স্যার বললে, এই ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে নাকি সাড়া পড়ে গেছে।'

অন্য দিন এই খবরটার জন্য প্রচণ্ড উৎসুক হয়ে থাকে ললিতা। মানুষের চন্দ্রাভিযান তার কাছে এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা যে, এ সম্পর্কে শিবুর প্রতিটি কথা শুনতে শুনতে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। আজ কিন্তু এ সব তার কানেই ঢুকছে না, বা ঢুকলেও কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না। চাঁদে মানুষ যাওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে একেবারেই তুচ্ছ এবং অর্থহীন হয়ে গেছে। শিবুর দিকে তাকিয়ে কিছু ভেবে নেয় সে। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে, 'হ্যাঁরে শিবু, নগেন স্যার যে আসবে বলেছিল, এখনও তো এল না!'

মানুষের চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে ললিতার আজ আদৌ উৎসাহ নেই। ফলে বেশ অবাকই হয় শিবু। সে বলে, 'কী জানি কেন এল না।'

'তুই ভালো করে বলেছিলি তো?'

ললিতার এখনও বড় আশা, নগেন স্যার এসে রজনীকে বললে নিশ্চয়ই মা আবার তাকে স্কুলে পাঠাবে। আর পড়াশোনা নতুন করে চালু হলে তাকে আপাতত নটবরের খপ্পরে পড়তে হবে না। এ সবই ললিতার ছেলেমানুষি চিন্তা কিন্তু এটুকু ছাড়া অন্য কিছুই এখন আর ভাবতে পারছে না। মা এতে রাজি না হলে, সে অবশ্য নগেন স্যারকে সব খুলে বলে তাকে বাঁচাতে বলবে। ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ভালোবাসে নগেন স্যার, নিজের ছেলেপুলে নেই, স্বামী-স্ত্রী মিলে দু'জনের ছোট্ট সংসার। ছাত্র-ছাত্রীরাই তার সব।

শিবু বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছি।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় তার। একটু উদ্বেগের গলায় বলে, 'জ্যানিস লতি, আজ একটা ভীষণ খারাপ খবর শুনলুম।'

'কী রে?'

'নগেন স্যার নাকি চলে যাবে।'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা একেবারে থমকে যায় ললিতার। জানালায় মুখটা প্রবল শক্তিতে চেপে ধরে আতঙ্কগ্রস্তের মতো বলে, 'চলে যাবে মানে? কোথায়?'

শিবু বলে, 'শুনলাম কলকাতায় বড় একটা স্কুলে হেড স্যার হয়ে যাবে।'

'কবে যাচ্ছে?'

'তা কিছু শুনিনি, তবে খুব শিগগিরই।'

বিকেলটা নরম মাযাবী আলোয় চারিদিক ভরে রেখেছিল। পলকে সব অন্ধকার হয়ে যায়। ললিতার মনে হয়, অগাধ সমুদ্রের সাঁতার-না-জানা মানুষের মতো সে ডুবে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর খানিক ধাতস্থ হয়ে একটা ঘোরের মধ্যে হাত বাড়িয়ে শিবুর কাঁধটা আঁকড়ে ধরে ললিতা। বলে, 'শিবু, তুই ভাই কাল নগেন স্যারকে যেমন করে পারিস ধরে আনবি।' বলতে বলতে তার গলা ভয়ানক কাঁপতে থাকে।

এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ করেনি শিবু। এবার তীক্ষ্ণ চোখে ললিতাকে দেখতে দেখতে চমকে ওঠে। তার চোখ ফুলে লাল হয়ে আছে, গালে চোখের জলের দাগ। বুক তোলপাড় করে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। ললিতার এমন অস্থির সন্ত্রস্ত এবং উন্মত্তের মতো চেহারা আগে কখনও দেখেনি শিবু । সে কিছুটা ভয় পেয়ে যায় যেন। আড়ষ্টভাবে জিজ্ঞেস করে, 'তোর কী হয়েছে রে লতি?'

প্রশ্নটার সরাসরি উত্তর না দিয়ে ললিতা বলে, 'সে তুই বুঝবি না। আমাকে বাঁচা শিবু।'

ললিতা যে খুবই বিপন্ন, সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তার বিপদটা কী ধরনের তা বলছে না। অথচ সে চায় শিবু তাকে বাঁচাক। ব্যাপারটা না জানলে কী করতে পারে সে? সব কিছু তার মাথায় জট পাকিয়ে যায়।

শিবু বলে, 'আমাকে খুলে না বললে—'

তাকে শেষ করতে না দিয়ে ললিতা বলে ওঠে, 'নগেন স্যারকে আনতে পারলে আমি বেঁচে যাব।'

বিমূঢ়ের মতো মুখ করে শিবু বলে, 'আচ্ছা, কাল স্কুলে গিয়ে প্রথমে টিচার্স রুমে চলে যাব। নগেন স্যারকে তোর কথা বলে তারপব ক্লাসে ঢুকব।'

পরদিন সত্যিই নগেন স্যারকে ছুটির পর সঙ্গে করে নিয়ে আসে শিবু। রোগা লম্বা চেহারা তার, নাকের নিচে ছাঁটা গোঁফ, চুল উষ্কখুষ্ক, গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। পরনে আধময়লা ধুতি আর ডবল কাফওলা ফুল শার্ট, শার্টটা আবার ধুতির তলায় গুঁজে দেওয়া। সেটার একটা বোতাম ভাঙা, আর দুটো বোতাম নেই, হাতা দুটো ঢল ঢল করছে। পায়ে পুরনো চপ্পল। চোখে নিকেল ফ্রেমের গোল চশমা। পোশাক-আশাকে কোনও পরিপাট্য নেই তার।

বেলা হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা জানালার পাশে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নগেন স্যারকে দেখে তার হৃৎপিণ্ড এমন লাফাতে থাকে, মনে হয়, বুকের ভেতরটা ফেটে চুরমার হয়ে যাবে।

নগেন স্যার জানে ললিতার আসল পরিচয়টা কী এবং সে কোন পাড়ায় থাকে। সস্নেহে জিজ্ঞেস করে, 'কী রে, আমাকে আসতে বলেছিস কেন?'

ললিতা বলে, 'মাকে বলে আমাকে ফের স্কুলে ভর্তি করে দিন। নইলে আমি

মরে যাব।'

নগেন স্যার ললিতার লেখাপড়ার আগ্রহ দেখে খুব খুশি। বলে, 'ঠিক আছে, তোর মাকে ডাক।'

ললিতা দৌড়ে গিয়ে রজনীকে ডেকে আনে। নগেন স্যারকে দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে যায় রজনী। তারপর ভক্তিভরে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে হাতজোড় করে বলে, 'আপনার মতো মানুষকে তো এই লরকের ভেতর ডেকে আনতে পারি না। দয়া করে বাইরে দেঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনাকে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে।' নগেন স্যার বলে, 'কথাটাই হল আসল। এখানে দাঁড়িয়ে বললেই হবে।'

'আমাকে ডেকেচেন কেন মাস্টের বাবা?'

'তোমার মেয়ের এমন পড়াশোনার মাথা আর বড় হবার ইচ্ছে, আবার তাকে স্কুলে পাঠাও। হেলাফেলা করে ওর আগ্রহটা নষ্ট করে দিও না।'

নগেন স্যারকে এই শহরের সবাই যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে। এমন নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসতে কেউ কখনও দেখেনি। তবে একটু খ্যাপাটে ধরনের। তার খ্যাতি এই মেয়েপাড়া পর্যন্তও এসে পৌঁছেছে। তাকে এক কথায় নাকচ করে দেওয়া যায় না।

রজনী বলে, 'আমরা কোন পাঁকে মুখ গুঁজে পড়ে আচি, আপনি সবই জানেন বাবা। আমাদের ঘরের মেয়েদের বেশি নেকাপড়া করে কী হবে? লতি যা দু-চার পাতা পড়েচে তা-ই ঢের।'

নগেন স্যার রজনীকে লেখাপড়ার মহিমা বোঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু রজনী ঠিকই করে ফেলেছে এসব একেবারেই কানে তুলবে না। কোনও মতেই ফের মেয়েকে স্কুলে পাঠাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার। বলে, 'মেয়েটাকে আর পড়ার কথা কইবেন না মাস্টের বাবা।'

'কী যে বল তার মাথামুণ্ডু নেই। দেখ ললিতার মা, আমি এখানে থাকলে জোর করে আবার ওকে স্কুলে নিয়ে যেতাম, কিন্তু আসছে সপ্তাহে কলকাতায় চলে যাচ্ছি। জানোই তো, আমার ছেলেপুলে নেই। তা দাও না ললিতাকে, কলকাতায় নিয়ে যাই। এত আগ্রহ নষ্ট হতে দিতে নেই। তোমার মেয়েকে ওর যতদূর ইচ্ছা পড়িয়ে তোমার কাছে ফেরত দেবো।'

রজনী আঁতকে ওঠে। জোরে জোরে দুই হাত এবং মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'না না মাস্টের বাবা, তা হয় না।'

'কেন, আমাকে অবিশ্বাস হচ্ছে?'

'না বাবা, আপনি আমাদের কাছে ভগমানের মতো।'

'তা হলে?'

রজনী সবিনয়ে বুঝিয়ে দেয়, তার মতো মেয়েমানুষের শেষ বয়সের বল ভরসা হল ললিতা। ওকে হাতছাড়া করলে রজনীকে না খেয়ে মরতে হবে। তাছাড়া তাদের সমাজেও কিছু 'রীত করণ' আছে, কিছু নিয়ম আছে, সেই অনুযায়ী ললিতার ব্যবসা শুরু করার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় লেখাপড়া শেখাবার জন্য নগেন মাস্টারের সঙ্গে তাকে কলকাতায় পাঠানো আদপেই সম্ভব নয়।

নগেন স্যারকে হতাশ দেখায়। দুঃখিত ভাবে সে বলে, 'তাহলে আর কী করা? আমি আর দিনকয়েক এখানে আছি। যদি তোমার মতিগতি ফেরে, দেখা করো। আচ্ছা চলি—' বলে আর দাঁড়ায় না, সামনের রাস্তা দিয়ে বরাবর পুব দিকে চলে যায়।

শিবু আগেই তাদের চায়ের দোকানে চলে গিয়েছিল। ললিতার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে যেন। নগেন স্যার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার শেষ আশাটুকুও যেন দপ করে নিভে যায়। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে যতদূর নগেন স্যারকে দেখা যায়, তাকিয়ে থাকে সে। আর রজনী ক্রুদ্ধ চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ঘরে চলে যায়। নগেন স্যারের মেয়েপাড়ার আসার পেছনে যে মেয়ের কারসাজি রয়েছে সেটুকু ধরে ফেলেছে সে।

আরও ক'দিন কেটে যায়। এর মধ্যে দু'টি ব্যাপার ঘটে গেছে। মানুষের চাঁদে যাবার দিন ঠিক হয়েছে। আর নটবরের সঙ্গে ললিতার নতুন জীবন যে শুরু হবে, শিবমন্দিরের পুরোহিত পাঁজি দেখে তার তারিখ এবং সময়ও জানিয়ে দিয়েছেন রজনীকে। আশ্চর্য দুটো ঘটনা ঘটবে একই দিনে। আর আজ সেই দিন। আজ বিকেলেই গাড়ি পাঠিয়ে মা আর মেয়েকে নিয়ে যাবে নটবর।

তৃতীয় আরেকটি ঘটনাও আজ ঘটার কথা। নগেন স্যার আজ সকাল ন'টার ট্রেনে এ শহর ছেড়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছেন। এই খবরটা দিন দুই আগে শিবু তাকে শুনিয়ে গিয়েছিল।

আজ ভোরে ললিতার ঘুম ভাঙিয়ে, নিজের হাতে তাকে স্নান-টান করিয়ে দামি সিল্কের নতুন শাড়ি ব্লাউজ সায়াটায়া দিয়ে রজনী বলে, 'এগুলো তাড়াতাড়ি পরে আমার সন্‌গে চল।'

নতুন এই সব পোশাক কাল বিকেলে পাঠিয়ে দিয়েছে নটবর, সেটা জানে ললিতা। বলে, 'কোথায় যাব তোমার সঙ্গে?'

রজনী সস্নেহে যা জানায় তা এইরকম। আজ নতুন জীবনে পা রাখতে চলেছে ললিতা। তার আগে নতুন পোশাক পরে শিবমন্দিরে পুজো দেওয়াতে নিয়ে যাবে

রজনী। দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে ললিতা যেন প্রার্থনা করে, সে যাতে রাজরাজেশ্বরী হতে পারে।

নগেন স্যার চলে যাবার পর পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল ললিতা। জীবনটা যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, এটাই সে মেনে নিতে শুরু করেছিল। শিবমন্দিরে যাবার কথায় বিদ্যুৎচমকের মতো তাব মাথায় কিছু খেলে যায়। একটি কথাও না বলে অতি বাধ্য মেয়ের মতো নতুন শাড়িটাড়ি পরে নেয়। মেয়ের সুমতি হয়েছে দেখে রজনী খুব খুশি।

মজা নদীর পারে শিবমন্দিরে পুজো দেওয়া হয়ে গেলে প্রথমে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বেশ দূরে মাটিতে মাথা রেখে পুরোহিতকে প্রণাম করে ললিতা। তারপর রজনীর পালা। সে মেয়েকে মন্দিরের বাইরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে বলে।

পুরোহিত তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর সঙ্গে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দু-একটা কথা বলতে চায় রজনী।

সুযোগটা যে এভাবে, এত সহজে আসবে ভাবতে পারেনি ললিতা। ক'দিন ধরেই মা তাকে চোখে চোখে রাখছে। যদি সে কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলে সেজন্য ব্যবসা বন্ধ করে ক'রাত সে মেয়ের কাছে শুয়েছে। হঠাৎ মা কেন হাতের মুঠো আলগা করল, কে জানে!

ললিতা মন্দিরের একটা পুরনো ঘড়িতে দেখেছে, এখন সোয়া আটটার মতো বাজে। সময়টা মাথায় রেখে, খুব সতর্ক ভঙ্গিতে মায়ের দিকে চোখ রেখে পা টিপে টিপে মন্দিরের বাইরে চলে আসে। মন্দির ঘিরে উঁচু পাঁচিল থাকায় মা এবং পুরোহিত ভবতারণ ভটচায আড়ালে পড়ে গেছেন। তাঁদের আর দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ললিতার ওপর অপার্থিব কিছু যেন ভর করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে দৌড়ুতে শুরু করে সে।

কতক্ষণ ছুটেছিল, ললিতার খেয়াল নেই। একসময় সে দেখে শহরের শেষ মাথায় রেল স্টেশনে পৌঁছে গেছে।

কলকাতার ট্রেনটা অভ্রান্ত নিয়মে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। কামরাগুলো ভিড়ে ঠাসা। একটু পরেই সেটা ছেড়ে দেবে। এই ট্রেনেই নগেন স্যারের কলকাতায় চলে যাবার কথা।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রতিটি কামরার জানালায় মুখ বাড়িয়ে ললিতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে, 'নগেন স্যার, মাস্টার মশাই—'

পরিচিত কণ্ঠের সাড়া মেলে না। ক্লান্ত, হতাশ এবং উদ্বিগ্ন হয়ে শেষ কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে একবার ডাকতেই নগেন স্যারের গলা ভেসে আসে, 'কে রে?'

ললিতা রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'আমি ললিতা।'

'দাঁড়া, দাঁড়া। আমি আসছি।'

একটু পর ভিড় ঠেলে দরজার কাছে এসে নগেন স্যার অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'কী ব্যাপার? তুই এখানে।'

ললিতা বলে, 'আমাকে রক্ষা করুন মাস্টারমশাই।' তার গলা কাঁপতে থাকে।

'কী হয়েছে?'

'সে কথা আপনাকে বলতে পারব না।' মাথা নিচু করে ললিতা বলে, 'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।'

নগেন স্যার হকচকিয়ে যায়। বলে, 'কিন্তু তোর মা?'

'মা আমাকে শেষ করে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। আপনি না নিয়ে গেলে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় ললিতা।

নগেন স্যার কিছু একটা আন্দাজ করে নেন। তারপর মনস্থির করে ফেলেন। দৃঢ়স্বরে বলেন, 'উঠে আয়।' বলে হাত বাড়িয়ে দেন।

চাঁদে মানুষ পৌঁছুবার আগেই ললিতা কলকাতার ট্রেনে উঠতে পারে।

(মানুষের প্রথম চাঁদে অভিযানের কথা মাথায় রেখে গল্পটি লেখা হয়েছে।)



শেষ যাত্রা

পড়ন্ত বেলায় উত্তুরে হাওয়ার মুখে কুটোর মতো লাট খেতে খেতে খবরটা নিয়ে এল লগা, 'সব্বোনাশ হয়ে গেচে গ মাসিরা—'

কলকাতা থেকে অনেক দূরে অখ্যাত এই মফস্বল শহরটার নাম মহারাজপুর। তার এক কোণে ওঁচা মেয়েমানুষদের যে সৃষ্টিছাড়া কলোনিটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে সেটা চকিত হয়ে উঠল।

কলোনি আর কি, একটা চৌকো উঠোন ঘিরে ফুটিফাটা টিনের চালের কোমর-বাঁকা সারি সারি সাতাশটি ঘর, সেগুলোর সামনে দিয়ে টানা বারান্দা। পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য ছাব্বিশটা মেয়েমানুষ এখানকার একটি করে ঘরের স্থায়ী বাসিন্দা। সাতাশ নম্বর ঘরটা এই কলোনির স্বত্বাধিকারিণী বা মালকিন কেষ্টভামিনীর।

মেয়েমানুষগুলোর বেশির ভাগেরই ফুল বা পাখির নামে নাম। তারা কেউ চাঁপা, কেউ জবা, কেউ মালতী, কেউ টিয়া, ময়না বা কোকিলা। বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের ভেতর। তাদের জীবনযাপনের স্পষ্ট ছাপ পড়েছে তাদের ক্ষয়াটে চেহারায়। ভাঙা গাল, চোখের তলায় চিরস্থায়ী কালির পোঁচ, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

শীতের বিকেল ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। এর মধ্যে মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। সূর্য ডুবতে আর দেরি নেই। হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতো পশ্চিমের আকাশ আরক্ত হয়ে আছে। কিন্তু কতক্ষণ আর, দেখতে দেখতে শীতের সন্ধে নেমে আসবে ঝপ করে। চরাচর ঢেকে যাবে হিমে আর অন্ধকারে।

এই মুহূর্তে উঠোনের মাঝখানে বিকেলের নিভু নিভু রোদের আঁচ গায়ে মেখে মেয়েমানুষগুলোর কেউ খোঁপা বেঁধে রুপোর কাঁটা গুঁজে দিচ্ছিল, কেউ ঠোঁটে রং ঘষে মুখে পাউডার আর সস্তা ক্রিম লাগিয়ে ক্ষয়ের চিহ্নগুলো ঢাকছিল। চেহারায় চটক না ফোটালে রাতের নাগরেরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

সন্ধে নামলেই লুচ্চা-মাতালেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে হানা দেবে। রাত যত বাড়বে, জমে উঠবে নরকের এই খাসতালুক। তারই প্রস্তুতি চলছে সারা বিকেল

ধরে।

মেয়েমানুষগুলো যেখানে বসে আছে সেখানে থেকে খানিকটা দূরে নিজের ঘরের সামনের দাওয়ায় বসে একা একাই সাপলুডো খেলছিল কেষ্টভামিনী। বেঢপ মাংসল চেহারা তার, একেবারে ঘাড়ে-গর্দানে ঠসা। গায়ের কালো রংটি যেন পালিশ করা, এমনই তার জেল্লা। চাকার মতো গোল মুখ, বড় বড় লালচে চোখ, থুতনির তলায় চর্বির তিনটি পুরু থাক। নাকে সোনার ফাঁদি নথ, কানে মাকড়ি, গলায় তেঁতুল পাতা হার। কেষ্টভামিনীর দাপটে গোটা মেয়েপাড়াটা সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে।

লগা ঘুণে-খাওয়া সদর দরজাটা পেরিয়ে উঠোনের মাঝ বরাবর চলে এসেছিল। ফের সে পাগলের মতো হাউমাউ করে ওঠে, 'এ কী হল গ!'

লগার গলার স্বরে এমন তীব্র আকুলতা ছিল যে সাতাশ জোড়া চোখ তার দিকে চকিতে ঘুরে তাকায়।

লগার বয়স উনিশ কুড়ি। রোগা ডিগডিগে পোকায়-কাটা চেহারা, গালে খাপচা খাপচা নরম দাড়ি, জট-পাকানো রুক্ষ চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেগুলোর সঙ্গে সাত জন্ম চিরুনি বা তেলের সম্পর্ক নেই। তার পরনে তালি মারা ফুলপ্যান্ট আর হাতকাটা ফতুয়া ধরনের জামা।

এখন যারা এ পাড়ার বাসিন্দা তাদের আগের জেনারেশানের একটি মেয়েমানুষ একদা লগাকে জন্ম দিয়েছিল। সেই গর্ভধারিণী কবেই মরে ফৌত হয়ে গেছে কিন্তু লগা এখানেই পড়ে আছে। তার মতো বেজন্মা বিষ্ঠার পোকাদের এই নরক ছাড়া যাবার জায়গাই বা কোথায়? চাঁপা, জবা, ময়না, টিয়া, এখানকার সবাই তার মাসি। দিনরাত সে তাদের ফাই-ফরমাশ খাটে, তার বদলে এককে দিন এককে জনের কাছে খেতে পায়। বারান্দা থেকে কেষ্টভামিনী বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই রে মড়াখেগো, অমন চেল্লাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে পষ্ট করে বল।'

লগা বলে, 'বাবামাশায় বুঝিন আর বাঁচবে নি গ মাসিরা, তেনার মুখ দে গ্যাঁজলা বারুচ্চে, চোখ উলটে গেচে।'

মুহূর্তে গোটা মেয়েপাড়াটা একেবারে ঝিম মেরে যায়। এমন যে জবরদস্ত কেষ্টভামিনী, যার গলার আওয়াজে এ পাড়ার ত্রিসীমানায় কাক চিল ঘেঁষে না, সে পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

লগা আরও ক'পা এগিয়ে কেষ্টভামিনীর কাছাকাছি চলে আসে। ব্যাকুলভাবে বলে, 'বসে থেকো নি গ কেষ্টমাসি, শিগগিরি চল। দ্যাকো যদিন বাবামাশায়রে বাঁচাতি পার।'

এতক্ষণে গলার স্বর ফোটে কেষ্টভামিনীর। সে শুধোয়, 'বাবামাশায়ের অমন

অবস্তা, তুই জানলি কী করে?'

'বা রে, বিকেল বেলা আমি ওনার ডাক্তেরখানা সাফ করতে যাই না?'

কেষ্টভামিনীর এবার খেয়াল হয়, এ পাড়ার মেয়েমানুষদের হাজার রকম হুকুম তামিল করার পর সকাল বিকেল, দু'বেলা বাবামাশায়ের ডাক্তারখানায় গিয়ে ঝেড়েমুছে সব ফিটফাট করে দেয় লগা, তার জন্য রাস্তার টিউবওয়েল থেকে কুঁজোয় ভরে জল নিয়ে আসে, কোনও কোনও দিন কেরোসিন কুকারে চাট্টি ভাতও ফুটিয়ে দেয়। আজ এবেলা গিয়ে বাবামাশায়কে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে চলে এসেছে।

কেষ্টভামিনী আর বসে থাকে না, ধড়মড় করে উঠে পড়ে। নিজের ঘরে ঢুকে টিনের তোরঙ্গ থেকে কিছু টাকা বার করে আঁচলে বেঁধে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে বলে, 'চল।'

অন্য মেয়েমানুষগুলো ততক্ষণে উঠোনের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে তারা কেষ্টভামিনীকে বলে, 'আমরাও যাব কেষ্টমাসি।'

আর কিছুক্ষণের মধ্যে এ পাড়ায় খদ্দেরদের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে। সারারাত শরীর বেচে মেয়েমানুষগুলো যা পায়, এলাকার মালকিন হিসেবে তার চার ভাগের এক ভাগ কেষ্টভামিনীর প্রাপ্য। এখন যদি ওরা তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, আজকের ব্যবসাটি একেবারে মাটি। ছাব্বিশটি মেয়েমানুষের রাতভর রোজগারের সিকিভাগ তো কম কথা নয়। মনে হচ্ছে আজ আর সে আশা নেই। অনেকগুলো টাকা পুরো বরবাদ।

অন্যদিন এ সময় কেউ বেরুবার কথা মুখে আনলে মাথায় আগুন ধরে যেত কেষ্টভামিনীর। চেঁচিয়ে, গালাগাল দিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত সে। কিন্তু বাবামাশায়ের কথা আলাদা। তার জন্য একদিন কেন, দশদিন ব্যবসা বন্ধ রাখা যায়। ওই লোকটার কাছে এ পাড়ার বাসিন্দাদের ঋণের শেষ নেই। তার সম্বন্ধে এমন একটা খারাপ খবর শোনার পর কেউ কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে?

কেষ্টভামিনী বলে, 'আচ্ছা, চল—'

মেয়েমানুষগুলো যে জামাকাপড়ে ছিল তাই পরেই, নিজের নিজের ঘরে তালা লাগিয়ে কেষ্টভামিনী আর লগার সঙ্গে বেরুতে যাবে, এমন সময় বাধা পড়ে। উটকো দু-একটা খদ্দের এর মধ্যেই দিশি মদ গিলে টং হয়ে হানা দেয়। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির তো বিনাশ নেই। এই জন্তুগুলো দিনরাতের বাছবিচার করে না।

একটা মাঝবয়সী লোক, তার নাম মহীন, ভারি থলথলে চেহারা, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, চোখের তলায় কালি, দৃষ্টি ঢুলুঢুলু এবং আরক্ত, এ অঞ্চলে একটি ছোট যাত্রাদলের মালিক, জড়ানো গলায় বলে, 'ই কী, মিছিল করে সব চললে

কুথায়!'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আজ আমাদের ক্ষেমা করেন মহীনবাবু, কাল আসবেন।'

মহীন চিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'শরীল তেতে উঠল আজ, আর চান করব কিনা কাল! মাইরি আর কী!'

তার সঙ্গী আরেকটা ক্ষয়াটে চেহারার লোক নেশার ঘোরে সমানে টলছিল। ডাইনে বাঁয়ে এলোমেলো পা ফেলে কোনও রকমে নিজেকে খাড়া রেখেছে সে। কেষ্টভামিনীর থুতনির কাছে হাত ঘুরিয়ে বলে, 'সোনামণি, যে দোকান খুলেচ তার ঝাঁপ বন্দ করা যায় না। কত ট্যাকা চাও অ্যাঁ? এই লাও।' বলে পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে হাওয়ায় নাচাতে থাকে।

কেষ্টভামিনীর মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু শত হলেও খদ্দের লক্ষ্মী, তাদের চটানো ঠিক নয়। যতটা সম্ভব শান্ত মুখে বলে, 'দয়া করে আজ আপনারা যান।'

মহীন ওধার থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যাব মানে! মোজ করার জন্যি এলাম, মেজাজটা চটকে দিওনি।'

এদিকে একটা নিরেট চেহারার লোক টগর নামে মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়, 'চল শালী, ঘরে চল।'

এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না কেষ্টভামিনী। তার ভেতর থেকে মেয়েপাড়ার জাঁদরেল স্বত্বাধিকারিণীটি বেরিয়ে আসে। আগুনখাকীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরেট লোকটার হাত থেকে টগরকে ছিনিয়ে নিতে নিতে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করতে থাকে, 'অ্যাই পুষ্প, অ্যাই টিয়া, তোরা হাঁ করে দেকছিস কী! লুচ্চো জানোয়ারগুলোনরে গলাধাক্কা দে বার করে দে।'

কেষ্টভামিনীর হুকুমটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েমানুষগুলো মহীনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। সেই সঙ্গে দুই পক্ষে চলতে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত কিছু গালাগালির আদানপ্রদান।

একদিকে চারটে নেশাখোর মাতাল, আরেক দিকে সাতাশটা মেয়েমানুষ। হোক মেয়ে, এত জনের সঙ্গে চারজন পারবে কেন? টেনে হিঁচড়ে টগরেরা তাদের বাইরে বার করে দিয়ে নিজেরাও বেরিয়ে পড়ে।

মেয়েমানুষদের এই পাড়াটা মহারাজপুরের শেষ মাথায়। এর বাঁ পাশ দিয়ে একটা মজা নদী বয়ে গেছে। নদীটার পারে শ্মশানঘাটা, পুরনো শিবমন্দির।

পাড়াটার ডান পাশ দিয়ে একটা খোয়া-ওঠা আঁকাবাঁকা রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটার দু'ধারে ধানকল, সুরকিকল, লেদ মেশিনের ছোটখাটো ক'টা কারখানা। আর আছে ধানচালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলো আড়ত। সেসব পেরিয়ে

গেলে একটা হেলে-পড়া পুরনো ঘরে 'ভুবন ফার্মেসি'। ঘরটার মাথায় টুটোফুটো টিনের চাল। দেওয়াল আর মেঝে অবশ্য পাকা, কিন্তু চুনবালি আর সিমেন্ট খসে খসে দগদগে ঘায়ের মতো দেখায়। রাস্তার দিকের দরজার মাথায় মান্ধাতার আমলের যে সাইনবোর্ডটা তেরছা অবস্থায় ঝুলে আছে, বছরের পর বছর জলে ধুয়ে এবং রোদে পুড়ে তার বেশির ভাগটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে, দু-চারটে অক্ষর ছাড়া আর কিছুই পড়া যায় না।

'ভুবন ফার্মেসি' যার নামে সেই ভুবন চক্রবর্তী হল কেষ্টভামিনীদের বাবামাশায়। এই ফার্মেসি বা ডাক্তারখানাটার পর খানিকটা জায়গা জুড়ে আগাছায় ভরা একটা উঁচুনিচু মাঠ। মাঠের ওপার থেকে শুরু হয়েছে মূল শহর। আসলে মহারাজপুরের সুখী সংসারী মানুষেরা মেয়েপাড়া আর 'ভুবন ফার্মেসি'র ছোঁয়াচ থেকে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। যারা কোনও বিশেষ কারণে ধানকল, সুরকিকল বা শ্মশানঘাটার দিকে চলে আসে, দ্রুত কাজ টাজ শেষ করে ফিরে যায়। এখানকার বিষাক্ত আবহাওয়ার ভাইরাস যাতে কামড় দিতে না পারে সেজন্য তাদের সতর্কতার শেষ নেই।

মেয়েপাড়া সম্পর্কে মহারাজপুরবাসীদের মনোভাব না হয় বোঝা যায় কিন্তু 'ভুবন ফার্মেসি'র ব্যাপারে কেন তাদের এত ঘৃণা, নোংরা জীবাণুর মতো কেন তারা ওটাকে এড়াতে চায়, সে কথা পরে।

কেষ্টভামিনীরা যখন 'ভুবন ফার্মেসি'তে এসে পৌঁছুল, সন্ধে নামতে শুরু করেছে। ক'টি লোক ফার্মেসির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিল, খুব সম্ভব ভুবন চক্কোত্তি সম্পর্কেই। ওদের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ।

কেষ্টভামিনী লোকগুলোকে মোটামুটি চেনে, এই অঞ্চলেরই ধানকল বা সুরকিকল-টলের মজুর। ওরা নিশ্চয়ই বাবামাশায়ের খবরটা পেয়ে ছুটে এসেছে।

এক পলক লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ডাক্তারখানায় ঢুকে পড়ে কেষ্টভামিনী এবং তার পেছন পেছন অন্য মেয়েরা।

ঘরটা বিরাট। মাঝখানে পর পর চারটে ওষুধ বোঝাই পুরনো আলমারি, সেগুলোর বেশির ভাগেরই পাল্লার কাচ নেই। সামনে টেবিল চেয়ার। টেবিলটার অবস্থা কহতব্য নয়, তার একটা পা আবার ভাঙা, কোনও রকমে জোড়াতোড়া দিয়ে সেটা খাড়া রাখা হয়েছে।

একটা ময়লা চিটচিটে চাদর দিয়ে টেবিলটা ঢাকা, তার ওপর ডাঁই-করা কাগজপত্র, স্টেথোস্কোপ, দোয়াত, কালি, ব্লাড প্রেসার মাপার মেশিন ইত্যাদি। এখানে বসেই রোগী দেখে থাকে ভুবন চক্কোত্তি। টেবিলের সামনের দিকে দুটো কাঠের বেঞ্চ। সেগুলো রোগীদের বসার জন্য।

ওষুধের আলমারির পেছন দিকে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। বাঁ দিকে একটা বড় তক্তাপোষে সর্বক্ষণ একটা তেলচিটে অনন্ত শয্যা পাতা থাকে। ভুবন চক্কোত্তি ওখানে শোয়। মোট কথা, এই ঘরখানা একসঙ্গে ভুবন চক্কোত্তির রান্নাঘর, শোওয়ার ঘর এবং ডাক্তারখানা।

ঘরের মাঝখানে একটা বেশি পাওয়ারের আলো জ্বলছিল। তার আলোয় দেখা গেল বাঁ ধারের তক্তাপোষটায় কাত হয়ে পড়ে আছে ভুবন চক্কোত্তি। তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ভারি চেহারা, গোল মাংসল মুখ। মাথার একটি চুলও কালো নেই। গালে সাত আট দিনের দাড়ি। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া।

লগা যা খবর দিয়েছিল তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। কেষ্টভামিনীরা তক্তাপোষের কাছে এগিয়ে এসে দেখল, ভুবনের চোখ আধবোজা, মুখ বাঁ দিকে খানিকটা বেঁকে গেছে আর গাল বেয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে।

দু'দিন আগেও মেয়েপাড়ায় গিয়েছিল ভুবন চক্কোত্তি। তখনও তাকে যুবকদের মত তাজা, টগবগে দেখাচ্ছিল। মেয়েদের সঙ্গে কত রগড় টগড় করল। কে ভাবতে পেরেছিল দু'দিনের মধ্যে তার এমন হাল হবে!

কেষ্টভামিনী অনেকখানি ঝুঁকে আস্তে আস্তে ডাকে'বাবামাশায়—বাবামাশায়—'

ভুবনের দিক থেকে সাড়া নেই।

কেষ্টভামিনী আরও বার কয়েক ডাকাডাকি করল। কিন্তু একইভাবে নিশ্চল পড়ে থাকে ভুবন। এই পৃথিবীর কোনও শব্দ তার কানে পৌঁছেছে কিনা বোঝা যায় না।

কেষ্টভামিনী এবার কাঁপা গলায় তার সঙ্গিনীদের শুধোয়, 'কী করি বল দিকিন?'

মেয়েমানুষগুলো শ্বাসরুদ্ধের মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে থেকে জবা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, 'দ্যাকো তো বাবামাশায়ের নাড়ি চলচে কিনা।'

ব্রাহ্মণ হলেও ভুবন চক্কোত্তিকে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তাদের ভয় বা সঙ্কোচ নেই। ভুবন নিজেই সেসব অনেক আগে ভাঙিয়ে দিয়েছে। কত বার মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে তার কি হিসেব আছে? তা ছাড়া রোগবালাই হলে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে তাকেও তো পরীক্ষা করতে হয়।

কেষ্টভামিনী ভুবনের হাতটা তুলে আঙুল দিয়ে নাড়ি টিপে ধরে। একবার মনে হয় তিরতির করে চলছে। পরক্ষণে মনে হয়, না, ওটা একেবারেই থেমে গেছে।

খুব সন্তর্পণে ভুবনের হাতটা বিছানায় নামিয়ে রেখে তার কপালে নিজের ডান হাতটা রাখে কেষ্টভামিনী। ভুবনের গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। এবার আরও ঝুঁকে তার ফতুয়ার বোতাম খুলে বুকের ওপর কান ঠেকিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'মনে লাগচে আশা আচে। বুকটা ধুকুর ধুকুর করচে।'

টগর বলে, 'বাবামাশায়রে বাঁচানোর জন্যি কিচু তো করা দরকার।'

প্রথম দিকটায় একটু দিশেহারা হয়ে পড়লেও নিজেকে সামলে নিয়েছে কেষ্টভামিনী। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়েপাড়ার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মালকিনটি, যে কোনও কারণেই সহজে বিচলিত হয় না, ভেঙে পড়ে না। বলে, 'আমি এক্ষুণি ডাক্তের ডেকে আনচি।' বলে অন্য মেয়েদের 'ভুবন ফার্মেসি'তে রেখে শুধুমাত্র জবাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে যায়।

ভুবনের ডাক্তারখানার পর আগাছাভর্তি ডাঙাটা পার হতেই একটা ফাঁকা সাইকেল-রিকশা পাওয়া গেল। জবাকে নিয়ে সেটায় উঠে কেষ্টভামিনী বলে, 'বাজার পাড়ায় চল।' মহারাজপুরের এক কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকলেও এ শহরের নাড়িনক্ষত্রের খবর তার জানা। বাজার পাড়াতেই রয়েছে এখানকার সবগুলো ডাক্তারখানা।

'ভুবন ফার্মেসি'র পর আগাছায় ভর্তি এবড়ো খেবড়ো ডাঙাটা পেরুলে ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়িঘর। সেখান থেকে আরও খানিকটা গেলে শহরের জমজমাট চেহারাটা চোখে পড়ে। মেয়েপাড়ার বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে বহুদূরে সুখী, ভদ্র, সংসারী মানুষদের নিজস্ব এই পৃথিবী, যেখানে কেষ্টভামিনীরা দূষিত জীবাণুর মতো অবাঞ্ছিত।

চলতে চলতে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা মনে পড়ছিল কেষ্টভামিনীর। সেই সময়টায় বর্ধমানের গাঁ থেকে তাকে ফুসলে বার করে নিয়ে এসেছিল তারই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। শহরে নিয়ে তাকে রানী করে রাখবে, পটের বিবির মতো সেজে গুজে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাবে সে, ইত্যাকার নানা রঙিন স্বপ্নে তাকে একেবারে জাদু করে ফেলেছিল সেই ফন্দিবাজ লুচ্চাটা। তার আগে হাজার হাজার যুবতী ঘোরের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যা করে বসে তা-ই করেছিল কেষ্টভামিনী। এমন এক ফাঁদে সে পা দিয়েছিল যেখান থেকে বেরিয়ে আর কোনও দিন বাড়ি ফেরা যায় না।

দিন কয়েক ফুর্তি টুর্তি লোটার পর মহারাজপুরের মেয়েপাড়ায় তাকে পৌঁছে দিয়ে সেই আত্মীয়টি উধাও হয়ে যায়। প্রথম প্রথম যা হয়, খুবই কান্নাকাটি করেছিল কেষ্টভামিনী, তিনদিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খায়নি। কতবার আত্মহত্যার চিন্তাটা তার মাথায় এসেছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু জীবন এক বিষম ব্যাপার। ধীরে ধীরে কবে যে মেয়েপাড়ার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, এতকাল পর আর মনে পড়ে না।

সেই পঁচিশ বা তিরিশ বছর আগে এখনকার মতো বেঢপ আর থলথলে ছিল না কেষ্টভামিনী। কালো হলেও চেহারাটা ছিল ছুরির ফলার মতো, এমন একটা চটক ছিল যে তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যেত না। তার মেয়েপাড়ায় আসার খবরটা চারপাশে আগুনের হলকার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজপুরের যত জঘন্য লুচ্চার পাল এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। তার ফল হল এই, বছরখানেকের ভেতর চাকা চাকা ঘায়ে ভরে গেল সারা শরীর।

সেই সময় মেয়েপাড়ার মালকিন ছিল প্রমদা। ভয়ঙ্কর জাঁদরেল মেয়েমানুষ। চিলের মতো ধারাল গলায় চেঁচিয়ে সে বলেছে, 'পারার ঘা লিয়ে আমার একেনে থাকা চলবে নি। খদ্দেররা জানতে পারলে এধার মাড়াবে নি। ব্যবসাটি পুরো লষ্ট। তাড়াতাড়ি যদিন সারাতে পারিস, থাকতে পাবি, লইলে দূর করে দুবো।'

কেষ্টভামিনীর তো বাড়ি ফেরার উপায় নেই। এই নরকেই তাকে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। কাজেই রোগ না সারালেই নয়। কিন্তু কোথায় ডাক্তার কোথায় বদ্যি, কিছুই জানত না সে। যে মেয়েরা তখন ছিল তাদের হাতেপায়ে ধরে বলেছে, যদি একজন ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু তার ওপর সবার ছিল ভীষণ হিংসে, পারলে ওরা তাকে ছিঁড়ে খেত। কেননা সে আসার পর খদ্দেররা কেউ আর ওদের দিকে তাকাত না। মুখ ঝামটা দিয়ে ওরা সাফ বলে দিয়েছিল, 'আমাদের কাচে মরতে এসিচিস কেন লা মাগী! যে লাগরেরা তোরে পারার ঘা দে পালিয়েচে তারা কুথায়? যা যা, তাদের কাচে যা।'

কেষ্টভামিনী বুঝতে পেরেছিল, ওদের কারও কাছেই সাহায্যের আশা-ভরসা নেই। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত সে একা একাই একদিন সকালে বেরিয়ে পড়েছিল। ধানকল, সুরকিকল, তেলকল, বড় বড় গুদাম আর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেছনে ফেলে আসল শহরে চলে গিয়েছিল সে।

এখনকার প্রায় কিছুই তখন চিনত না কেষ্টভামিনী। একে ওকে জিজ্ঞেস করে করে শেষ পর্যন্ত বাজার পাড়ায় এসে হাজির হয়।

সেই সময় মহারাজপুরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার ছিল ত্রৈলোক্য হালদার। দুর্দান্ত পসার তার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চৌকো মুখ, শুঁয়োপোকার মতো ভুরু দুটো সবসময় কুঁচকেই আছে। অত্যন্ত খেঁকুরে, রগচটা ধরনের লোক। তার ডাক্তারখানায় গিয়ে দাঁড়াতেই রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী চাই?'

কেষ্টভামিনী হালদারের মুখচোখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলেছে, 'ডাক্তারবাবু, আমার বড় ব্যারাম।'

ত্রৈলোক্য তাকিয়েই ছিল। মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের চেহারায় মার্কামারা একটা ছাপ থাকে। কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্রই বুঝে নিয়েছে, সে কোত্থেকে আসছে। তীব্র

ঘৃণায় তার ভুরু আরও কুঁচকে গিয়েছিল। গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে ত্রৈলোক্য চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'সক্কালবেলায় নরক দর্শন। যা যা, বেরো এখান থেকে।'

তবু দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টভামিনী। হাতজোড় করে কাতর গলায় বলেছে, 'ডাক্তারবাবু, তাড়ায়ে দেবেন না। রোগ না সারলে আমি মরে যাব।'

'যত সব নর্দমার পোকা! তোরা বেঁচে থেকে দুনিয়ার কোন উপকারটা হবে শুনি?' ডাক্তারখানার কমপাউণ্ডারকে ডেকে ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'মাগীটাকে লাথি মের বার করে ওই জায়গায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও।'

লাথি আর মারতে হয়নি, নিজেই বেরিয়ে এসেছিল কেষ্টভামিনী।

মহারাজপুরে তখন আরও চার পাঁচজন পাস-করা ডাক্তার ছিল। হালদারের অমন চমৎকার অভ্যার্থনার পরও তাদের সবার কাছে গেছে কেষ্টভামিনী কিন্তু সকলেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ্যার চিকিৎসা তারা করবে না।

ফলে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিল কেষ্টভামিনী। সেই সঙ্গে আতঙ্কিতও। যে রোগটি তার হয়েছে সেটা কতখানি মারাত্মক তা সে জানে। তবে কি বিনা চিকিৎসায় পচে গলে, যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে তাকে মরতে হবে? মাসি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ব্যারাম না সারালে পাড়ায় থাকতে দেবে না। যা ছোঁয়াচে রোগ, অন্যদের ধরলে আর দেখতে হবে না, মেয়েপাড়া উজাড় হয়ে যাবে। তাকে থাকতে দিয়ে মাসি ওইরকম কোনও ঝুঁকি নিতে পারে না। কিন্তু মেয়েপাড়া ছাড়তে হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে?

উদভ্রান্তের মতো মহারাজপুরের খোয়া-ওঠা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কেষ্টভামিনীর নজরে পড়ল, প্রকাণ্ড এক পুরনো দোতলা বাড়ির সামনের দিকের একটা ঘরের দরজার মাথায় টিনের সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা আছে, 'ভুবন ফার্মেসি'। তার নিচে ডাক্তার ভুবন চক্রবর্তী। বাংলাটা মোটামুটি পড়তে আর লিখতে পারত সে, তাই জানতে পেরেছিল ওটা ডাক্তারখানা।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কেষ্টভামিনী। আগের ডাক্তারখানাগুলোতে তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, ঠিক করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলে সে। বড় জোর অন্য জায়গার মতো এখান থেকেও তাকে বার করে দেবে, তার বেশি তো কিছু নয়।

কেষ্টভামিনী যখন এসব ভাবছে, সেইসময় ভেতর থেকে একটা ভারি গলা ভেসে এসেছিল, 'কে, কে ওখানে?'

ভারি হলেও কণ্ঠস্বরটি ভয়-ধরানো নয়। পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে

কেষ্টভামিনী বলেছে, 'আমি, আমি—'

ভেতরে ক'টা ওষুধের আলমারি, টেবিল চেয়ার। এক কোণে আধময়লা একটা পর্দা টাঙিয়ে তার ওপাশে রোগী দেখার ব্যবস্থা।

টেবিলের ওধারে যে ডাক্তারবাবুটি বসে ছিল তার বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। নাকের তলায় ঝুপো গোঁফ। পরনে গলাবন্ধ কোট আর ধুতি। ডাক্তারেব ডান পাশে একটা লোক, খুব সম্ভব তার কম্পাউণ্ডার। সেই সকালবেলায় রোগী টোগী ছিল না, ডাক্তারখানা একেবারে ফাঁকা।

ভুবন চক্রবর্তী পুরোপুরি পাস-করা ডাক্তার নয়। বাঁকুড়া না কোথায় যেন মেডিক্যাল স্কুলে বছর দুই যাতায়াত করেছিল। সেই পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এই বিদ্যেতেই কাজ চলে যেত। পাস-করাদের মতো পসার না হলেও রোগীটোগী কম হতো না তার ডাক্তারখানায়।

ভুবন বলেছিল, 'ভেতরে এস।'

ডাক্তারখানায় ঢুকে টেবিলের এপারেই মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে কেষ্টভামিনী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলেছে, 'আমারে বাঁচান বাবামাশায়।' কেন যে তার মুখ দিয়ে বাবামাশায় শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল, নিজেই জানে না। শুধু মনে হয়েছিল এই মানুষটির করুণা হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

ভুবন বলেছিল, 'আগে বোসো। তারপর বল কী হয়েছে তোমার।'

মেয়েপাড়ার বাইরের কেউ তাকে বসতে বলবে, কেষ্টভামিনীর কাছে এটা একেবারে আশাতীত। সেই সকাল থেকে যে লাঞ্ছনা আর ঘৃণা জুটেছে, তারপর ভুবন চক্রবর্তীর এই সদয় ব্যবহারে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটা চেয়ারে খুব জড়সড় হয়ে বসে মুখ নামিয়ে রেখে সে বলেছে, 'আমি কুথায়, কুন লরকে থাকি, লিচ্চয় বুঝতে পারচেন।'

বিব্রতভাবে ভুবন বলেছে, 'ঠিক আছে, ব্যারামের কথাটা বল।'

কোন বিষম রোগে তাকে ধরেছে, এরপর তার বিবরণ দিয়ে ব্যাকুলভাবে কেষ্টভামিনী বলেছে, 'আপনি ছাড়া আমাকে বাঁচাবার আর কেউ লেই বাবামাশায়।'

একটু চুপ করে থেকেছে ভুবন। বাজারের একটি মেয়ের চিকিৎসা করবে কি করবে না, সেটাই যেন ভেবে উঠতে পারছিল না।

উৎকণ্ঠায় শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল কেষ্টভামিনীর। সে বলেছে, 'বাবামাশায়, আপনার দয়া কি পাব না? রাস্তায় পড়ে পড়ে মরে যাব?'

কেষ্টভামিনীর শেষ কথাগুলো ভুবনকে যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল সে, বলেছিল, 'চিন্তা করিস না, আমি তোকে সারিয়ে

তুলব।' তুমি থেকে এক লহমায় তুইতে নেমে গিয়েছিল সে।

সেদিন থেকেই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কেষ্টভামিনীর গা ভর্তি ঘা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়েছিল ভুবন। ওষুধে কতটা কাজ হচ্ছে তা দেখার জন্য রোজ সকালে একবার করে ডাক্তারখানায় আসতেও বলেছিল। কৃতজ্ঞতায় দু'চোখে জল এসে গেছে কেষ্টভামিনীর। ধিক্কার, ঘৃণা আর লাঞ্ছনা ছাড়া তারা তো এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর কাছ থেকে কিছুই পায় না। ভুবনের সহানুভূতি তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে।

মাসখানেকের ভেতর রোগ সেরে গিয়েছিল কেষ্টভামিনীর। কিন্তু বাবামাশায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা থেকেই যায়। সারা রাত জন্তুর দল তার শরীরটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কামড়ে আঁচড়ে শেষ করে দেবার পর সকালে চান করে সে চলে আসত 'ভুবন ফার্মেসি'তে। ভেতরে ঢুকত না, বাইরে দাঁড়িয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে যেত।

এইভাবেই চলছিল।

খারাপ রোগ বেছে বেছে শুধু কেষ্টভামিনীকেই ধরবে, এমন কোনও কথা নেই। যে লুচ্চার পাল রাতে হানা দেয়, শুধু কেষ্টভামিনীরই না, অন্য মেয়েদের শরীরেও তারা বিষাক্ত বীজাণু ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ফলে অনিবার্য নিয়মে তাদের গায়েও একদিন না একদিন দগদগে পারার ঘা ফুটে বেরুতে থাকে।

রোগাক্রান্ত দিশেহারা মেয়েরা গিয়ে ধরে কেষ্টভামিনীকে, 'যে ডাক্তার তোরে সারায়ে দেচেন আমাদেরকে তেনার কাচে নে চল। যন্তন্নায় মরে যাচ্চি রে।'

এরাই একদিন ডাক্তারদের হদিস দিয়ে তাকে এতটুকু সাহায্য যে করেনি সেটা আর মনে করে রাখেনি কেষ্টাভামিনী। সে ওদের সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'তে নিয়ে গিয়েছিল। ভুবন তাদেরও ফিরিয়ে দেয়নি। বরং বলেছে, 'কেষ্টভামিনী যখন নিয়ে এসেছে তখন ভেবো না। ধরে নাও রোগ সেরেই গেছে।'

এইভাবে মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে ভাল রকমের সম্পর্ক হয়ে গেল ভুবন ডাক্তারের। কিন্তু অন্য দিকে প্রচণ্ড ধুন্ধুমার বেধে যায়। যে বাড়িটায় ভুবনের ডাক্তারখানা সেটা তার পৈতৃক আমলের। তার বাবা-মা বহুদিন আগেই মারা গেছে, স্ত্রীও বেঁচে নেই, তার ছেলেমেয়ে হয়নি। সে একেবারে ঝাড়া হাত-পা মানুষ। কিন্তু বাড়িতে ছিল সাত সাতটা ভাই। তারা বাজারের মেয়েদের নানা কুৎসিত রোগ নিয়ে রোজ আসাটা আদৌ পছন্দ করছিল না। এই নিয়ে অশান্তি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ভাইরা বলছিল; এই বিষ্ঠার পোকাদের বাড়িতে আনা চলবে না। ভুবনের জন্য এত বড় চক্রবর্তী-বংশ একেবারে অপবিত্র হয়ে গেল। শুধু তা-ই নয়, এরা নিয়মিত আসার কারণে তলায় তলায় আরও কত সর্বনাশ হয়ে গেছে কে জানে। কেননা

বাড়িতে যুবক ছেলেছোকরা তো কম নেই। তারা এইসব নোংরা ওঁচা মেয়েমানুষগুলোর ফাঁদে যে লুকিয়ে লুকিয়ে পা দিয়ে বসেনি তারই বা গ্যারাণ্টি কোথায়? চক্রবর্তীরা নিষ্ঠাবান সৎ ব্রাহ্মণ, তাদের শুদ্ধতা আর রইল না। বাড়িটা বাজারের মেয়েদের একটা কলোনি হয়ে উঠল। ওদের আর এখানে আসা চলবে না।

ভাইদের সঙ্গে গোলমালের ব্যাপারটা তখনই জানতে পারেনি কেষ্টভামিনী, জেনেছিল অনেক পরে।

যাই হোক, মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়া সম্ভব ছিল না ভুবনের পক্ষে। প্রথমত, এই দুঃখী অসহায় মেয়েগুলোর ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল তার। তার চেয়েও জোরালো কারণটা হল পয়সা। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ থেকে মহারাজপুরে এসে সে যখন ডিসপেনসারি খুলে বসল তখন এখানে পাস-করা ডাক্তার ছিল হাতে-গোনা তিন চারজন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সারা দেশ জুড়ে যে জনবিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করেছিল তার হাওয়া এসে লেগেছিল এই শহরেও। তা ছাড়া সে আমলের পূর্ব পাকিস্তান থেকে হু হু করে শরণার্থীর ঢলও নেমেছিল এখানে। অনিবার্য নিয়মে ডাক্তারের সংখ্যাও বেড়ে চলল। নতুন যেসব ডাক্তার এল তাদের নামের পাশে লম্বা ডিগ্রি। তাদের ছেড়ে রোগ সারাতে কেউ ভুবন ডাক্তারের কাছে আসবে কেন? তার হাতে রয়ে গেল কিছু গরিব গুর্বো, ধানকল সুরকিকলের মজুর আর মেয়েপাড়ার ওঁচা ক'টি মেয়েমানুষ। এদের, বিশেষ করে মেয়েমানুষগুলোর তার ওপর অগাধ আস্থা। তাদের আনুগত্যের ভেতর কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। বাঁচুক মরুক, ভুবনের হাতের ওষুধটি ছাড়া তাদের চলবে না। ভুবনেরও ওদের ছাড়া গতি নেই।

ভুবন ভাইদের বুঝিয়েছে, 'মেয়েগুলো ভাল রে, নেহাৎ কপালের ফেরে পাঁকে নামতে হয়েছে।'

ভাইরা বলেছে, 'বেশ্যা আবার ভাল! নচ্ছার পাপীর দল।'

'পাপী হয়ে কেউ জন্মায় না। ওদের এই অবস্থার জন্যে আমাদের সোশাল সিস্টেমটাই দায়ী।'

সমাজতত্ত্বের এসব গূঢ় ব্যাখ্যা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না ভাইদের। তাদের সাফ কথা, বাজারের মেয়েদের বাড়িতে আনা চলবে না। ডিসপেনসারিটা যদিও রাস্তার দিকে, তবু সেটা বাড়িরই একটা অংশ তো।

এই নিয়ে একদিন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। ভুবন চক্রবর্তী ঠিক করে ফেলল, ভাইদের সংস্রবে আর থাকবে না। বাড়ি থেকে ডিসপেনসারি তুলে নিয়ে সে চলে এল গুদাম ঘরগুলের কাছাকাছি একটা টিনের চালায়। সেই থেকে পঁচিশ তিরিশটা

বছর এখানেই কেটে গেল তার। মহারাজপুরের যে অংশে সুখী, ভদ্র, সামাজিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ মানুষেরা থাকে তার সঙ্গে ভুবনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তিরিশ বছর কম সময় নয়। এর মধ্যে মহারাজপুর যেমন বদলে গেছে তেমনি পরিবর্তন হয়েছে মেয়েপাড়াতেও। সেদিনের ছিপছিপে পাতলা গড়নের যুবতী কেষ্টভামিনী এখন থলথলে ভারি চেহারার মধবেয়সী মেয়েমানুষ এবং মালকিন। সে আমলের অন্য মেয়েরা বেশির ভাগই মরে হেজে সাফ। কেউ কেউ পাড়া ছেড়ে কোথায় চলে গেছে তার হদিস কেষ্টভামিনীরা রাখে না। পৃথিবীর কোথাও ফাঁকা জায়গা তো পড়ে থাকে না। অনিবার্য নিয়মেই নতুন জেনারেশানের মেয়েরা এসে গেছে।

এতগুলো বছর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মেয়েগুলোর পাশেপাশেই আছে ভুবন চক্রবর্তী। রোগ বালাইয়ের চিকিৎসা তো করেই, পুলিশ বা লুচ্চারা হামলা করলে সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায়। যেন দশ হাত দিয়ে মেয়েগুলোকে আগলে রেখেছে ভুবন। দুই প্রজন্ম ধরে, কেষ্টভামিনী থেকে এখনকার টগর বা টিয়া-ময়নাদের সে বাবামাশায়।

আগাছায় ভরা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে কখন যে কেষ্টভামিনীদের রিকশাটা মহারাজপুরের বাজারপাড়ায় চলে এসেছিল, খেয়াল নেই। এটাই শহরের সবচেয়ে জমকালো অংশ. তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই বাজারপাড়ার সঙ্গে এখনকার বাজারপাড়ার মিল সামান্যই। আগে বেশির ভাগই ছিল টিনের চালের ঘর, ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ দু-চারটে বেঢপ চেহারার একতলা কি দোতলা। এখন যেদিকে যতদূর চোখ যায় লাইন দিয়ে নতুন নতুন তেতলা আর চারতলা বাড়ি। সেগুলোর নিচের তলায় বিরাট বিরাট সব দোকান। কলকাতার ধাঁচে দুর্দান্ত সব শো-উইণ্ডো। কোনওটা টিভির, কোনওটা টেক্সটাইল মিলের। ওষুধের দোকান, রেস্তোরাঁ, ব্যাঙ্ক, ডাক্তারদের চেম্বার, সিনেমা হল, সব এখানেই। সারাদিন তো বটেই, অনেক রাত পর্যন্ত জায়গাটা গমগম করতে থাকে।

এখানকার সমস্ত কিছুই কেষ্টভামিনীর মুখস্থ। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই যে প্রথম এখানে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডাক্তারের খোঁজে ছুটে এসেছিল, তারপর কতবার এসেছে তার হিসেব নেই।

'রিলায়েন্স ফার্মেসি' নামে একটা বড় ডাক্তারখানার সামনে এসে রিকশা থামায় কেষ্টভামিনী। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ে।

ডাক্তারখানার সামনের দিকে সারি সারি কাচের আলমারি দিয়ে সাজানো ওষুধের দোকান, পেছন দিকে ডাক্তার হিরণ্ময় সেনের চেম্বার। হিরণ্ময়ের বয়স বেশি না,

চল্লিশের অনেক নিচে। কিন্তু এর মধ্যেই যথেষ্ট নাম করে ফেলেছে। উঠতি ডাক্তারদের মধ্যে তার পসার সবচেয়ে বেশি। সর্বক্ষণ তার চেম্বারে লাইন লেগে থাকে।

ওষুধের আলমারিগুলোর ডান পাশ দিয়ে একটা সরু প্যাসেজ চলে গেছে ভেতর দিকে। তার শেষ মাথায় রোগীদের জন্য ওয়েটিং রুম, তারপর দরজায় পবদা-লাগানো ডাক্তারের চেম্বাব।

ওয়েটিং রুমে ভিড় ছিল। সেখানে এসে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা কবার পর কেষ্টভামিনীর ডাক পডল।

বড় টেবিলেব ওধাব থেকে লম্বা ঝকঝকে চেহারার হিরণ্ময় ডাক্তার বলে, 'বলুন কী হয়েছে?'

দিনকাল এখন অনেক বদলে গেছে। তিবিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্র এই মহারাজপুরের ডাক্তাররা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখনকার ডাক্তাররা একেবারে অন্যরকম। রোগটা কার তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। টাকাটা কার কাছ থেকে এল—চোর, লুচ্চা না বেশ্যা, সে সম্বন্ধে তাদের দুর্ভাবনা নেই। ওদের কাছে রোগ সারিয়ে টাকা পাওয়াটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আর সব কিছুই অর্থহীন।

হাতজোড় করে কেষ্টভামিনী বলে, 'ডাক্তারবাবু আপনারে আমার সন্‌গে যেতি হবে। বাবামাশায় মরতি বসেচে, আপনি তেনারে বাঁচান।'

হিরণ্ময় হকচকিয়ে যায়, 'বাবামাশায় কে?'

ভুবন ডাক্তারের নাম বলে কেষ্টভামিনী কিন্তু নামটা আদৌ হিরণ্ময় আগে শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। আসলে ভুবন সেই যে মহারাজপুরের আদি এলাকা ছেড়ে ধানকল সুরকিকলের কাছে চলে যায়, তারপর এদিকে আর বিশেষ আসেনি। তার সঙ্গে এ অঞ্চলের যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহারাজপুরের ভদ্রপাড়ার মানুষজন তাকে মনে করে রাখেনি।

হিরণ্ময় ভুবন সম্পর্কে আর কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করে না। শুধু জিজ্ঞেস করে, 'তাঁকে দেখতে কোথায় যেতে হবে?'

কেষ্টভামিনী বলে, 'ওই যে ধানকল খড়কলগুলোন যেখেনে আচে সেখেনে—'

'এক্ষুণি বেরুতে পারব না। অনেক রোগী অপেক্ষা করছে, তাদের দেখতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। তারপর যেতে পারি।'

'আমরা বসচি ডাক্তারবাবু। আপনি কাজ সেরে লিন।'

'আমার ভিজিট কত জানা আছে?'

'না।'

'রোগীর বাড়ি গেলে চৌষট্টি টাকা নিই আর যাতায়াতের রিকশা ভাড়া।'

এতগুলো টাকা! বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে কেষ্টভামিনীর। পরক্ষণে মনে পড়ে, ভুবন চক্রবর্তী একদিন তার নতুন জীবন দিয়েছিল। শুধু তা-ই না, মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের জন্য নিজেদের বাড়িঘর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল। তার জন্য সামান্য ক'টা টাকা সে খরচ করতে পারবে না? তা ছাড়া কেষ্টভামিনী জানে, সুস্থ হবার পর ভুবন চক্রবর্তী হিসেব করে তার প্রতিটি পয়সা ফেরত দিয়ে দেবে। কারও কাছেই সে ঋণী হয়ে থাকতে চায় না।

কেষ্টভামিনী বলে, 'দেব ডাক্তারবাবু, আপনি যা কইলেন তা-ই দেব।'

এরপর ভুবন ডাক্তারের রোগের লক্ষণগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে কেষ্টভামিনীকে ওয়েটিং রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে হিরণ্ময়।

কিন্তু একঘণ্টা নয়, প্রায় ঘণ্টাদেড়েক বাদে কেষ্টভামিনীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে হিরণ্ময়। রাস্তায় এসে দুটো সাইকেল রিকশা নেওয়া হয়। সামনের রিকশায় ওঠে কেষ্টভামিনী আর জবা, পেছনেরটায় হিরণ্ময়, তার সঙ্গে ওষুধপত্রে বোঝাই ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগ। আগে আগে থেকে কেষ্টভামিনীরা হিরণ্ময়ের রিকশাটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

'ভুবন ফার্মেসি'তে যখন ওরা পৌঁছল, বেশ রাত হয়ে গেছে। এ পাড়ায় এমনিতে লোক চলাচল যেটুকু হয় তার বেশির ভাগটাই দিনের বেলায়। সন্ধের পর, বিশেষ করে শীতকালে জায়গাটা নির্জন হয়ে যায়। এখন তো একেবারেই নিঝুম।

লগার মুখে সেই পড়ন্ত বেলায় ভুবনের খবরটা পাওয়ার পর মেয়েপাড়া ফাঁকা করে যারা কেষ্টভামিনীর সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সেই টগর টিয়া ময়নারা এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকজন ভুবনের কাছাকাছি ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে আছে। তাদের মধ্যে লগাকেও দেখা যাচ্ছে। তবে ধানকল, সুরকিকল কি লেদ মেশিনের মজুররা আর নেই, তারা সন্ধের পরপরই চলে গেছে।

মেয়েমানুষগুলোর চোখেমুখে ঘোর উৎকণ্ঠা। কেষ্টভামিনী কখন ডাক্তার নিয়ে ফেরে সেজন্য তারা পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সাইকেল রিকশা থেকে নেমে কেষ্টভামিনী তাড়া লাগানোর সুরে লগাকে বলে, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর বাক্সটা লাবিয়ে নে আয়।'

হিরণ্ময় নেমে পড়েছিল। কেষ্টভামিনী তাকে সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'র ভেতর চলে আসে। পেছন পেছন মেডিক্যাল ব্যাগ নিয়ে আসে লগা এবং অন্য মেয়েরা।

যে মেয়েমানুষগুলো ভুবনকে ঘিরে বসে ছিল, হিরণ্ময়দের দেখে উঠে দাঁড়ায়।

হিরণ্ময় বলে, 'রোগীর ঘরে এত ভিড় কেন? আপনারা বাইরে যান।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আমিও যাব?'

'না। আপনি থাকুন।'

মেয়েরা বাইরে গিয়ে দরজার কাছে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুবনকে পরীক্ষা করতে করতে হিরণ্ময় বুঝে যায় মাবাত্মক ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। মুখের বাঁ দিকে আর শরীরের নিচের অংশটায় পক্ষাঘাতের সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট।

কেষ্টভামিনী শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে, 'বাবামাশায়ের কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

'স্ট্রোক।' বলেই হিবণ্ময়ের খেয়াল হয়, ইংরেজি শব্দটা বোধহয় বুঝতে পারবে না কেষ্টভামিনী। সোজা বাংলায় বুঝিয়ে দেয়, 'বুকের অসুখ।'

'বাঁচবে তো?'

'দু'দিন না কাটলে বলতে পারব না।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'বাবামাশায়রে বাঁচায়ে তোলেন ডাক্তারবাবু।'

হিরণ্ময় বলে, 'বাঁচা-মবা মানুষের হাতে নেই, তবে ডাক্তার হিসেবে চেষ্টা করতে পাবি। কিন্তু—'

'অনেক রকম পরীক্ষা করতে হবে রোগীর। তার ওপর ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশান, এ সব তো আছেই। প্রচুর খরচ।'

খরচের কথায় ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে যায় কেষ্টভামিনী। ঢোক গিলে বলে, 'কিরকম লাগবে যদিন বলেন—'

হিরণ্ময় জানায়, রোগীর যা হাল তাতে আজই দু-একটা পরীক্ষা করা দরকার। সেগুলো না হলে ভাল করে চিকিৎসা শুরু করা যাবে না। প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আপাতত শ'তিনেক টাকা চাই।

কেষ্টভামিনীর ঘরে জমানো টাকা নিশ্চয়ই আছে। তার থেকে শ'খানেকের মতো নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল তাতেই হয়ে যাবে। কিন্তু আরও তিনশো বার করাটা খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। ওই তিন শো'তেও যে হবে না, সেটাই হিরণ্ময় ডাক্তার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।

কেষ্টভামিনীর সঞ্চয় তো অফুরন্ত নয় যে ভুবনের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ যুগিয়ে যেতে পারবে। তা ছাড়া তারও ভবিষ্যৎ বলে একটা কিছু আছে। হাতের সম্বল ভেঙে ফেললে বিপদে পড়তে হবে।

কেষ্টভামিনী বলে, 'খরচার ব্যাপারটা আমাদের একটু ভাবতে দ্যান ডাক্তারবাবু।'

হিরণ্ময় বলে, 'তা ভাবুন। তবে এটা জেনে রাখুন, রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। যা করার আজই করে ফেলতে হবে কিন্তু।'

একটু চিন্তা করে কেষ্টভামিনী বলে, 'আজই আপনারে জানায়ে দেব।'

'আমি ন'টা পর্যন্ত চেম্বারে থাকব। এলে তার ভেতর আসবেন।'

'আচ্ছা।'

এবার ভুবনকে একটা ইঞ্জেকশান দেয় হিরণ্ময়। তারপর কয়েকটা ট্যাবলেট কেষ্টভামিনীকে দিয়ে বলে, 'এখন জ্ঞান নেই ভুবনবাবুর, জ্ঞান ফিরলে তিন ঘণ্টা পর পর একটা করে ট্যাবলেট খাইয়ে দেবেন। আর রাত্তিরে সবসময় ওঁর কাছে লোক রাখবেন। আরও খারাপ কিছু বুঝলে আমাকে খবর দেবেন। চেম্বারের ওপরেই দোতলায় আমি থাকি।'

কেষ্টভামিনী ঘাড় কাত করে বলে, 'দেব।'

হিরণ্ময় সাইকেল রিকশাটা বাইরের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। নিজের ফি, ট্যাবলেট ইঞ্জেকশানের দাম এবং রিকশাভাড়া নিয়ে একসময় চলে যায়।

যে মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ঘরে ডেকে এনে কেষ্টভামিনী শুধোয়, 'সবই তো শুনলি। অখুন কী করা?'

মেয়েরা চুপ করে থাকে।

কেষ্টভামিনী আবার বলে, 'আমার একলার পক্ষে এত বড় রোগের চিকিচ্ছা চালানো অসোম্ভব।'

কেউ উত্তর দেবার আগে জবা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, 'ট্যাকার জন্যি বাবামাশায় মরে যাবে? তুমি আমাদের কী করতে বল?'

তক্ষুণি কিছু বলে না কেষ্টভামিনী। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে শুরু করে, 'তোদের হাল তো জানি। তবু না বলে পারচি না। সব্বাই মিলে কিচু কিচু দিলে একজনার ওপর চাপটা পড়ে না। এদিকে বাবামাশায়ের পেরানটা বেঁচে যায়। অখুনি ভেবেচিন্তে দ্যাক কী করবি।'

অনেকক্ষণ মেয়েমানুষগুলো নিজেদের ভেতর চাপা গলায় আলোচনা করে নেয়। কেউ কি আর প্রাণ ধরে জমানো টাকায় হাত দিতে চায়! কিন্তু ভুবন চক্রবর্তীর কথা আলাদা। তার জন্য ওরা সব পারে।

ভিড়ের ভেতর থেকে টগর বলে ওঠে, 'আমি দেব কিছু ট্যাকা। আমারে বাবামাশায় যে ব্যারাম থিকে বাঁচায়েছিল তা কি কুনোদিন ভুলব! আমি বেঁচে থাকতি বিনি চিকিচ্ছায় বাবামাশায়রে মরতি দেব নি।' তার গলা আবেগে কাঁপতে থাকে।

টগরের আবেগ বিদ্যুৎগতিতে অন্য মেয়েদের মধ্যেও চারিয়ে যায়। তারা একসঙ্গে বলতে থাকে, 'ট্যাকার জন্যি ভেবো না মাসি। আমরাও দেব।'

কে কত দিতে পারবে, জেনে নেয় কেষ্টভামিনী। দেখা গেল সাতশো টাকার মতো পাওয়া যাবে। ঠিক হল, আপাতত এই দিয়েই ভুবন চক্রবর্তীর পরীক্ষা-টরীক্ষাগুলো শুরু হোক, পরে আরও টাকার দরকার হলে দেখা যাবে।

কেষ্টভামিনী বলে, 'তোরা তো কেউ ট্যাকা সংগে করে আনিস নি?'

মেয়েরা বলে, 'না। লগা খবর দিতেই তো তোমার সন্‌গে দৌড়ে চলে এলাম।'

'তা হল যা, নে আয়।'

টিয়া ময়নারা মেয়েপাড়ায় গিয়ে টাকা নিয়ে আসে।

কেষ্টভামিনী এবার আর নিজে হিরণ্ময় ডাক্তারের চেম্বারে গেল না, তিনশো টাকা নিয়ে জবা আর টিয়াকে পাঠিয়ে দিল। তারপর অন্য মেয়েদের উদ্দেশে বলে, 'ঘরগুলোন সব ফাঁকা পড়ে আচে। সবাই একেনে থেকে কী হবে? আমি তো রইচিই, দু-চারজন আমার সন্‌গে থাক। বাকিরা পাড়ায় ফিরে যা। লইলে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ঘরের তালা ভেঙে চেঁচেপুচে সব নে যাবে। ব্যবসাটি তো আজ একরকম মাটিই হল। যারা যাবি, দ্যাক যদিন দুটো পয়সা কামাই হয়।'

কিন্তু ভুবনকে এই অবস্থায় ফেলে একটি মেয়েও তাদের পাড়ায় ফিরে যেতে রাজি হল না। তারা এখানেই থেকে যাবে। রোগবালাই হলে কত রাত তো রোজগার বন্ধ থাকে। ধরা যাক, আজ তেমন কিছু একটা হয়েছে তাদের।

কেষ্টভামিনী বলে, 'তা না হয় থাকলি, কিন্তুন ঘরদোর পাহারা দেবার জন্যি কারুর না কারুর থাকা তো দরকার।'

অনেক পরামর্শের পর লগাকে পাঠানো হল। রাতটা সে মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের পার্থিব সম্পত্তিগুলি পাহারা দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জবা আর টিয়ার সঙ্গে হিরণ্ময় আবার 'ভুবন ফার্মেসি'তে এল। সঙ্গে সেই ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগটা তো রয়েছেই, তা ছাড়া এনেছে একটা বড় সুটকেশ। সুটকেশটা খুলে নানারকম যন্ত্রপাতি আর ফিতে বার করে ভুবনের হাতে পায়ে বুকে লাগিয়ে কী একটা কল চালিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লম্বাটে ফালি কাগজে উঁচু নিচু দাগ পড়তে লাগল। দমবন্ধ করে কেষ্টভামিনীরা সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় কাগজটা বার করে চোখের সামনে ধরে কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে হিরণ্ময়। তারপর বলে, 'কাল সকালে এসে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। রোগী যেমন শুয়ে আছে তেমনি থাকবে। নাড়াচাড়া করবেন না।'

কেষ্টভামিনী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসে হিরণ্ময়। তার ওই হাসিটাই বুঝিয়ে দেয়, ভুবনের অবস্থা আশাপ্রদ কিছু নয়।

ভুবনকে আরও একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে হিরণ্ময় চলে যায়। আর ভুবনের বিছানার চারপাশ ঘিরে মেঝেতে চুপচাপ বসে থাকে মেয়েমানুষগুলো। সেই দুপুরে খেয়েছে তারা, তারপর এতটা রাত হল। স্বাভাবিক নিয়মেই খিদে পাওয়া উচিত। কিন্তু খিদে তেষ্টার কোনও বোধই এখন তাদের নেই। মনে মনে তারা বিড় বিড় করতে থাকে,

‘হেই মা কালী, বাবামাশায়রে সারায়ে দাও। হেই মা—’

মাঝরাতে চারিদিক যখন আরও নিষুতি হয়ে যায়, অন্ধকারে আর কুয়াশায় যখন ডুবে যায় সমস্ত চরাচর, সেই সময় শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদল মাতাল লুচ্চা এসে হানা দেয় ‘ভুবন ফার্মেসি’তে। মেয়েপাড়ায় জবা টগরদের না পেয়ে তারা এখানে হানা দিয়েছে। সেই আদিম জৈব প্রবৃত্তি, তার তো বিনাশ নেই।

বেহুঁশ, রোগাক্রান্ত বাবামাশায়ের আরোগ্য কামনায় সাতাশটি মেয়েমানুষ তদ্গত হয়ে যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে তখন এই জন্তুগুলো এসে পড়ায় তারা মারাত্মক খেপে ওঠে। জানোয়ারেরা তাদের টেনে হেঁচড়ে মেয়েপাড়ায় নিয়ে যাবে, তারা যাবে না। এই নিয়ে মধ্যরাতের স্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে দু-পক্ষে তুমুল গালাগাল চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষগুলো আঁচড়ে, কামড়ে, লাথি মারতে মারতে লুচ্চার পালকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর বাকি রাতটা নির্বিঘ্নেই কেটে যায়।

সেই যে ভুবন চক্রবর্তী চোখ বুজে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে ছিল তার কোনও হেরফের ঘটেনি। জ্ঞান ফেরেনি তার, বরং মুখের বাঁ ধারটা আরও খানিকটা বেঁকে যেন শক্ত হয়ে গেছে।

মেয়েমানুষগুলো সারারাত কেউ দু’চোখের পাতা এক করে নি, পলকহীন ভুবনের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল।

ভুবনকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যায় কেষ্টভামিনীর। বার বার আবছাভাবে কেউ যেন জানিয়ে দেয় লক্ষণটা ভাল নয়। ভুবনের মুখের ওপর ঝুঁকে সে কাঁপা গলায় ডাকতে থাকে, ‘বাবামাশায়, বাবামাশায়—’

সাড়া নেই।

এবার ভুবনের বুকে কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠে কেষ্টভামিনী। শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে। দ্রুত হাত সরিয়ে অন্য মেয়েদের বলে, ‘আমি ডাক্তারবাবুর কাচে যাচ্চি।’

এই ভোরবেলায় রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কোথাও জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। রিকশার চিহ্নমাত্র নেই। অগত্যা একরকম দৌড়ুতে দৌড়ুতেই কেষ্টভামিনী বাজার পাড়ায় এসে হিরণ্ময় ডাক্তারের ঘুম ভাঙায়।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে হিরণ্ময় নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। সাত সকালে কেষ্টভামিনীকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘কী হয়েছে?’

কেষ্টভামিনী বলে, ‘আমার বড্ড ভয় করচে ডাক্তারবাবু। দয়া করে চলেন।’

‘রোগীর জ্ঞান ফিরেছিল?’

'না।'

কিছু একটা আন্দাজ করে নেয় হিরণ্ময়। আর কোনও প্রশ্ন না করে বলে, 'রাস্তায় গিয়ে দেখুন দুটো রিকশা পাওয়া যায় কিনা। আমি আসছি।'

এর মধ্যে রোদ উঠে গিয়েছিল। দু-চারটে রিকশাও বেরিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে হিরণ্ময় ডাক্তারকে সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'তে ফিরে আসে কেষ্টভামিনী।

ভুবনের গায়ে একবাব হাত দেয হিরণ্ময়, তারপর দ্রুত নাকের কাছে হাতটা এনে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াটি বুঝতে চেষ্টা করে। পরক্ষণে স্টেথোস্কোপ বুকে লাগিয়েই তুলে নেয়। তার মুখে হতাশা আর বিষাদের ছাপ ফুটে উঠতে থাকে।

সাতাশটি মেয়েমানুষের হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে গিয়েছিল। শঙ্কাতুর মুখে একদৃষ্টে তারা তাকিয়ে আছে হিরণ্ময়ের দিকে।

কেষ্টভামিনী একসময় রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

বিমর্ষ সুরে হিরণ্ময় বলে, 'কিছুই করা গেল না। ভুবনবাবু মারা গেছেন।'

'ভুবন ফার্মেসি'তে টিনের চালের প্রকাণ্ড ঘরটার ভেতর সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দমকা হাওয়ার মতো শোকের উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ে। সাতাশটি মেয়েমানুষ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এই শোকের পরিবেশেই কাগজে কী যেন লিখে কেষ্টভামিনীকে দিতে দিতে হিরণ্ময় বলে, 'এটা ডেথ সার্টিফিকেট। ভুবনবাবুকে সৎকার করতে নিয়ে গেলে শ্মশানে এটা লাগবে।'

আচ্ছন্নের মতো হাত বড়িয়ে সার্টিফিকেটটা নেয় কেষ্টভামিনী।

মেডিক্যাল বাগটা আজ আর খুলতে হয়নি। সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে হিরণ্ময় বলে, 'আচ্ছা চলি।'

আঁচলের গিঁট খুলে টাকা বার করতে করতে কেষ্টভামিনী বলে, 'আপনার ট্যাকাটা ডাক্তারবাবু—'

কী ভেবে হিরণ্ময় বলে, 'থাক। ওটা আর দিতে হবে না।' বলে চলে যায়।

এদিকে প্রাথমিক শোকের উচ্ছ্বাস কিছুটা থিতিয়ে এলে কেষ্টভামিনী বলে, 'এখন কী করা— হ্যাঁ রে মেয়েরা?' আসলে ভুবনের এমন আচমকা মৃত্যুতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। কী করবে, কী করা উচিত, ভেবে উঠতে পারছে না।

মেয়েমানুষগুলোর মনের অবস্থাও কেষ্টভামিনীর মতোই, বিহ্বলের মতো তার দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে।

বেলা ক্রমশ বাড়ছিল। সূর্য পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। গাঢ় কুয়াশা কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদে ভরে গেছে চারিদিক।

মৃত্যুর গন্ধ কিভাবে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়। সুরকিকল ধানকল আর বড় বড় গুদামের মজুরেরা একজন দু'জন করে 'ভুবন ফার্মেসি'র সামনে এসে জড়ো হতে থাকে। তাদের কেউ কেউ চাপা শব্দ করে কাঁদছিল, কেউ বা হাতের পিঠে চোখের জল মুছছিল। আসলে ভুবন চক্রবর্তীর মতো আপনজন তো তাদের কেউ ছিল না।

মেয়েমানুষগুলো মুহ্যমানের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে। কেষ্টভামিনী বলে, 'কী রে, তোরা চুপ করে আচিস কেন? কিচু বল।' বাইরে থেকে তাকে যতই জবরদস্ত মনে হোক, আসলে মানুষটা ভেতরে ভেতরে খানিকটা দুর্বল, বিশেষ করে মৃত্যু টৃত্যুর ব্যাপারে খুব অস্থির হয়ে পড়ে।

বয়স কম হলেও মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথা মুক্তোর। বয়স তিরিশ বত্রিশ। শ্যামলা চেহারার শান্তশিষ্ট মেয়েমানুষটি মেয়েপাড়ার অন্য বাসিন্দাদের থেকে একটু আলাদা। সে বলে, 'বাবামাশায়রে তো একেনে ফেলে রাখা যাবে নি, শ্মোশানে নে যেতি হবে। কিন্তুন—'

কেষ্টভামিনী বলে, 'কিন্তুন কী?'

'বাবামাশায়ের ভাইরা তো এই শহরে থাকে। এ সময়ে তেনাদের খবর না দিলে আমরা পাপের ভাগী হয়ে থাকব। তাছাড়া মুখে আগুন দেবার জন্যি নিজেদের লোক দরকার।'

এই কথাটা আগে মাথায় আসে নি কেষ্টভামিনীর। সত্যিই তো, শেষ সময়ে ছেলে, ভাই বা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের হাতের আগুনটুকু না পাওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। বাবামাশায় তাদের যতই কাছের মানুষ হোক, তার ভাইদের এই অন্তিম মুহূর্তে খবর দিতেই হবে। কেষ্টভামিনী বলে, 'ঠিক বুলেচিস। আমি নিজে যাব তেনাদের কাচে। কিন্তুন—'বলতে বলতে হঠাৎ দমে যায়।

'কী?'

'বাবামাশায়ের সন্‌গে ওনাদের তো কোনও সম্পক্ক ছিল না। অ্যাদ্দিন পর গিয়ে বুললে কি আসবে?'

'আমাদের দিক থেকে এট্টা কত্তব্য তো আচে। এলে এল, না এলে আর কী করব! মনকে বুঝোতে পারব, আমরা তিরুটি (ত্রুটি) করি নি।'

কাজেই একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রিকশায় করে বেরিয়ে পড়ে কেষ্টভামিনী। বহুকাল আগে সারা গায়ে পারার ঘা নিয়ে প্রথম যে বাড়িতে ভুবন চক্রবর্তীর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছিল, ভুবনের ভাইরা এখনও সেখানেই আছে।

মহারাজপুর মাঝখানের পঁচিশ তিরিশ বছরে অনেক বদলে গেছে কিন্তু ভুবন চক্রবর্তীদের পৈতৃক বাড়িটা সেই আগের মতোই আছে। ঠিক আগের মতো নয়,

আরও পুরনো এবং জীর্ণ হয়েছে। দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে যে ইট বেরিয়ে পড়েছে সেগুলোতে নোনা লেগে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে আছে। ওটা যে ভাগের বাড়ি, একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যায়। সর্বত্র অযত্ন আর উদাসীনতার ছাপ।

বাড়িটার কাছে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ে কেষ্টভামিনী। যেখানে একদা 'ভুবন ফার্মেসি' ছিল, এখন সেটা একটা লন্ড্রি। হয়তো ভুবনের ভাইরা ভাড়া দিয়েছে লন্ড্রিওলাকে।

ভয়ে ভয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়তে একটা মধ্যবয়সী থলথলে চেহারার লোক বেরিয়ে আসে। চোখমুখের যা ছাঁচ তাতে তাকে ভুবন চক্রবর্তীর ভাই বলে সহজেই শনাক্ত করা যায়।

কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্র ঘৃণায় লোকটির কপাল কুঁচকে যায়। কেষ্টভামিনী কোত্থেকে আসছে সেটা না বলে দিলেও চলে। মেয়েপাড়ার জীবনযাপনের চিরস্থায়ী ছাপ তো আর মুখ থেকে এ জন্মে তুলে ফেলা যাবে না।

লোকটি যে খুবই তেরিয়া মেজাজের সেটা তার গলা শুনেই টের পাওয়া যায়, 'কী চাই?'

বুক কাঁপছিল কেষ্টভামিনীর। হাতজোড় করে সে বলে, 'বাবামাশায় মারা গেচে।'

লোকটা খেঁকিয়ে ওঠে, 'কে বাবামাশায়?'

'ভোবন—ভোবন চক্কোত্তি মাশায়।'

লোকটা এবার চেঁচাতে গিয়েও থমকে যায়। এদিকে তার চিৎকার শুনে আরও কয়েক জন বাড়ির ভেতর থেকে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে মেজদা?'

লোকটা বলে, 'এই মাগীটা বলছে, দাদা নাকি মারা গেছে।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'তেনারে শ্মোশানে নে যেতি হবে। মুখে আগুন দেওয়ার জন্যি আপনার লোক দরকার। তাই—'

লোকটা অন্য ভাইদের সঙ্গে নিচু গলায় ফিস ফিস করে কী পরামর্শ করে নেয়। তারপর ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'বেশ্যার নাড়ি টিপে যে এতকাল বেঁচে ছিল তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যাও, ভাগো।'

'কিন্তু মুখে আগুন—'

কথা শেষ হবার আগে দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কেষ্টভামিনী কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে রিকশায় গিয়ে ওঠে।

'ভুবন ফার্মেসি'তে ফিরে এসে কেষ্টভামিনী সব জানালে অন্য মেয়েমানুষরা বলে,

'এখুন তা হলে উপায়?'

কেউ উত্তর দেয় না।

অনেকক্ষণ পর কেষ্টভামিনী বলে, 'আমি একটা কথা ভেবেছি।'

'কী?'

'কারোরে য্যাখন পাচ্চি না, বাবামাশায়ের মুখে আমরাই আগুন দেব।'

মেয়েমানুষগুলো ভীষণ চমকে ওঠে। টগর বলে, 'কিন্তুন বাবামাশায় যে বামুন।' অর্থাৎ তাদের কাছে ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি করার মতো মহাপাপ আর হয় না।

ভুবন চক্রবর্তীর ভাইদের কাছে যাবার আগে কেষ্টভামিনীর মধ্যে যে দুর্বলতা আর দিশেহারা ভাবটা ছিল সেটা এর মধ্যে অনেকখানি কাটিয়ে নিয়েছে সে। কেষ্টভামিনী জানায়, বামুন হোক আর যা-ই হোক, ভুবন চক্রবর্তী তাদের বাবামাশাই। জন্মটাই নেহাৎ দেয়নি, নইলে পিতার যাবতীয় কর্তব্যই অকাতরে পালন করে গেছে। মৃত্যুর পর মুখাগ্নি ছাড়া তার সৎকার হবে, তা ভাবা যায় না। মুখে সামান্য একটু অগ্নিস্পর্শের জন্য ভুবনের পরলোকের পথ দুর্গম হয়ে উঠুক সেটা একেবারেই চায় না সে।

মেয়েমানুষগুলোর দ্বিধা তবু কাটে না। তারা বলে, 'কিন্তুন—'

কেষ্টভামিনী বলে, 'লরকে তো ডুবেই আচি। বামুনের মুখে আগুন ঠেকিয়ে আর কত ডুবব! মরার পর আমাদের কী হবে, তা লিয়ে ভেবে কী হবে!'

মেয়েরা আর আপত্তি করে না।

কাজেই খেলো কাঠের সস্তা একখানা খাট আসে, সেই সঙ্গে ফুল, খই। সযত্নে খাটে তোলা হয় ভুবনকে।

আরও কিছুক্ষণ পর এ অঞ্চলের মানুষজন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে সাতাশটি ওঁচা মেয়েমানুষ খই ছড়িয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে খাটে শায়িত ভুবন চক্রবর্তীর নশ্বর দেহ কাঁধে তুলে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন দৃশ্য মহারাজপুরে আগে আর কখনও দেখা যায়নি।

শ্মশানটা শহরের শেষ মাথায় একটা মজা নদীর পাড়ে। সেখানে এসে ডোমকে দিয়ে চিতা সাজায় কেষ্টভামিনীরা। কাছাকাছিই থাকে শ্মশানের পুরুত নীলকণ্ঠ ভটচায। টগর গিয়ে তাকে ডেকে আনে।

একসময় মন্ত্র পড়ে সাতাশটি মেয়েকে দিয়ে ভুবনের মুখাগ্নি করায় নীলকণ্ঠ। তারপর ডোম, যার নাম জগা, চিতার আগুন ধরিয়ে দেয়।

ভুবনের দেহ এই পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর মেয়েমানুষগুলো নদীতে স্নান করে মেয়েপাড়ায় ফিরে যায়।

কয়েক দিন বাদে শ্মশানের লাগোয়া নদীর পাড়ে সকাল বেলায় শ্রাদ্ধের আসর বসে। সাতাশটি মেয়ে স্নান করে নতুন কপড় পরে, শুদ্ধ মনে জোড়হাতে আসর ঘিরে বসে থাকে।

সবার বড় বলে শ্রাদ্ধের অধিকারটা কেষ্টভামিনীর ওপরেই বর্তেছে। পুরুত নীলকণ্ঠ ভটচাযের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে মন্ত্র পড়ে যায়.......

'ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভবঃ

নমঃ আকাশস্থঃ নিরালম্বঃ বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ।

ইদং নীরমিদং—'

মন্ত্রোচ্চারণের একটানা গম্ভীর সুর সমস্ত চরাচরের ওপর ছড়িয়ে যেতে থাকে।

স্বপ্নের সীমা



বাজারের মাঝমধ্যিখানে ঠিক চৌরাস্তার ওপর ফটিককে নামিয়ে বাসটা চলে গেল।

কলকাতা থেকে বারো চোদ্দ মাইল উত্তরে এই শহরটার নাম রাজানগর। আর ফটিক যেখানে বাস থেকে নেমেছে সেটা এ শহরের সব চাইতে জমজমাট অংশ। অর্থাৎ চৌরাস্তাটাকে ঘিরে রকমারি দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, সিনেমা হল, গ্যারেজ, পাম্পিং স্টেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজনগরের মানুষ জায়গাটাকে বলে বাজার পাড়া।

এখন দুপুর। সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে। যেদিকে চোখ ফেরানো যাক, রোদের ছড়াছড়ি। কিন্তু সময়টা হেমন্তকাল, কার্তিক মাস শেষ হয়ে আসছে। তাই এখন রোদে জেল্লা নেই, আর তেমন করে তা গায়েও লাগে না। হেমন্তের এই রোদ বড় সুখদায়ক।

মাসখানেক আগে আশ্বিনের শেষাশেষি এবার পুজো গেছে। আকাশ তখন ছিল পালিশ-করা আয়নার মতো ঝকঝকে। কাচের ওপর ধুলোবালি জমলে যেমন দেখায়, আকাশটা এখন অবিকল তেমনি।

বাতাসে এর মধ্যে টান ধরতে শুরু করেছে। গাছের পাতারা সতেজ লাবণ্য হারিয়ে খসখসে হয়ে যাচ্ছে। দুরন্ত হানাদারের মতো শীত যে আসছে, চারপাশে তারই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

ফটিক বাস থেকে নেমে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ছ'ফুটের মতো টান টান পেটানো চেহারা। চওড়া কাঁধ, হাত জানু ছাড়িয়ে নেমে গেছে। মোটা মোটা মজবুত হাড়ের ফ্রেমের ওপর তার যে শরীর তাতে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। চুল ছোট ছোট করে একেবারে চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা। গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো, হাতের চেটো জুড়ে শক্ত শক্ত কড়া।

ফটিকের পরনে জাহাজি ক্রুদের মতো টাইট নীল ফুল প্যান্ট আর লম্বা লম্বা ডোরা দেওয়া শার্ট। পায়ে মোটা সোলের ক্যাম্বিসের জুতো। প্যান্ট-শার্ট দুটোই ময়লা, দোমড়ানো মোচড়ানো। তার কাঁধে দড়ি বাঁধা বেডিং আর হাতে ঝোলানো ঢাউস স্টিলের বাক্স।

জাহাজেই কাজ করে ফটিক। সে স্টোকার, দেড় শ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বয়লারে কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়াই তার কাজ।

চৌরাস্তার মোড়ে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক দেখছিল ফটিক। এ শহরের যত বাড়িঘর, অলিগলি, বস্তি, এমন কি প্রতিটি ধুলোর কণা তার চেনা, তবু সব কিছু নতুন নতুন মনে হচ্ছে।

কতকাল বাদে রাজানগরে ফিরল সে? ফটিকের পরিষ্কার মনে পড়ল, পাক্কা দুটো বছর। পুজোর আগের পুজোয় ঠিক বিজয়া দশমীর দিন খিদিরপুর ডক থেকে সে ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজে উঠেছিল। কোথায় প্যাসিফিক, কোথায় সুয়েজ, কোথায় মেডিটারেনিয়ান আর কোথায়ই বা ব্ল্যাক সি—দুটো বছর দুনিয়ার দরিয়ায় দরিয়ায় হানা দিয়ে আজই সকালে তাদের জাহাজ আবার খিদিরপুর ডকে ফিরে এসেছে।

জাহাজ থেকে নিজেকে 'রিলিজ' করিয়ে নিতে ঘন্টা তিন চারেক সময় লেগেছিল। তারপর ডকের কাছেই একটা পাঞ্জাবি হোটেলে কষা মাংস, তন্দুরি আর এক গেলাস লস্যি খেয়ে সোজা চলে এসেছে শ্যামবাজার খালপোলের কাছে, সেখান থেকে রাজানগরের বাস ধরেছিল।

বাজার পাড়ার এই চৌরাস্তাটা চারটে হাতের মতো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। একটা গেছে দক্ষিণে, নৈহাটি-কাঁচড়াপাড়ার দিকে। উত্তরেরটা কলকাতায়। পুবেরটা গেছে রাজানগর রেলস্টেশনে আর পশ্চিমেরটা নদীর দিকে। রাজানগরের পশ্চিমে গঙ্গা।

দুপুরে চারদিক ঝিম মেরে আছে। রাস্তায় লোকজন খুব কম। ফটিক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টোদিকে ঝাঁকড়ামতো বট গাছটার তলায় সাইকেল রিকশার জটলা। রিকশাগুলোকে সারি সারি দাঁড় করিয়ে রিকশাওলারা সিটে ঘাড় গুঁজে ঝিমুচ্ছে, কেউ কেউ অবশ্য সিটের তলার নিচু জায়গায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল।

ফটিক যাবে পশ্চিমের রাস্তায়। যেখানে যাবে, হেঁটে গেল কম করে আধ ঘন্টার মতো লাগবে। রিকশায় উঠলে অবশ্য হুস করে পাঁচ মিনিটে পৌঁছুনো যায়।

ফটিক একবার ভাবল, একটা সাইকেল রিকশা নেবে। পরক্ষণেই মতটা পাল্টে ফেলল। না, হেঁটেই যাবে। ভাবামাত্র পশ্চিমের রাস্তা ধরে সে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু দু পা যেতে না যেতেই কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'ফটকেদা, ফটকেদা—'

এদিক সেদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না ফটিক।

সেই গলাটা আবার শোনা গেল, 'এই যে গুরু, আমি এখেনে। একটু দাঁড়াও, আসচি—' বলতে বলতে উল্টোদিকের একটা চায়ের দোকান থেকে এক দৌড়ে যে বেরিয়ে এল তার নাম পেনো।

আসল নামটা কোনওকালে পানুগোপাল টৌপাল ছিল, লোকের মুখে মুখে অবহেলায় আর তাচ্ছিল্যে ওটা 'পেনো' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পেনোর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো। সারা গায়ে মাংসের চাইতে হাড় বেশি। কাঁধ-কণ্ঠা-কনুই, যে দিকেই তাকানো যাক, গজালের মাথার মতো হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে। ভাঙা চোয়াড়ে গাল, মাথায় জটপাকানো ঝুপসি চুল, মুখময় খাড়া খাড়া দাড়ি পেখম মেলে আছে। ঘোলাটে চোখের তলায় শ্যাওলার মতো কালচে দাগ। পেনোর সমস্ত শরীর যেন গাঁট-পাকানো ঝুনো বাঁশ। পোড়া পোড়া কালো ঠোঁট, পোকায়-খাওয়া ট্যারাবাঁকা দু'পাটি দাঁত। সেই দাঁতের ওপর বাসি রক্তের মতো পানের স্থায়ী ছোপ। পেনো দিনরাত পান চিবোয়।

তার পরনে চিটচিটে ঠেটি ফুলপ্যান্ট আর বুকখোলা টি-শার্ট। প্যান্টটার ঝুল এত ছোট যে হাঁটুর তলায় খানিকটা নেমেই শেষ। তা ছাড়া দারুণ টাইটও, ওটা খুলতে গেলে নির্ঘাৎ সঙ্গে এক পর্দা চামড়া ওঠে আসবে।

ফটিক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে পেনোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছিল।

পেনো দাঁত বার করে হাসল, 'ফটকেদা আমায় চিনতে পারছ না? আমি তোমাদের পেনো মাকড়া গো।'

ফটিকও হাসল, তারপর অকথ্য একটা খিস্তি দিয়ে বলল, 'শালা তোমায় চিনব না!'

'যেমন করে তাকিয়ে ছিলে আমি তো ঘাবড়েই গেছলাম। ভাবলাম, গুরু বুঝি আমায় ভুলেই গেছে।'

ফটিক দাঁত বার করে বলল, 'ব্লাডি ব্যাস্টার্ড।' এটা তার আদর আর খুশির প্রকাশ।

চোখ গোল করে রগড়ের একটা ভঙ্গি করল পেনো, 'উরি ব্বাস, গুরু ইংরিজিতে খিস্তি ঝাড়ছে গো—'

ফটিক আগের কথার ছুতো ধরে বলল, 'জন্মে থেকে ওই মদনা-মার্কা চেহারা দেখছি, একবার দেখলে ও চেহারা ভোলা যায়! এ জন্মে তোমায় আমি ভুলছি না।'

'যা বলেছ মাইরি! একখানা চেহারা যা করেছি, পুন্নিমের চাঁদ গো—'

আলতো করে পেনোর পায়ের গোছে একটা লাথি কষিয়ে দিল ফটিক, 'পুন্নিমের চাঁদ! ধর শালা এটা—হাতের বাক্সটা পেনোর দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ব্যস্তভাবে বাক্সটা হাতে ঝুলিয়ে পেনো জিভ কাটল, 'এ হে-হে, একদম খেয়াল ছিল না। আমি থাকতে তুমি মাল বইছ! দাও—দাও, ওটা দাও—' ফটিকের কাঁধের বেডিংটা দেখিয়ে দিল পেনো।

'থাক থাক, অত ভক্তি দেখাতে হবে না।' ফটিক বলতে লাগল, 'রাস্তায় ল্যাম্প পোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে, এখন চল—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চল—'

পশ্চিমের রাস্তা ধরে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে পেনো বলল, 'অনেক দিন পর তোমায় দেখলুম ফটকেদা—'

'হুঁ—'

'এবার কদ্দিন পর যেন রাজানগর এলে?'

'দু'বচ্ছর।'

'অ্যাদ্দিন সেই জাহাজে জাহাজেই ঘুরছিলে?'

'হুঁ—'

একটু ভেবে নিয়ে পেনো বলল, 'তোমাদের জাহাজ কবে কলকাতায় ফিরল?'

ফটিক বলল, 'আজই—সকালবেলা।'

'দু'বচ্ছরে অনেক দেশ ঘুরলে, না?'

'হুঁ—'

পেনো বলতে লাগল, 'বেশ আছ মাইরি ফটকেদা—'

ঘাড় ফিরিয়ে ফটিক জিজ্ঞেস করল, 'কিরকম?'

'জাহাজে চাকরি জুটিয়ে সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছ। আর আমি শালা রাজানগরের বাইরে কোনওদিন বেরুতেই পারলাম না। বড় জোর কলকাতা পর্যন্ত আমার দৌড়—'

গলার ভেতর ফটিক অস্পষ্ট একটা শব্দ করল।

পেনো আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ফটিক তার আগেই বলে উঠল, 'রাজানগরের খবর টবর বল—'

'নতুন খবর কিছু নেই। দু'বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলে ঠিক তেমনিই চলছে। তবে যত দিন যাচ্ছে এখানে লোকজন হুড়হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে।'

'তুই আজকাল কী করছিস?'

এক হাতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে পেনো বলল, 'যা করতাম—'

ফটিক বলল, 'তার মানে সেই মেয়েমানুষের কারবারই চালাচ্ছিস?'

'তুমি তো সবই জানো ফটকেদা—' দাঁত বার করে হাসতে লাগল পেনো।

ফটিক বলল, 'ব্লাডি, সান অফ বিচ।' চলতে চলতেই পেনোকে আরেক বার লাথি কষাল সে।

পেনো হাসছিলই। বলল, 'জাহাজের চাকরিতে ঢুকবার পর তোমার গুরু খুব উন্নতি হয়েছে।'

ফটিকের চোখমুখ কুঁচকে গেল, 'কেমন?'

'ইংরেজি ছাড়া এখন আর খিস্তিই ঝাড়ো না—'

'শালা খচড়া—' ফটিক চটে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল।

কথায় কথায় বাজারপাড়া পেরিয়ে ওরা অনেকটা চলে এসেছিল।

এখন রাস্তার দু'ধারে পুরনো আমলের বাড়িঘর, কল-কারখানা, বস্তি। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা।

রাজানগর কারখানা শহর। এখানে নানা ধরনের কারখানা—কাচকল, চটকল, স্টিল রোলিং মিল, ফাউন্ড্রি, রঙের কল। মাথার ওপরে তাকালে দেখা যাবে অগুনতি লম্বা চিমনি আকাশের গায়ে বিঁধে রয়েছে।

কথা বলতে বলতে চারদিক দেখছিল ফটিক। শহরটা দু'বছর আগের মতোই আছে। পরিবর্তনের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ চমকে দেবার মতো দু-চারটে নতুন ডিজাইনের ঝকঝকে বাড়ি আর নতুন একটা সিনেমা হল 'ইন্দ্রাণী টকিজ' চোখে পড়ল।

হেমন্তর নির্জীব রোদ গায়ে মেখে দুপুরের নিরিবিলি রাস্তা ধরে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল ফটিকের, খুব ভাল লাগছিল।

বাজারপাড়াটা পেরিয়ে আসার পর থেকেই এক ঝাঁক পাখি সঙ্গ নিয়েছে। মাথার ওপর তারা উড়ছিল আর টুই টুই করে সমানে ডেকে যাচ্ছিল।

ফটিক ডাকল 'অ্যাই পেনো—'

পেনো তক্ষুণি সাড়া দিল, 'বল—'

'পঞ্চাননতলায় আমার সেই ঘর দুটো আছে রে?'

'না গুরু—'

ফটিক চমকে উঠল, 'নেই! বলিস কিরে?'

পেনো বলল, 'গেল বছর দারুণ ঝড়ফড় আর বর্ষা গেল না? তাতেই পড়ে গেছে।'

'তোকে না বলে গিয়েছিলুম মাঝে মাঝে আমার ঘর দুটো দেখে আসবি।'

'ফাঁক পেলেই তো দেখতুম। কিন্তু তুমিই বল ফটকেদা, ঝড়ে যদি ঘর শুয়ে পড়ে আমি শালা কী করতে পারি? চাল মাথায় করে স্ট্যাচু হয়ে তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।'

ফটিক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ঘর নেই। তা হলে থাকব কোথায়?'

পেনো তক্ষুণি বলল, 'থাকবার জায়গার যেন অভাব। জাহাজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে কত থাকো আমার জানা আছে। পঞ্চাননতলায় আর যেতে হবে না।'

'তবে কোথায় যাব?'

'তুমি মাইরি বড্ড লকড়াবাজি করছ ফটকেদা। রাজানগর এসে বেশির ভাগ সময় থাকো কোথায়?'

'এই দুপুর বেলা মেয়েপাড়ায় ঢোকাতে চাইছিস মাকড়া?'

'হে-হে গুরু সগ্‌গে যাবে, তার আবার দুপুর-সকাল কী।' বলতে বলতে চোখ টিপল পেনো।

খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'চল শালা, তোর সঙ্গে সগ্‌গেই যাই—'

পঞ্চাননতলায় যেতে হলে ডান দিকের একটা রাস্তা ধরতে হয়। ওরা সেদিকে গেল না, সোজা হাঁটতে লাগল।

ফটিক আবার কী বলতে যাচ্ছিল, আচমকা কী যেন মনে পড়ে যেতে পেনো চেঁচিয়ে উঠল, 'এ হে-হে-হে...'

'কী হল রে, গলার ভেতর ঘোড়ার ডাক ডাকছিস যে?'

'একটা খবর দিতে একদম ভুলে গেছলাম ফটকেদা।'

'কী খবর?'

জ্বলজ্বলে চোখে ফটিকের দিকে তাকিয়ে খুব উৎসাহের গলায় পেনো বলতে লাগল, 'মেয়ে পাড়ায় দারুণ একটা ছুঁড়ি এসেছে।'

নাক কুঁচকে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করল ফটিক, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ গো গুরু, একেবারে এসপেশাল জিনিস।'

'স্পানিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জাপানি ছুঁড়িদের চাইতেও তোর জিনিসটা বেশি এসপেশাল?'

'বাপের জন্মে কোনওদিন মেম সায়েবের কাছে ঘেঁষি নি। তবে হ্যাঁ, দিশি ছুকরিদের কথা যদি বল মেয়েটা তাদের নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারে।'

'বলছিস?'

'হ্যাঁ গো বলছি।' পেনো বলতে লাগল, 'জানো ফটকেদা, টিয়ার জন্যে সারা রাজনগর একেবারে ম্যাড, সিরিফ দিওয়ানা বনে আছে।'

'মেয়েটার নাম বুঝি টিয়া?'

'ইয়েস গুরু।'

আচমকা পেনোর গলা মোটা মোটা আঙুলে টিপে ধরল ফটিক। পেনোর মনে হল গলাটা এক্ষুণি পট করে ভেঙে লটকে পড়বে। যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হল তোমার, কী হল? গলা ছাড়ো মাইরি, যেমন করে ধরেছ সোজা অক্কা পেয়ে যাব।'

ফটিক গলা ছাড়ল না, বলল, 'ছুঁড়িটা যদি দারুণ না হয় তোর হাড্ডি ঢিলে করে ছাড়ব।'

'আমার কথা মিলিয়ে নিও ফটকেদা। মা কালীর দিব্যি, এক ফোঁটা মিথ্যে বলিনি।'

পেনোকে ছেড়ে দিল ফটিক। পেনো গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আঙুল না তো, সাঁড়াশি।'

ফটিক উত্তর দিল না। চোখের কোণ দিয়ে পেনোকে একপলক দেখে নিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল।

আর পেনো তার গায়ে জোঁকের মতো সেঁটে থেকে ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো অবিরাম টিয়ার কথা বলে যেতে লাগল।

পেনোর সঙ্গে ফটিকের প্রথম আলাপ হয়েছিল কবে?

কিন্তু পেনো না, তার আগে ফটিকের জীবনের গোড়ার দিককার কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

ফটিক এই শহরেরই ছেলে। রাজানগরের এক কোণে পঞ্চাননতলায় তাদের ছিল টিনের চালের কোমর-ভাঙা দু'খানা ঘর।

সংসারটা ছিল তাদের খুবই ছোট। সে, তার মা আর বাবা, মোট এই তিনজন।

ফটিকের বাবা হরবিলাস ভটচায ছিল পয়লা নম্বরের মাতাল, পয়লা নম্বরের জুয়াড়ি। তা ছাড়া ছিল চিটিংবাজ, লোফার এবং সত্যিকারের ফোরটোয়েন্টি। পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ভালোত্ব বলে কিছু নেই তার।

বাজারপাড়ার পেছন দিকে নকুল সাহার কাঠগোলায় সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হরবিলাস যখন জুয়া খেলতে বসত, দিনরাতের হুঁশ থাকত না। ঘর-সংসার, বাহ্যি-পেচ্ছাপ ভুলে অনবরত খেলেই যেত, খেলেই যেত।

হাতের সামনে একটা ভেজা গামছা থাকত তার। খেলতে খেলতে মাথা গরম হয়ে উঠলে সেটা দিয়ে একবার করে মাথা মুছে নিত। খিদে পেলে কাঠগোলার একটা মিস্তিরি ফুলুরি, আলুর চপ, পেঁয়াজি আর মুড়ি কিনে এনে দিত।

তাসের বাজিই শুধু না, যত রকমের জুয়া আছে, তার কোনওটাতেই অরুচি ছিল না হরবিলাসের। শুক্রবারের রাতটা কোনও রকমে একবার পার করতে পারলেই হল, শনিবার ভোরে তাকে আর রাজানগরে আটকে রাখা যেত না। ছেলে-বউ মরুক বাঁচুক, পৃথিবী গোল্লায় যাক, হরবিলাস কলকাতায় রেসের মাঠে ছুটবেই। একবার কি জন্য যেন কলকাতায় ট্রেন আর বাস বন্ধ ছিল। হরবিলাস ঝাড়া চোদ্দ মাইল হেঁটে রেসের মাঠে হাজির হয়েছিল।

মদ খেতে পারত সে প্রচুর। শরীরটা ছিল ব্লটিং পেপারের মতো, বোতল পেলেই চোখের পলকে সোঁ সোঁ করে শুষে নিত।

তবে বিলিতি দামি জিনিসের দিকে হরবিলাসের ঝোঁক ছিল না। কালী মার্কা বাংলা মাল আর তাড়িই তার পছন্দ। হরবিলাস বলত, 'আমার পেট হল শালার

ভাগাড়, সেখানে কি আর হুইস্কি টুইস্কি সয়, বাংলা জিনিস ঢালো, চোলাই ঢালো, আঃ প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।'

কালী মার্কা আর জুয়া, এ তো গেল নেশার ব্যাপার।

কিন্তু নেশাই তো সব নয়, তার ওপরে আছে পেট। একটা না, দুটো না, তিন তিনটে পেট।

জুয়ার রোজগার বা কালী মার্কা বাংলা মালে সেই পেট তো ভরে না। তার জন্য অন্য কিছু করা দরকার।

কিন্তু হরবিলাসের যা স্বভাব তাতে চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা একেবারেই সম্ভব নয়। জুয়া ছাড়া অন্য কিছুতে লেগে থাকার মতো ধৈর্যও নেই তার।

কিন্তু রোজগার না হলে, বাইরে থেকে পয়সা না এলে চলে কী করে? প্রথম প্রথম হরবিলাস সোজা রাস্তাটাই ধরেছিল। সবার কাছেই সে হাত পাতত। ধার হিসেবেই চাইত। বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা থেকে দু-আনা চার-আনা, যা-ই পাওয়া যাক, কোনও কিছুতেই অরুচি ছিল না তার। আসল কথা কিছু পাওয়া চাই। রাজানগরে এমন কেউ ছিল না যার কাছে সে হাত পাতে নি। একবার হাত পাতলে কিছু আদায় হয় নি, এমন ঘটনা তার জীবনে নেই।

আসলে লোকটা ছিল চতুর অভিনেতা। ছেলের অসুখ, স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় ইত্যাদি হাজার রকমের ধোঁকাবাজি দিয়ে মুখখানা অসম্ভব রকম করুণ করে যখন সে কাছে গিয়ে দাঁড়াত, কারও বাবার সাধ্য নেই তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়। মানুষের মনে সহানুভূতি নামে যে গোলমেলে জায়গাটা আছে সেখানে সুড়সুড়ি দেবার কৌশল ছিল তার হাতের মুঠোয়।

কলকাতার পাবলিক স্টেজে এসে নামলে অনেক বাঘা অ্যাক্টরের নাক কান কেটে দিতে পারত হরবিলাস।

গোটা রাজানগর ছিল তার পাওনাদার। ধারের ব্যাপারে কোনও রকম বাছ-বিচার ছিল না। দশ বছরের বাচ্চা থেকে আশি বছরের বুড়ো, মেয়েপাড়ার বেশ্যা থেকে সাইকেল রিকশাওলা, নিরপেক্ষভাবে সবার কাছে ধার করে গেছে হরবিলাস।

ধার একবার নিলে ফেরত দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তেমন স্বভাবই নয় হরবিলাসের। কাজেই একবার দু'বার যারা ধার দিয়েছে তিন বারের বার তারা হাত গুটিয়ে নিয়েছিল।

ধার যখন বন্ধ হল, তখন মাথার ঘাম ছুটিয়ে রোজগারের অন্য রাস্তা ধরেছিল হরবিলাস। রাজানগরের যত পয়সাওলা লোক আছে, তাদের উড়ু উড়ু বয়সের ছেলেদের ধরত সে, তারপর মাল-টাল খাইয়ে কোনও কোনও দিন সোজা বাড়িতে নিয়ে আসত এবং নিজের বিয়ে-করা বৌ-এর ঘরে ঢুকিয়ে দিত। আর বাইরের'

বারান্দায় বসে ফুক ফুক করে বিড়ি টানত।

হরবিলাসের বউ মানে ফটিকের মা'র ছিল মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো চেহারা। তার নাম ছিল গৌরী। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে তার কালো চুলের ঘের। পাতলা নাকের দু'ধারে ঘন পালকে-ঘেরা টানা চোখ, গায়ের রং আশ্বিনের রৌদ্র ঝলকের মতো, গলা যেন সোনার ফুলদানি। মুখখানা পান পাতার মতো। হাত-পা-আঙুল, সব মোম দিয়ে গড়া। তার দিকে তাকিয়ে কেউ চোখ ফিরিয়ে নেবে সাধ্য কি।

যাই হোক, ঘন্টা দু তিন পর উড়ুক্কু বড় লোকের বাচ্চা বেরিয়ে এসে হরবিলাসের হাতে এক গোছা নোট দিয়ে চলে যেত। আর ঘরের ভেতর দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকত গৌরী।

বাইরে বসে বসেই ঘন ঘন বিড়ি টেনে কিছুক্ষণ গৌরীকে লক্ষ করত হরবিলাস। তারপর উঠে ঘরের ভেতর চলে যেত। কয়েক ছটাক মধু ঢেলে গলার স্বরটাকে চটচটে করে সে বলত, 'কাঁদিস না, অ্যাই—কাঁদিস না—'

গৌরীর কান্না তাতে থামত না, আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

এবার হাঁটু ভেঙে দ হয়ে স্ত্রীর গা ঘেঁষে বসতে বসতে হরবিলাস বলত, 'তুই যদি কেঁদেই যাস, আমিও মাইরি কেঁদে ফেলব।'

ভাঙা ভাঙা জড়ানো গলায় গৌরী বলত, 'তুমি স্বামী হয়ে আমাকে নরকে নিয়ে যাচ্ছ!'

দাঁত বার করে হাসতে হাসতে হরবিলাস বলত, 'নরক আবার কী, অঁা—নরক কী! তোর বড্ড ছুঁচিবাই—'

হাঁটুর ওপর জোরে জোরে কপাল ঠুকতে ঠুকতে গৌরী সমানে কেঁদে যেত, 'তুমি আমার সর্বনাশ করলে! আমার সর্বনাশ করলে!'

'আবার কাঁদে! তুই কি পাগলা হয়ে গেলি!'

'পাগলাই হয়ে যাব। তোমার মধ্যে এত পাপ—'

হরবিলাস চেঁচামেচি জুড়ে দিত, 'অ্যাই রে, অ্যাই রে—পাপপুণ্য, আবার এসব গোলমেলে কারবার টেনে আনছিস কেন বাবা? ধর না, তোর গায়ে একটা কেন্নো উঠেছিল, টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিলি। ব্যস। আর তার জন্যে লাভটা কী হল ভেবে দ্যাখ—'

গৌরী বলত, 'আমি কিছু ভাবতে চাই না, চাই না।'

হরবিলাস বলে যেত, 'পাগলামি করিস না মাইরি। ওই কুত্তার বাচ্চাগুলো যতই তোর ঘরে ঢুকুক না, তুই আমার যে বউ সে বউই আছিস, আগুন সাক্ষী-করা ধম্মপত্নী। মাঝখান থেকে দ্যাখ কেমন পঞ্চাশটা টাকা হাতে এসে গেল।' একটু থেমে আবার বলত, 'আরে বাপু পেট তো চালাতে হবে। তোর পেট, আমার পেট,

ফটিকের পেট—অ্যাঁ, কথাটা সত্যি কিনা? তোর এত বিবেচনা, আর এই সোজা কথাটা শুধু বুঝতে চাস না।'

গৌরী উত্তর দিত না।

হরবিলাস আবার বলত, 'শালা না খেয়েই যদি মরে যাস, পাপপুণ্য ধুয়ে জল খাবি!'

কিছু না বলে ফোঁপাতেই থাকত গৌরী।

তখন কত আর বযস ফটিকের, বড় জোর আট দশ। তার আগের কথা মনে নেই কিন্তু সেই আট দশ বছরের স্মৃতি একটু ভাবলেই ছবির মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়ায।

ফটিকেব মনে আছে, হরবিলাস যেদিন সন্ধের পর পয়সাওলা লোকের বাচ্চাদের ধরে এনে মা'র ঘরে ঢোকাত তার আগে বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দিত। ফটিক কিন্তু খুব বেশিদূর যেত না, কাছাকাছিই থাকত। উঠোনের শেষ মাথায় একটা ঝাড়ালো করমচা ঝোপ ছিল, তার আড়ালে গিযে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত, ভয়ে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যেত তার।

এইভাবেই চলছিল। প্রথম প্রথম দারুণ কান্নাকাটি করত গৌরী। কিছুদিন পর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল তার, মুখ হয়ে উঠেছিল কঠিন, চোখ আক্রোশে যেন জ্বলতে থাকত। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলত না তখন। মনে হচ্ছিল ভয়ঙ্কর কোনও প্রতিহিংসা সে নেবে, তবে সেটা কোন দিক থেকে কিভাবে আসবে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রতিহিংসাটা শেষ পর্যন্ত গৌরী নিল, এত আচমকা এত অপ্রত্যাশিতভাবে যে তার জন্য কেউ তৈরি ছিল না।

সেদিন গৌরীর ঘরে রাজানগরের সব চাইতে বড় ইটখেলার মালিক সখিলাল মারোয়াড়ির ছেলে রাজেশকে ঢুকিয়ে বারান্দায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল হরবিলাস, করমচা ঝোপের আড়ালে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ফটিক।

ঘন্টাখানেক পর দরজা খুলে রাজেশের সঙ্গে গৌরী বেরিয়ে এসেছিল এবং লম্বা মেটে উঠোন পেরিয়ে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বাইরের রাস্তায় চলে গিয়েছিল।

অন্য দিন ঘর থেকে বেরুত না গৌরী। মাতাল কুত্তারা চলে যাবার পর পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকত বা কাঁদত।

সেদিন তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে প্রথমটা থ হয়ে গিয়েছিল হরবিলাস। তারপর এক দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে বলেছিল, 'অ্যাই গৌরী, অ্যাই যাচ্ছিস কোথায়?'

গৌরীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছি মানে।'

'মানে চলে যাচ্ছি, আর কোনওদিন ফিরব না।'

একটুক্ষণ থমকে থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল হরবিলাস, 'ঘরের বউ একটা খচ্চরের বাচ্চার সঙ্গে চলে যাচ্ছিস!'

'ঘরের বউ কি আর আমাকে রেখেছ! ভেবে দেখো—'

গৌরী আর দাঁড়ায় নি, রাজেশকে নিয়ে চলে গিযেছিল।

আর সেই মুহূর্তে রাজানগরের সব চাইতে সেরা লোফার, জুয়াড়ি, মাতাল ও চিটিংবাজ লোকটা একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। রাস্তায় লুটিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।

ঘন্টাখানেক কান্নার পর সেই যে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল, তারপর সাতটা দিন আর বেরোয় নি। জুয়ার আড্ডা, রেসের মাঠ কিংবা বাংলা মদের দোকান, কিছুই তাকে বার করে নিয়ে যেতে পারে নি।

সাত দিন পর যখন সে ঘর থেকে বেরুল তখন একেবারে অন্য মানুষ। ছেলেকে ডেকে বলেছিল, 'তোর মা তো ভেগে পড়ল, আমি ভাবছি এবার নাগা সন্ন্যাসী হয়ে যাব বুঝলি?'

গৌরী চলে যাবার পর ফটিক কম কাঁদে নি, কেঁদে কেঁদে সাতদিনে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। উত্তর না দিয়ে সে বাপের দিকে তাকিয়েছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফটিকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হরবিলাস বলেছিল, 'তোর বয়েস কত হল রে ফটকে?'

ফটিক উত্তর দেয় নি।

হরবিলাস বলেছিল, 'গায়ে-গতরে তো দামড়া মোষ হয়ে উঠেছিস।'

ফটিক এবারও চুপ।

হরবিলাস বলেই যাচ্ছিল, 'তোর মা তো ভাগল, আমার রোজগারও শেষ। আমি আর বাপু তোকে খাওয়াতে পারব না। বুঝেছিস?'

ফটিক ঘাড় কাত করেছিল অর্থাৎ বুঝতে পেরেছে।

হরবিলাস আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বুঝেছিস?'

ফটিক এবার মুখ খুলেছিল, 'তুমি আর আমাকে খাওয়াতে পারবে না।'

'সাবাস ব্যাটাচ্ছেলে। তুই একেবারে বাপকা ব্যাটা, সেপাইকা ঘোড়া।' তারিফের ভঙ্গিতে হরবিলাস ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল, 'শোন ফটকে, আমার আশা আর করিস না। এবার থেকে নিজেরটা খুঁটে খেতে শেখ। হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, দামড়া মোষের মতো গতরটাও আছে। বুঝলি ছোঁড়া, এই দুনিয়ার চারদিকে দানা ছড়ানো রয়েছে। হাত-পা একটু নাড়, ঠিক খুঁটে খেতে পারবি।'

দশ বছরের ছেলেকে পৃথিবীর কিছু সার কথা শুনিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল হরবিলাস। তারপর থেকে ক্বচিৎ কখনও সে বাড়ি আসত। ছ সাত মাস পর আসাটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল।

ফাঁকা বাড়িতে একা-একা থাকতে ভীষণ ভয় করত ফটিকের। সেই সঙ্গে ছিল ভাবনা। সেই দশ বছর বয়সেই পেটের কথা ভাবতে হয়েছিল তাকে। বাপ-মা চলে যাবার পর ঘরের হাঁড়ি-কড়া-বাক্স-টাক্স উল্টে দেখেছিল ফটিক, সব ঢু-ঢু, কিচ্ছু নেই।

তখন আর কী করা, ফটিক সকাল-দুপুর-সন্ধে বেরিয়ে পড়ত। প্রথম প্রথম সে খাবার দোকান, তেলেভাজার দোকান কিম্বা হোটেলের সামনে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু কেউ ফিরেও তার দিকে তাকাত না। শেষ পর্যন্ত খিদের জ্বালায় সে হাত পাততে শুরু করেছিল। তখন কেউ হয়তো তাকে কিছু দিত, কেউ কথাই বলত না, কেউ আবার গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিত।

কিছুদিনের ভেতরেই ফটিক বুঝতে পেরেছিল এভাবে ভিখিরির মতো বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব না। তার মধ্যে একটা স্বাধীন আত্মমর্যাদাওয়ালা মানুষ ছিল, সে তাকে আর ভিক্ষে করতে দিতে চাইল না।

ফটিক এবার বাজার পাড়ার দরজায় দরজায় ঘুরে বলেছিল, ‘আমায় একটা কাজ দেবেন?’ কাজ সে পেয়েও গিয়েছিল। প্রথম দিকে এক বাড়িতে চাকরের কাজ করত, বছর দুই পর চায়ের দোকানে কাপ প্লেট ধোওয়ার কাজ জুটেছিল। কিছুদিন সাইকেল রিকশাও চালিয়েছে, পাঞ্জাবিদের মোটর গ্যারেজেও কাজ করেছে বছর খানেক। কিন্তু কোথাও ভাল লাগেনি, পান থেকে চুনটি খসলেই মারধোর, বাপ-মা তুলে গালাগাল আর খিস্তি। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ফটিকের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ।

মাঝে মধ্যে বাবার সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে যেত, আরও লক্ষ্মীছাড়া মার্কা হয়ে গিয়েছিল হরবিলাস। চোখ দু-ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে, গাল ভেঙে, কণ্ঠা আর কাঁধের হাড় ঠেলে বেরিয়ে তার চেহারাখানা চুরমার করে দিয়েছিল। মনে হতো খুব বেশিদিন আর বাঁচবে না।

দেখা হলে হরবিলাস বলত, ‘লোকের মুখে শুনি কাজকম্মো করছিস, দানা খুঁটে খেতে শিখেছিস। ভালো—ভালো—’

ফটিক কিছু বলত না তার মুখ শক্ত হয়ে উঠত।

হরবিলাস আবার বলত, ‘অ্যাই ফটকে, গোটা দুই টাকা ধার দিতে পারিস?’

কর্কশ গলায় ফটিক বলত, ‘না।’

‘দে না, সাতদিন পর ফেরত দিয়ে দেব।’

'না।'

'আমার কথা বিশ্বাস করছিস না?'

'না।'

'তা হলে আর কী হবে, আচ্ছা চলি—' সামনের দিকে ঝুঁকে পা টেনে টেনে চলে যেত হরবিলাস।

আরও কিছুদিন পর ফটিক খবর পেয়েছিল তার বাবা রেল স্টেশনের কাছে যে গুমটি ঘরটা আছে সেখানে মরে পড়ে আছে।

ফটিক তাকে দেখতে যায় নি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া বা শ্রাদ্ধ, কিছুই করে নি। পরে সে শুনেছে লাশকাটা ঘরের ডোমেরা হরবিলাসকে তুলে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে তো গেছে, তা নিয়ে ফটিকের মাথাব্যথা নেই।

মানুষ্য জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম যে দু'জনকে ছেলেবেলা থেকে সে দেখে এসেছে তারা তার বাবা আর মা। তারা ফটিকের মনে এমন চিরস্থায়ী ছাপ মেরে দিয়েছিল, যেটা কোনও দিনই উঠবার নয়। এরা দু'জন ফটিককে কঠোর শ্রদ্ধাহীন কর্কশ রুক্ষ বেপরোয়া করে তুলেছিল।

ফটিক তার বাবাকে ঘৃণা করত কিন্তু মা'র সম্বন্ধে ছিল দুরন্ত অভিমান। বাবা না হয় তাকে নরকে ঠেলে দিয়েছিল কিন্তু তার কী দোষ ছিল? মারোয়াড়ির বাচ্চার সঙ্গে চলে যাবার সময় একবার তার কথাটা ভাবল না মা?

মা-বাপ ছাড়া আর যাদের যাদের সংস্রবে ফটিক এসেছে তাদের কারও কাছেই সামান্য স্নেহ-মমতাটুকু পর্যন্ত পায় নি। কাজেই মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণা ভালো না। মানুষকে সে শ্রদ্ধা করে না, ভালোবাসে না, বিশ্বাসও করে না।

শেষ পর্যন্ত চায়ের দোকানে, মোটর গ্যারেজে, লোকের বাড়িতে কাজ করতে আর ভালো লাগছিল না ফটিকের। প্রথমত মালিকদের নির্দয় ব্যবহার তো ছিলই। তার ওপর মাইনে-টাইনেও ঠিক সময়ে পাওয়া যেত না।

ফটিক এমন একটা চাকরি খুঁজছিল যাতে মাসের শেষে মাইনেটা অন্তত সঠিক তারিখে পাওয়া যায়। রাজানগর কারখানা-শহর। সময় পেলেই চটকলে, কাচকলে, রঙের কারখানায় চাকরির জন্য হানা দিত ফটিক। কিন্তু না আছে তার চেনা-জানা, না সুপারিশের জোর। শুধু মুখ দেখিয়ে চাকরি পাওয়া কি এতই সহজ!

বাবার মৃত্যুর তিন বছর পর হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গিয়েছিল। তখন সে পাঞ্জাবিদের মোটর গ্যারেজে গাড়িটাড়ি ধুতো, চাকায় পাম্প লাগাত, মিস্তিরিদের সঙ্গে থেকে গাড়ি মেরামতির কাজও কিছু কিছু শিখেছিল।

একদিন দুপুরবেলা রাজানগর যখন ঝিম মেরে আছে, পাঞ্জাবি মালিকরা ক্যাশে চাবি দিয়ে খেতে চলে গেছে, গ্যারেজের মিস্তিরিরাও নেই, ফটিক একা-একা বসে

গ্যারেজ পাহারা দিচ্ছিল, সেই সময় একটা অচল স্কুটার ঠেলতে ঠেলতে এক ছোকরা এল। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশেব মতো। লম্বা লম্বা চুল কায়দা করে পেছন দিকে উল্টে দেওয়া, লম্বা জুলপি। পরনে দামি ফুলপ্যান্ট, দামি জুতো, কোমরে প্যান্টের খাঁজে রঙিন চশমা গোঁজা। গলায় রুমাল বাঁধা।

ছোকরা জানিয়েছিল, সে কলকাতার দিক থেকে আসছে, যাবে নৈহাটি। কিন্তু রাজানগরের কাছাকাছি এসে স্কুটারের মেশিনে কি একটা গড়বড় হয়েছে, ফলে গাড়িটা অচল হয়ে গেছে। এখন যদি ফটিক মেশিনের গোলমালটা সারিয়ে দেয় বহুত বহুত উপকার হয়।

কথাবার্তার ঢং এবং সুর শুনে ফটিকের মনে হয়েছিল ছোকরা বাঙালি না। সে বলেছিল, 'কিন্তু এখন তো মিস্তিরিরা কেউ নেই।'

ছোকরা বলেছিল, 'কখন ফিরবে?'

'সেই বিকেলে।'

'তবে তো বহুত মুসিবৎ। এখুনি আমার নৈহাটি না গেলেই না। আচ্ছা এখানে আব কোনও গ্যাবেজ-ট্যাবেজ আছে?'

'না।'

ছোকরাব চোখমুখের চেহারা দেখে চট করে কিছু একটা ভেবে নিয়ে ফটিক বলেছিল, 'আমি কিছু কিছু সারাইয়েব কাজ জানি, তবে মিস্তিরি না। যদি বলেন স্কুটারের ইঞ্জিনটা খুলে দেখতে পারি।'

ছোকরা প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'জরুর।'

ফটিক ইঞ্জিন খুলে ফেলেছিল। গোলমালটা সামান্যই, ওটুকু সারাতে বেশিক্ষণ সময় লাগবাব কথা নয়। টুক টুক করে যন্ত্রপাতি নিয়ে যখন সে কাজ করছিল ছোকরা নানা রকম গল্প জুড়ে দিয়েছিল। কথায় কথায় জানিয়েছিল তার নাম ইসমাইল, দেশ বিহাবের আরা জেলা, চাকরি করে জাহাজে। কাঁহা প্যাসিফিক, কাঁহা অ্যাটলান্টিক, কাঁহা রেড সি, দরিয়ায় ভেসে ভেসে কত মুল্লুকে যে সে ঘুরে বেড়ায়! এখন ছুটিতে এসেছে, আছে বেহালার কাছে মেরিন হোস্টেলে। দিন কুড়ি পর আবার সে জাহাজে উঠবে। এবার যাবে সিঙ্গাপুর, সেখান থেকে জাপান, তারপর আমেরিকা।

ছোকরা আরও জানিয়েছিল, কলকাতা এবং চার পাশে তার প্রচুর রিস্তাদার। যে ক'টা দিন সে ডাঙায় আছে, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবে। সেদিন নৈহাটিতে এক চাচার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, রাস্তায় মেশিন বিগড়ে স্কুটার অচল হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোকরা দারুণ বকতে পারে। গল্প করতে করতে হঠাৎ সে বলেছিল, 'আমার কথাই তো বলে যাচ্ছি। এবাব তোমার কথা বল। এই গ্যারেজে কদ্দিন কাজ করছ?'

'দেড় বছর।'

'কী কাজ করতে হয়?'

'আমি ক্লিনার। গাড়ি-টাড়ি ধুই, গ্যারেজ সাফা করি।'

'তলব কত মেলে?'

'বিশ টাকা।'

'ব্যস!'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'এখানেই।'

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'কেউ না।'

'স্রিফ একেলা?'

'হ্যাঁ।'

ইসমাইলের সঙ্গে বকতে বকতে স্কুটার সারানো হয়ে গিয়েছিল। ফটিক বলেছিল, 'এই নিন—'

ইসমাইল বলেছিল, 'হো গিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'বহুত আচ্ছা—কত দিতে হবে?'

'কী আবার দেবেন, কিছু দিতে হবে না। একটুখানি তো মোটে কাজ।'

ইসমাইল অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'তুমি বহুত তাজ্জবের আদমী—'

ফটিক উত্তর দেয় নি।

অনেক বার বলে বলেও যখন ফটিককে কিছু নেওয়াতে পারল না তখন খাবারের দোকান থেকে এক গাদা মিষ্টি-টিষ্টি কিনে এনেছিল ইসমাইল, কাছাকাছি একটা রেষ্টুরেন্টে চা দিতে বলে এসেছিল।

ইসমাইল বলেছিল, 'পয়সা তো নেবে না, মিঠাই-টিঠাই না খেলে কিন্তু ছাড়ছি না।'

ফটিক বলেছিল, 'ঠিক আছে, খাচ্ছি—'

খেতে খেতে ইসমাইল জিজ্ঞেস করেছিল, 'তলব তো পাও বিশ রুপাইয়া, তার ওপর সাধু মহাত্মাদের মতো কাজ করেও পয়সা নাও না। তোমার চলে কি করে?'

অচেনা এই জাহাজী ছোকরাটিকে মোটামুটি ভালোই লেগে গিয়েছিল ফটিকের। এরকম সহৃদয় দিলওলা সজীব মানুষ আগে আর কখনও দেখে নি সে।

ফটিক বলেছিল 'ওর মধ্যেই চালিয়ে নিই।'

'এ ঠিক বাত নেহি।'

'কিন্তু কী করব, এর চাইতে ভাল চাকরি আমাকে কে আর দেবে?'

একটু চিন্তা করে ইসমাইল বলেছিল, 'জাহাজ নোকরি করবে? ভালো তলব মিলবে।'

ফটিক বলেছিল, 'দেবে কে?'

'এক কাজ কর, আমি তো এখন বিশ রোজ কলকাতায় আছি। কাল সুবে মেরিন হোস্টেলে একবার আসতে পারবে?' বলে বেহালার ঠিকানা দিয়েছিল ইসমাইল।

কি ভেবে ফটিক বলেছিল, 'যাব।'

'জরুর আসবে। আমি তোমার জন্যে ইন্তেজার করব।' স্কুটারে উঠে একটু পর চলে গিয়েছিল ইসমাইল।

পরের দিন সত্যিসত্যিই বেহালার মেরিন হোস্টেলে গিয়ে ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করেছিল ফটিক। তাকে দেখে ইসমাইল ভারি খুশি, 'আরে ইয়ার, তুম সচমুচ আ গিয়া! বহুত আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ গল্প টল্প করে তাকে নিয়ে ইসমাইল জাহাজের অফিসে গিয়েছিল। ছোকরা দারুণ কাজের এবং জানাশোনাও তার প্রচুর। সেইদিনই মার্চেন্ট নেভিতে একটা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ছ'মাসের ট্রেনিং, তারপর চাকরি পাওয়া যাবে।

দিন কয়েক পর গ্যারেজের কাজ ছেড়ে রাজানগরের বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল ফটিক। সঙ্গে ছোট্ট আধভাঙা পুরনো টিনের সুটকেশ আর চিটচিটে চাদর জড়ানো একটা বালিশ।

মার্চেন্ট নেভির ট্রেনিং শিপ 'ভদ্রা'য় ছ'মাস ট্রেনিং নেবার পর ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজে চাকরি পেয়ে গিয়েছিল ফটিক, স্টোকারের চাকরি।

'ভদ্রা' জাহাজে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়ে সেই যে ইসমাইল চলে গিয়েছিল, আর কোনওদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি। দুম করে কোত্থেকে একদিন ছোকরা এল, তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেল, ভাবতেও এখন অবাক লাগে। জীবনে এই একটা মাত্র লোক যার সম্বন্ধে মনে মনে মোটামুটি একটু শ্রদ্ধা আছে ফটিকের।

জাহাজে চাকরি নেবার পর দারুণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল ফটিক। তার জীবনে কোনও মোহ নেই, আকর্ষণ নেই, আনন্দ নেই। নেই বিন্দুমাত্র পিছুটান। কথায় কথায় সে মারামারি বাধিয়ে দিত। একটানা দিনের পর দিন নোনা জলে ভেসে থাকার পর যখন তাদের জাহাজ কোনও বন্দরে ভিড়ত, ফটিক খুঁজে খুঁজে প্রথমেই গিয়ে হাজির হত বেশ্যাবাড়িতে কিংবা মদের দোকানে। বাপ-মা থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব মানুষকে অশ্রদ্ধা আর ঘৃণা করতে করতে তার মনটা পোড়া ঝামার

মতো কর্কশ আর শক্ত হয়ে উঠেছিল। স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, এই সব স্নিগ্ধ কোমল দিকগুলো তার মধ্যে ফুটে ওঠার সুযোগই পায় নি। এমন কি নিজের সম্বন্ধেও তার মমতা ছিল না। জীবনটাকে যাচ্ছেতাই ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছিল ফটিক, নিজেকে ভেঙেচুরে ধ্বংস করে ফেলছিল।

মাইনে-টাইনে যা সে পেত, কিংবা এক পোর্ট থেকে আরেক পোর্টে মাল স্মাগল করে যা লাভ হত, সবই বেশ্যাবাড়ি আর বিদেশি তাড়ির দোকানে দোকানে ঢেলে দিয়ে আসত। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উড়িয়ে নগদ দগদগে একটি সিফিলিস জুটিয়ে ফেলেছিল ফটিক। নিয়মিত পেনিসিলিন নিলে সেটা কিছুদিনের জন্য চাপা পড়ে, পেনিসিলিন বন্ধ করলেই আবার ঠেলে বেরোয়। রোগটা একেবারে হাড়ের তলা অব্দি পৌঁছে গেছে।

দু-তিন বছর পর পর তাদের জাহাজ কলকাতায় ফিরলে পোর্টে নেমে সোজা রাজানগর চলে যেত ফটিক। সেখানে নিজেদের বাড়িতে কতক্ষণ আর থাকত! রাজানগরের মেয়েপাড়ায় তার বেশির ভাগ সময় কাটত। আসলে বেশ্যা আর মদ তার নিশ্বাসের মধ্যে মিশে গেছে।

এই মেয়েপাড়াতেই পেনোকে প্রথম দেখে ফটিক। পেনো রাজানগরের বেশ্যাদের দালাল। মেয়েদের জন্যে ফুসলে ফাসলে খদ্দের জুটিয়ে আনতে পারলে ভাল কমিশন পায় সে। এই তার জীবিকা।

পেনোর বাড়ি রাজানগরে নয়, কোত্থেকে কবে যেন স্রোতের মুখে আবর্জনার মতো ভাসতে ভাসতে বেশ্যাপাড়ায় এসে সে আটকে গিয়েছিল। ওখানেই থাকে সে, আড়কাঠিগিরি করাই তার জীবিকা।

ফটিক যেদিন প্রথম রাজানগরের মেয়েপাড়ায় এসেছিল সেদিনই পেনোর সঙ্গে আলাপ। ছোকরা মন্দ না। দু-চারটে পয়সা দিলে কিংবা এক ভাঁড় তাড়ি খাওয়ালে তাকে দিয়ে না করানো যায় এমন কাজ নেই, জুতোর তলা পর্যন্ত চেটে দিতে পারে সে। ফটিক রাজানগরে এলেই পেনো তার গায়ে জোঁকের মতো আটকে যায়।

মেয়েপাড়ায় যাতায়াত করতে করতে পেনোর সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে ফটিকের।

হাঁটতে হাঁটতে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে ফটিক আর পেনো অনেকটা দূরে চলে এসেছিল। এখন রাস্তার দু'ধারে যতদূর চোখ যায় ফাঁকা জায়গা। সেখানে ধানখেত, হোগলা বন, খাল, খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, সাঁকোর মাথায় মাছরাঙা। এই হেমন্তেও ধানখেতে হোগলা বনে বেশ জল আছে।

ফাঁকা জায়গাটা পেরুলেই ইতির পর পুনশ্চর মতো আরও কিছু দোকানপাট

আর বস্তি চোখে পড়ে। দোকানগুলো ডান ধারে, বস্তিটা বাঁ দিকে। দোকান বা বস্তিটস্তি সবই খোলার চালের। দোকানগুলোর কোনওটা মুদিখানা, কোনওটা পানবিড়ির, কোনওটা চা-বিস্কুট-ওমলেটের, তিন চারটে তেলেভাজার। এদের গা ঘেঁষেই একটা কবিরাজখানা, ভাঙা রংচটা টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে 'সঞ্জীবনী আয়ুর্বেদ ভবন', তার তলায় প্রোপ্রাইটর ঃ শ্রীশশিভূষণ সেন, ভিষকরত্ন। কবিরাজখানার পর একটা খেলো ফোটো তোলার দোকান। তারপর শুঁড়িখানা অর্থাৎ দিশি মদের দোকান। বাঁ দিকের বস্তিটা হল রাজানগরের মেয়েপাড়া।

দোকানপাট আর বস্তি পেছনে ফেলে আরেকটু এগুলে উঁচু বাঁধ। বাঁধের নিচে শ্মশান, শ্মশানের তলায় গঙ্গা।

ফটিক আর পেনো মেয়েপাড়ার কাছে এসে পড়ল।

সূর্যটা টাল খেয়ে আকাশের মাঝমধ্যিখান থেকে পশ্চিমে কিছুটা নামলেও দুপুরের জের এখনও চলছে। বাজারপাড়ার মতো এখনকার বেশির ভাগ দোকানপাটের ঝাঁপও বন্ধ, শুধু চায়ের দোকানগুলোতে উনুনে বড় বড় সিলভারের হাঁড়িতে আস্ত মটর সেদ্ধ হচ্ছে। সন্ধের দিকে এগুলো ঘুগনি হয়ে দিশি মদের চাট হয়ে যাবে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফটিক। দ্রুত চারদিক এক পলক দেখে নিয়ে বলল, 'জায়গাটা সেই রকমই রয়েছে দেখছি।'

ঘাড়ের পাশ থেকে পেনো বলে উঠল, 'হ্যাঁ, গুরু—'

'ফটোর দোকানের মন্মথটা এখনও আছে রে?'

'এই ভাগাড় ছেড়ে আর কোন চুলোয় যাবে?'

'আর শশে কবরেজ?'

'সে শুকনিটাও আছে।'

'মালের দোকানের বেন্দাবন?'

'আছে আছে ফটকেদা, সব শালাই আছে। সন্ধেবেলা গত্ত থেকে মাকড়ারা কেমন বেরোয় দেখবে'খন। এখন এসো তো গুরু—'

'হ্যাঁ, চল—'

যেতে যেতে পেনো আবার বলল, 'এ শালার এমন জায়গা, চিতেয় না ওঠা পর্যন্ত কেউ নড়বে না। গুড়ের গায়ে মাছির মতো আটকে থাকবে।'

'যা বলেছিস ব্লাডি ব্যাস্টার্ড!' খ্যাল খ্যাল হেসে করে পেনোর ঘাড়ে একটা থাবড়া কষিয়ে দিল ফটিক। গুড়ের গায়ে মাছির উপমাটা খুব ভালো লেগেছে।

থাবড়া খেয়ে পেনো ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল। নাকের ভেতর থেকে সরু একটা শব্দ বার করে ককিয়ে উঠল, 'উ-হু-হু, ঘাড়ের হাড় ঢিলে হয়ে গেল

ফটকেদা—'

'আদর করলাম, তাতেই হাড্ডি আলগা হয়ে গেল! শালা ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো গেলি যে রে—'

মেয়েপাড়াটা রাস্তা থেকে খানিকটা নিচে। সেখানে নামার জন্য রাস্তার গায়ে খাঁজ কেটে কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে।

আগে আগে পেনো, পেছনে ফটিক— সিঁড়ি ভেঙে ওরা মেয়েপাড়ায় ঢুকে পড়ল।

এখন যদিও ঠিক ভরদুপুর নয়, তবু মেয়েপাড়াটার ওপর দারুণ এক আলসেমি ভর করে আছে। বেশির ভাগ ঘরেরই দোর বন্ধ। মেয়েরা হয়তো ঘুমোচ্ছে। দু-একজন বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে হেমন্তের টিমে রোদে চুল শুকিয়ে নিচ্ছিল।

একটা লম্বাটে ধরনের ঢালা উঠোনকে ঘিরে সারি সারি ঘর। পেনোরা উঠোনে চলে এসেছিল।

ফটিক চাপা নিচু গলায় বলল, 'সেই কথাটা মনে আছে তো?'

পেনো শুধলো, 'কোনটা?'

'সেই যে, ছুঁড়িটা যদি দারুণ না হয় তোকে জানে বাঁচতে হবে না।'

'মনে আছে গুরু, মনে আছে। এসে তো পড়েছই, নিজের চোখেই দ্যাখো না—' বলতে বলতেই চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল পেনো, 'মাসি—অ মাসি—'

বারান্দায় বসে যে দু-একটা মেয়ে চুল শুকোচ্ছিল, চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। দুপুরও না, বিকেলও না, এই অবেলায় পেনোর সঙ্গে নতুন একজনকে এ পাড়ায় ঢুকতে দেখে তারা অবাক।

আর পুব দিকের ঘর থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে লক্ষ্মীছাড়া চেহারার কুৎসিত মাঝবয়সী একটা মেয়েমানুষ বেরিয়ে এল। তার নাম মানদা। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় কদর্য একটা খিস্তি আউড়ে সে বলল, 'নচ্ছারের ব্যাটাকে যেন বাঘে ধরেচে লা।' দুপুরের কাঁচা ঘুমটির বারোটা বাজায় সে খুবই বিরক্ত। এই মেয়েপাড়ার বাড়িউলি সে।

দারুণ উৎসাহের গলায় পেনো বলল, 'দেখ দেখ মাসি, কাকে নিয়ে এসেছি।'

চোখ রগড়ানো হয়ে গিয়েছিল। মানদা পেনোর সঙ্গে ফটিককে দেখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। তারপর গলার স্বরে খুশি আর বিস্ময় মিশিয়ে বলল, 'আমার ফটকে বাবা না?'

ফটিক হাসল, 'হ্যাঁ গো মাসি, আমি সেই ব্লাডি সোয়াইন ফটকেই—'

মানদা বলল, 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম গা—' বলতে বলতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'এসো, বাবা এসো—' ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে একটা বেতের

মোড়া এনে বারান্দায় পেতে দিতে দিতে বলল, 'বোসো—'

পেনো স্টিলের বাক্সটা বারান্দায় নামিয়ে রেখেছিল। কাঁধ থেকে বিছানাটা বাক্সটার ওপর রেখে মোড়ায় বসল ফটিক।

পেনো দাঁত বার করে মানদাকে বলল, 'খুব তো বাপ-মা তুলে গাল দিলে, এখন?'

মানদা নরম গলায় বলল, 'আমার ফটকে বাবা যে এয়েছে কি করে জানব বল। সত্যি বাপু কাঁচা ঘুমটা ভাঙাতে আমার রাগ হয়েছিল।'

'তোমার বাবাকে দেখে এখন রাগ জল হয়ে গেছে তো?'

সিলভারেব কৌটো থেকে দাঁতে তামাকের গুঁড়ো বার করে লাগাতে লাগাতে ঘাড় কাত করল মানদা, 'হ্যাঁ।'

পেনো বলল, 'মাঝখান থেকে আমার বাপ-মা উদ্ধার হয়ে গেল।'

সেই মেয়ে দুটো আপাতত চুল শুকনো মুলতুবি রেখে উঠে এসেছিল। তাদের একজনের নাম সরলা, আরেক জন পদ্ম। খসখসে অমসৃণ চামড়া, রং কালচে। এককালে একটু-আধটু লাবণ্য হয়তো ছিল। এই মেয়েপাড়ায় রাতের পর রাত জেগে আর মাতাল লম্পটদের অত্যাচার সয়ে সয়ে লাবণ্য-টাবণ্য আর নেই, শরীরও গেছে।

মেয়েদুটো ফটিকের চেনা, বছর দুয়েক আগে যখন এসেছিল তখন দেখে গেছে। ফটিককে দেখে ওরা খুব খুশি, মুখচোখ দেখে অন্তত তাই মনে হয়। ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ফটিক।

মানদা ফটিকের মুখোমুখি বসে পড়েছিল। বলল, 'এবার দু-বছর পর এলে। অ্যাদ্দিন পর মাসিকে মনে পড়ল!'

ফটিক বলল, 'কী করব, জলে ভাসার চাকরি। জাহাজ কলকাতায় না এলে তো আসতে পারি না।'

পেনোও ফটিকের গা ঘেঁষে বারান্দার মেঝেতে বসে পড়েছিল। সে বলল, 'জানো মাসি, ফটকেদাদের পঞ্চাননতলার বাড়িটা গেল বছর ঝড়ে শুয়ে পড়েছে। তোমায় বলেছিলুম না—'

'হ্যাঁ।' মানদা মাথা নাড়ল।

'তাই শুনে ফটকেদা ফিরে যাচ্ছিল।'

'ফিরে যাবে কেন, আমরা আছি না?'

'সেই জন্যেই তো ধরে আনলুম গো মাসি—'

'খুব ভালো করেছিস।' বলতে বলতে ফটিকের দিকে ফিরল মানদা, 'তা কেমন আছ বল বাবা?'

ফটিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছিল, খুব সম্ভব পেনোর বর্ণনার সেই মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া দারুণ ছুঁড়িটাকে। কিন্তু কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। ফটিক অন্যমনস্কের মতো বলল, 'ভালোই আছি।'

আবার কী বলতে যাচ্ছিল, মানদার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'অই দ্যাখো, আমি একা-একাই বকে মরছি, ছুঁড়িগুলোকে ডাকি। ওরা তোমার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে থাকে।' বলতে বলতেই ওখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কই লা ছুঁড়িরা, ঘুম-টুম পুঁটলিতে বেঁধে দেখবি আয় কে এয়েছে।'

চারপাশের ঘর থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আর হাই তুলতে তুলতে একজন একজন করে পনের ষোলটি মেয়ে বেরিয়ে এল। সবই চেনা মুখ, দু'বছর তিন বছর চার বছর, যত কাল ধরে ফটিক এ পাড়ায় যাওয়া আসা করছে এই মেয়েদের দেখে আসছে। লাবণ্যহীন কুৎসিত চেহারা সবার। কারও নাম চাঁপা, কারও টগর, কারও মালতী, সন্ধ্যা, জবা, টুনি, পাখি ইত্যাদি। কিন্তু পেনো যা বলেছে তেমন কোনও মেয়েকে এদের মধ্যে দেখা গেল না।

মেয়েগুলো কাছাকাছি এসে মাছির মতো ভন ভন করতে লাগল।

'কবে এলে গো?'

'কতদিন ধরে তোমার জন্যে আমরা হেদিয়ে মরছি।'

'আমরা ভাবলুম বুঝি লাগর আমাদের ভুলেই গেছে।'

এমনই নানা ধরনের কথা বা মন্তব্য।

ওদের ভেতর থেকে একটি মেয়ে, যার নাম টগর, বেরিয়ে এসে হাঁটু ভেঙে ফটিকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ফটিক তাড়াতাড়ি তার মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল, 'ভালো আছিস টগর?'

টগর একমুখ হাসল, 'পাঁকের ভেতর পড়ে আছি ভালোদাদা। আমাদের আর ভালো থাকাথাকি।'

প্রথম যেদিন ফটিক এ পাড়ায় আসে তখন থেকেই টগরের সঙ্গে তার ভাই-বোনের সম্পর্ক। টগর তাকে বলে ভালোদাদা। যার দুই ভাই ফোঁটার সময় রাজানগরে থেকেছে ফটিক, টগর তাকে ফোঁটা দিয়েছে।

টগর আবার বলল, 'মাসের পর মাস জলে জলে ভেসে থাকো। আমার না এমন ভয় করে ভালোদাদা!'

ফটিক আবছা হাসল।

এই সময় একটা মেয়ে, তার নাম চাঁপা, বলে উঠল, 'এবার কদ্দিনের ছুটি নিয়ে এয়েছ গো?'

ফটিক বলল, 'মাসখানেক।'

'এই একটা মাস আমার কাছে থাকবে।'

অমনি আরেকটা মেয়ে ফোঁস করে উঠল, 'গেল বার এসেও তোর কাছে ছিল, এবার আমার কাছে থাকবে।'

ওধার থেকে কাকের মতো কর্কশ ধারাল গলায় জবা বলে উঠল, 'ও তোর কতকালের ভাতার লা, ও থাকবে আমাব কাছে—'.

ফটিককে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে কামড়াকামড়ি টানাটানিটা এমনি এমনি নয়। তার কারণ হল ফটিক দু হাতে দেদার টাকা ওড়ায়। যে মানুষ বেপরোয়া হয়ে খরচ করে তাকে হাতে রাখলে লাভ আছে। তাই দু-এক বছর পর পর ফটিক এ পাড়ায় এলে তাকে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে দারুণ টানা হ্যাঁচড়া শুরু হয়ে যায়।

মেয়েগুলোর মধ্যে যখন কাড়াকাড়ি চলছে সেই সময় উত্তর দিকের একটা ঘর থেকে মেয়েটি বেরিয়ে এলো।

তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে। গা ভর্তি স্বাস্থ্য। মুখখানা প্রতিমার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পাতলা টিকলো নাকের দু ধারে বড় বড় চোখ, পিঠময় ছড়ানো থাক থাক কালো কুচকুচে চুল, হাত, হাতের আঙুল, চোখ, তার সব কিছুতেই লম্বা টান দেওযা। তার সারা গায়ে অনেকখানি লাবণ্য এখনও থেকে গেছে।

গোটা দুনিয়ার হাজারটা বেশ্যাপাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে ফটিক। কিন্তু ব্লাডি হেলের মধ্যে এরকম একটা মেয়ে যে থাকতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল!

ঘাড়ের পাশ থেকে চাপা ঘড়ঘড়ে গলায় পেনো বলে উঠল, 'এখানে আসতে আসতে যার কথা বলেছিলুম। মিলিয়ে নাও ফটকেদা, ঠিক বলেছিলাম, না বেঠিক?'

এদিকে মানদা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে খাতিরের সুরে বলল, 'এতক্ষণে তোর ঘুম ভাঙল টিয়া! আয় আয়, দ্যাখ কে এয়েছে—'

এই মেয়েটার নাম তা হলে টিয়া? ফটিক একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকল।

টিয়া কাছে এসে মানদার গা ঘেঁষে বসল। মানদা ফটিককে দেখিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এই আমার বাবা ফটিক। মস্ত লোক, কালাপানিতে ভেসে ভেসে জাহাজে করে কোথায় কোথায় চলে যায়।'

অন্য মেয়েরা ফটিককে নিয়ে এখনও সমানে ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চেঁচামেচিতে কানের পর্দা ফেঁসে যাবার জোগাড়।

একটি মেয়ে, তার নাম কুসুম, এর ভেতর বলে উঠল, 'একা কারু ঘরে থাকবে না, দু'দিন করে সবার ঘরে থাকবে।'

মানদা কুৎসিত খিস্তি করে গর্জে উঠল, 'অ্যাই মাগীরা, অ্যাই কাগের বাচ্চারা—চেল্লানি থামা। আর একটা কথা শুনলে গলায় চ্যালা কাঠ পুরে দেব।' সে যে বাড়িউলি, রাজানগরের এই মেয়েপাড়াটার সর্বসময় কর্ত্রী—ওই একটা

গর্জনেই টের পাইয়ে দিল।

মেয়েগুলো থমকে গেল। তারপর চেঁচামেচি থামিয়ে চুপচাপ ফটিকদের চার পাশে এলোমেলো বসে পড়ল।

মানদা গলার সুর একটু নামিয়ে আবার বলল, 'ছেলেটা অ্যাদ্দিন পর সবে এল। ঘরে পা দিতে না দিতেই শুকুনির ছানারা তার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে লা!' কুসুমের দিকে ফিরে বলল, 'সব্বার ঘরে দু'দিন করে থাকবে? কালনিমির নক্কা ভাগ হচ্ছে!'

কুসুম ভয়ে ভয়ে বলল, 'খেয়োখেয়ির চাইতে ভাগ করে নেওয়া ভালো না—তুমিই বল মাসি?'

'তুই থাম ছুঁড়ি। ভাগাভাগি করছে! আমার বাবা বিলেত ফেরত—আমি তাকে যার হাতে তুলে দেবো, এবার সে তাকে পাবে।'

'কার হাতে তুলে দেবে?'

'আর যার হাতেই দিই, তোর হাতে নয়। কার হাতে দেবো—সে আমি বুঝব। ভেবে ভেবে তোর মাথা খারাপ করতে হবে না।'

ফটিক একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন, টিয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। মানদা বা অন্য মেয়েদের চেঁচামেচি চিৎকার সে যেন স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছিল না, আবছাভাবে কতকগুলো শব্দ শুধু তার কানে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল।

এদিকে ঘাড়ের কাছে মুখ গুঁজে পেনো চাপা নিচু গলায় মাছির মতো ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছিল, 'কি ফটকেদা, পসন্দ হুয়া—পসন্দ হুয়া?'

শালা মাকড়াটা খুশিতে ডগমগ হয়ে মঝেমধ্যে হিন্দি আওড়াতে থাকে। যতবার ঘাড়ের কাছে পেনো মুখ আনছিল ততবারই কনুই দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল ফটিক।

অন্য মেয়েরা বসে পড়েছে। টিয়া কিন্তু বসেনি, বারান্দার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে শরীরে দু-তিনটে বাঁক তৈরি করে দাঁড়িয়ে ছিল আর ফটিককে দেখছিল। তার চোখেমুখে কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতূহল।

অন্য মেয়েদের ঠাণ্ডা করবার পর এবার মানদার নজর পড়ল টিয়ার ওপর। বলল, 'অ্যাই ছুঁড়ি, তুই দূরে দাঁড়িয়ে কেন লা? কাছে আয়।' বলার ধরনেই বোঝা যায় টিয়াকে বেশ খাতির করে সে।

টিয়া আস্তে করে বলল, 'সবাই তো কাছে গিয়ে বসেছে, আমি না হয় দূরেই থাকি।'

মানদা বলল, 'আর ঠ্যাকার করতে হবে না, আয় ইদিকে—'

কাঁধে আঁচল তুলে দিয়ে টিয়া এবার মানদার কাছে এসে বসল।

ফটিককে দেখিয়ে মানদা বলল, 'এরে চিনিস?'

টিয়া ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'হুঁ—'

'কে বল তো?'

'তোমার বাবা।'

টিয়ার বলার ভঙ্গিটা এমনই যে সবাই হেসে ফেলল, এমন কি ফটিকও।

হেসে হেসে মানদা বলতে লাগল, 'বাবা তো ঠিকই, এক শো বার বাবা, হাজার বার বাবা। ফটিক আমার চাট্টিখানি লোক না, জাহাজে হিল্লি-দিল্লি-বিলেত করে বেড়ায়। সাহেবদের সঙ্গে তার ঘোরাফেরা, ওঠা-বসা। দয়া করে যে এখেনে আসে তাতেই আমরা ধন্যি হয়ে যাই।'

চোখের কোণ দিয়ে ফটিককে এক পলক দেখে নিয়ে টিয়া বলল, 'তোমার বাবার কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে গো মাসি। যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেদিন থেকেই ওই এক কথা শুনে আসছি। বাবা যেন তোমার জপের মালা।'

মানদা তামাক-লাগানো কালো এবড়োখেবড়ো দাঁত বার করে হাসতে লাগল, 'তা যা বলেছিস।' হাসতে হাসতেই সে ফটিকের দিকে ফিরল, 'কথা শোন মেয়ের। হিংসে, বুঝলে বাবা, তোমার ওপর ছুঁড়ির হিংসে।'

ফটিক উত্তর দিল না, তার সিগারেটে-পোড়া কালো ভারি ঠোঁটে ঝাপসা একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

মানদা এবার টিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'এরে নিশ্চয়ই তুমি চিনতে পারছ না?'

ফটিক টিয়াকে দেখতে দেখতে বলল, 'এবার এসে তোমাদের মুখে নামটাই শুনলাম। এছাড়া আর কিছু জানি না। আগে আগে যখন এসেছি তখন একে দেখি নি।'

'দেখবে আর কোত্থেকে? মাস-তিনেক হল টিয়া এখেনে এয়েছে। আর তুমি শেষবার এসেছিলে দু বচ্ছর আগে।'

'তা বটে।'

এই সময় টগর ওধার থেকে বলে উঠল, 'হ্যাঁ গো ভালোদাদা, অন্য বার তুমি এসেই তো খাবারদাবার আনাও, খেতে খেতে গল্প করি। এবার যে শুকনো মুখে বসে আছি, দাদার আমার সে হুঁশই নেই।'

তার কাঁধের কাছ থেকে কুসুম বলে উঠল, 'হুঁশ থাকবে কি করে? টিয়ার মুখ দেখে তোর দাদার মুণ্ডু ঘুরে গেছে যে।'

ফটিক তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা মোটা মানি ব্যাগ তুলে আনল, তার ভেতর থেকে পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট বার করে পেনোকে দিতে দিতে বলল, 'একদম ভুলে গেছলাম রে। যা, চট করে কিছু কিনে নিয়ে আয়।'

'ক' টাকার আনব?'

'ব্লাডি সোয়াইন, পঞ্চাশ টাকারই আনবি। যাবি আর আসবি। যা, ভাগ—' আলতো করে পেনোর ঘাড়ে একটা লাথি কষিয়ে দিল ফটিক।

নোটটা ভাঁজ করে একটা চুমু খেল পেনো। তারপর ভো-কাট্টা ঘুড়ির মতো উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেল।

বিকেল হয়ে এসেছিল। দিনটা আরও নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। উত্তুরে হাওয়ায় হিমের ভাব মিশতে শুরু করেছে।

বারান্দায় বসে বসেই ওরা গল্প করে যাচ্ছিল। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ফটিক বার বার টিয়ার দিকে তাকাচ্ছিল। যত বার তাকাচ্ছে তত বারই টিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে।

আধঘন্টা লাগল না, পেনো মুড়ি, কাঁড়ি কাঁড়ি তেলেভাজা, ঘুগনি আর জিলিপি-নিমকি-রসগোল্লা নিয়ে ফিরে এল।

মানদা তার ঘর থেকে সরষের তেল, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা নিয়ে এল। তেল দিয়ে মুড়ি মেখে লঙ্কা-পেঁয়াজ কুচিয়ে তার ওপর ছড়িয়ে দিল। তারপর সব খাবার সমান ভাগ করে সকলের হাতে হাতে দিল।

খেতে খেতে পেনো বলল, 'কেন যে মাইরি তুমি এক বচ্ছর দু বচ্ছর সমুদ্দুরে পড়ে থাকো! তুমি এখেনে থাকলে রোজ এইরকম মুড়ি-তেলেভাজা-রসগোল্লা-ফসগোল্লা সাঁটানো যায়।'

'বলছিস!'

'হুঁ-উ-উ—' বেগুনিতে লম্বা একটা কামড় দিয়ে পেনো ঘাড়টা অনেকখানি হেলিয়ে দিল।

ফটিক নাক মুখ কুঁচকে প্রশ্রয়ের সুরে বলল, 'শালা ব্রেষোকাঠ।'

পেনো খাবার আনার সময় চায়ের দোকানে বলে এসেছিল। একটা ছোকরা কলাইয়ের থালায় সারি সারি চায়ের গেলাস বসিয়ে নিয়ে এল।

চা আর মুড়িটুড়ি খেতে খেতে আরেক প্রস্থ গল্প চলল। হঠাৎ কী মনে পড়তে ফটিক বলে উঠল, 'আজ রাত্তিরে আমি সবাইকে খাওয়াব। বল তোমরা কী খাবে?'

সবগুলো মেয়েই একসঙ্গে বলল, 'মাংস-ভাত, মাংস-ভাত—'

ফটিক লক্ষ করল টিয়া কিছু বলল না, মানদা যে মুড়িটুড়ি দিয়েছে সেগুলোও খাচ্ছে না। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, খাচ্ছ না যে?'

টিয়া বলল, 'আমি কেন খেতে যাব? সম্পক্কটা কী?'

ফটিক থতিয়ে গেল, 'সম্পক্ক মানে!'

এই সময় মানদা টিয়াকে বলে উঠল, 'খা লো ছুঁড়ি, খা। সম্পক্ক হতে কতক্ষণ।'

পেনো খ্যাসখেসে গলায় হেসে উঠল, 'হয়ে গেল গুরু—'

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অন্য মেয়েগুলো হাসতে লাগল।

ফটিক মানদার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে রাত্তিরে মাংস ভাতই হচ্ছে তো?' বলেই আড়ে আড়ে একবার টিয়াকে দেখে নিল।

মানদা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মাংস-ভাতই হবে।'

পকেট থেকে আবার এক গোছা নোট বার করে পেনোকে দিতে দিতে ফটিক বলল, 'চাল-তেল-মাংস-পেঁয়াজ-গরম মসলা, যা যা লাগে সব নিয়ে আসবি, বুঝলি? ওর থেকে গ্যাঁড়াফাই করবি না।'

পেনো টাকাগুলো পকেটে চালান করে বলল, 'কী যে বল গুরু, গ্যাঁড়ার কারবারে আমি নেই।'

'না, তুমি শালা যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা।'

পেনো ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'হে—হে—'

'আর হে—হে করতে হবে না। ছুটে বাজারে চলে যা—'

'এখন গিয়ে কী করব, খাওয়া-দাওয়া তো রাত্তিরে, সন্ধেবেলা কিনে আনলেই হবে।'

'তবে তা-ই যাস।'

হাত কচলাতে কচলাতে পেনো এবার বলল, 'একটা কথা কইব ফটকেদা?'

ফটিক চোখ কুঁচকে তাকাল, 'কী?'

'শুধু মাংসই খাওয়াবে, তার সঙ্গে এট্টুস ওষুদ খাওয়াবে না? ওষুদ নইলে মাংস হজম হবে কী করে?'

'কিসের ওষুদ?'

দু হাত দিয়ে একটা বোতলের আকার দেখাল পেনো। ফটিক রগড়ের গলায় বলল, 'ওরে শালা খচড়া, এই তোর ওষুদ!'

'হ্যাঁ ফটকেদা—'

ফটিক বলল, 'আলবত ওষুদ খাওয়াব। সন্ধেবেলা যখন মাংস-ফাংস আনতে যাবি তিনটে বাংলা মালের বোতলও নিয়ে আসিস।'

'ফটকেদা, মাইরি তোমার জবাব নেই।'

এই সময় কী মনে পড়ে গেল মানদার। সে বলে উঠল, 'অ্যাই পেনো, আমার বাবা এয়েছে। দেখবি আজ যেন সন্ধের পর এ পাড়ায় কোনও মড়া না ঢোকে। আজ মেয়েপাড়ার দোর বন্ধ, বুঝলি?'

এক বছর কি দু বছর পর পর ফটিক যেদিন রাজানগরের মেয়েপাড়ায় আসে সেদিনটা এখানে উৎসবের দিন। তার সম্মানে বাড়িউলি সেদিন আর কোনও খদ্দেরকে ঢুকতে দেয় না। ক'বছর ধরে এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

পেনো ঘাড় কাত করে জানালো, সন্ধে হলেই সে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, একটা মাছিও গলতে দেবে না।

সবার চা এবং মুড়ি-টুড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এদিকে দিনটা দ্রুত ফুরিয়ে রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো। সূর্য অনেক দূরে গঙ্গার ওপারে আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে বেয়ে নেমে গেছে। একটু পরেই ঝপ করে হেমন্তের সন্ধে নেমে আসবে।

মেয়েদের ভেতর থেকে টগর বলল, 'হ্যাঁ গো ভালোদাদা—'

ফটিক তার দিকে ফিরল, 'কী বলছিস?'

'অন্য বার জাহাজ থেকে ফিরলে সমুদ্দুরের গল্প কর, যে যে দেশে যাও সেই সেই দেশের গল্প কব। এবার তো কিছু বলছ না।'

ফটিক বলল, 'বলব বলব, সবে তো এলুম। রাত্তিরে কত গল্প শুনতে পারিস, দেখব।'

মানদা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গপ্প-টপ্প রাত্তিরেই হবে। এখন আর ছেলেটাকে বকিয়ে মারতে হবে না।' ফটিককে বলল, 'তুমি এখন এট্টু জিরিয়ে নাও বাবা। সেই কখন জাহাজ থেকে নেমেছ—'

ফটিক বলল, 'জিরোবার দরকার নেই। এই জামাপ্যান্টগুলো একটু পাল্টাতে পারলে হত। পনের দিন আগে আমাদের জাহাজ যখন সিঙ্গাপুরে তখন এগুলো পরেছিলাম। ঘামে নোংরায় একেবারে চটচটে হয়ে গেছে। তা ছাড়া একটু চান করব—'

মানদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'লিশ্চয়ই চান করবে।' ঠোঁট কামড়ে কি একটু ভাবল সে, তারপর টিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'দেখ তো বাবা, একে মনে ধরে নাকি?'

সবার সঙ্গেই কথা বলছিল ফটিক, কিন্তু ঘুরে ফিরে তার চোখ বার বার টিয়ার ওপর গিয়ে পড়ছিল। মানদার কথায় এবার স্থির চোখে টিয়াকে দেখতে লাগল সে কিন্তু কিছু বলল না।

ও পাশ থেকে পেনো ফিসফিসিয়ে বলল, 'ধরেছে গো মাসি, ধরেছে। দেখছ না, টিয়াকে দেখতে দেখতে গুরুর চোখের পাতা পড়ছে না, একদম ফিক্সড হয়ে গেছে।'

পেনোর ঘাড়ে একটা ঠ্যাং তুলে দিয়ে ফটিক বলল, 'অ্যাই শালা ব্লাডি বাগার, চোপ—'

'আমি না হয় চুপ করছি, কিন্তু তুমি গেছ গুরু, হ্যা-হ্যা-হ্যা—' খ্যাল খ্যাল করে হাসতে লাগল পেনো।

মানদা টিয়াকে বলল, 'শোন ছুঁড়ি, ফটিকের য়ে ক'দিন ছুটি, তোর কাছেই থাকবে। দেখিস বাবার যেন অসুবিদে না হয়। ওকে এখন তোর ঘরে নে যা—'

কুসুম হঠাৎ চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'ভালো ভালো যে খদ্দের আসবে সব ও মাগীর ঘরে ঠেলে দেবে। সব সময় টিয়ার দিকে তোমার টান মাসি। আমরা বুঝি গাঙের জলে ভেসে এইছি।'

মানদা কুৎসিত ভাবে হাত-পা নেড়ে প্রায় তেড়েই গেল, 'আয়নায় মুখ দেখেছিস শুকনির বাচ্চা? ঘাটের মড়া ছাড়া তোর ঘরে ঢুকবে কে লা?'

এরপর দু'জনের মধ্যে কিছুক্ষণ কদর্য গালাগালির আদান-প্রদান হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দুম দুম পা ফেলে নিজের ঘরে চলে গেল কুসুম।

সে চলে যাবার পরও খানিকক্ষণ গজ গজ করল মানদা। তারপর টিয়াকে বলল, 'বসে রইলি কেন? ফটিককে নিয়ে যা—'

টিয়া চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করলে আমায় মনে ধরেছে কিনা। কই আমাকে তো জিজ্ঞেস করলে না—'

'তোকে আবার কী জিজ্ঞেস করব?'

'ওকে আমার ভালো লেগেছে কিনা?'

মুখ বাঁকিয়ে মানদা একটা অশ্লীল ছড়া কাটল। তারপর বলল, 'নে আর ন্যাকারা করতে হবে না।'

অন্য মেয়েগুলো ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'মাগীর দেমাক দেখলে গা জ্বলে যায়।'

টিয়া হাতের ওপরে ভর দিয়ে উঠতে উঠতে ফটিককে বলল, 'এসো—'

ওদিকে পেনো ঝট করে ফটিকের মালপত্র কাঁধে তুলে ফেলেছে। সে বলল, 'চল ফটকেদা, বাসর ঘরের দরজা পর্যন্ত তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি—'

উঠতে উঠতে একটা লাথি ছুঁড়েছিল ফটিক। কিন্তু তার আগেই এক লাফে অনেকটা দূরে সরে গেছে পেনো।

উঠোনের ওধারে পুব দিকের একটা ঘরে টিয়া থাকে। আগে আগে টিয়া, তার পেছনে ফটিক আর পেনো চলেছে। বারান্দায় মানদাকে ঘিরে যে মেয়েগুলো বসে আছে তাদের মুখ হিংসেয় পুড়ে যেতে থাকে।

যেতে যেতে পেনো নিচু গলায় বলতে লাগল, 'জব্বর একখানা জিনিস পেলে ফটকেদা। ঘরের বউ বললে ঘরের বউ, বাজারের মেয়েমানুষ বললে বাজারের মেয়েমানুষ—একের ভেতর দুটোই পেয়ে যাবে।'

ফটিক কিছু বলল না।

ঘরের কাছে এসে টিয়া বলল, 'বাইরে একটু দাঁড়াও, আমি আলোটা জ্বেলে নি।' শেকল খুলে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাইরে এখনও অল্প অল্প আলো থাকলেও ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে।

রাজানগরে কবেই ইলেকট্রিক আলো এসেছে কিন্তু এই মেয়েপাড়া পর্যন্ত পৌঁছয় নি। আসলে বিজলিবাতি জ্বালাবার মতো পয়সা তাদের নেই।

একটা হেরিকেন জ্বালিয়ে টিয়া ডাকল, 'জুতো-টুতোগুলো খুলে ভেতরে এসো।'

পেনো চটি খুলে ঘরে ঢুকল, মালপত্তর কাঁধ থেকে নামিয়ে গোছগাছ করে রাখতে লাগল।

ফটিক কিন্তু দারুণ খেপে গিয়েছিল। নগদ পয়সা খরচা করে ফুর্তি করতে মেয়েমানুষের বাড়ি এসেছে, তার হুকুমমতো চলতে হবে নাকি? তীব্র বিদ্রূপের গলায় সে বলল, 'তোমার ঘরখানা রাধা-কেষ্টর মন্দির নাকি যে জুতো খুলে ঢুকতে হবে!'

টিয়া বলল, 'জুতো না খুললে আমার ঘরে ঢুকতে দেব না।'

'মাইরি আর কি!'

এই সময় পেনো হৈ চৈ বাধিয়ে দিল, 'ওই দ্যাখো, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝামেলা বাধিয়ে দিলে! অ্যাই ফটকেদা, জুতোটা খুলেই ঢোকো না মাইরি। কত রাজ্যির নোংরা রয়েছে পায়ের তলায়। টিয়া আবার একটু পরিষ্কার-টরিষ্কার থাকতে ভালোবাসে।'

'ব্লাডি ব্যাস্টার্ড—' বিরক্ত মুখে গজ গজ করতে করতে জুতো খুলে ফেলল ফটিক। তারপর ভেতরে ঢুকল।

পেনো বলল, 'বাসর ঘরে ঢুকে পড়েছ। আমি মাকড়া আর থাকি কেন? স্রেফ ফুট হয়ে যাচ্ছি।' বলেই বেরিয়ে গেল। তারপর দরজার বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'তোমার যা মেজাজ মাইরি, আবার টিয়ার সঙ্গে খেয়োখেয়ি লাগিয়ে দিও না। হাজার হোক পয়লা দিন।'

'অ্যাই শালা, অ্যাই—' ফটিক দৌড়ে বেরিয়ে আসছিল। তার আগেই পেনো দ্রুত দরজাটা টেনে লাফ দিয়ে উঠোনে পড়ল। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আর ঝামেলা কোরো না, এখন লড়ে যাও গুরু।'

ফটিক বেরুল না। দরজাটা টেনে হাট করে খুলে এবার ঘরের ভেতরে তাকাল।

ঘরখানা সত্যিই খুব পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো-গোছানোও। একধারে তক্তাপোষে ধবধবে বিছানা পাতা, উল্টোদিকে ছোট আলনায় পরিষ্কার ক'টি শাড়ি-সায়া-টায়া চমৎকার করে রাখা। আরেক ধারে সস্তা কাঠের আলমারি, তার গায়ে বড় একখানা জলচৌকির ওপর আয়না-চিরুনি, স্নো-পাউডার-আলতার কৌটো। তক্তাপোষের ওধারে কাঠের ছোট সিংহাসনে কালীর পট। সেজন্য আলাদা বিছানা। তা ছাড়া আছে পুজোর বাসন, পেতলের প্রদীপ, ধূপদান, ফুলটুল। দেয়ালেও নানারকম

ঠাকুর-দেবতার ছবি। একটা লম্বা কাঠের তাকে অনেকগুলো বই যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

দেখতে দেখতে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল ফটিক। মেয়েপাড়ায় আজই তো প্রথম এল না। পনের ষোল বছর ধরে এখানে তার নিয়মিত যাওয়া-আসা। কিন্তু কোনওদিনই কারও ঘরে এত বইপত্তর, এত ঠাকুর-দেবতা দেখেছে বলে মনে করতে পারল না ফটিক। এ সব পাড়ার মেয়েদের ঘরের দেয়ালে দেয়ালে যা থাকে তা হল আধ-ন্যাংটো মেয়েমানুষদের ছবি। যারা চালাক-চতুর, খদ্দেরদের উত্তেজনা উসকে দিতে ঘরভর্তি কামকলা আব কোকশাস্ত্রের নানা ছবি সাজিয়ে রাখে।

শুধু এই রাজানগবেই নাকি, জাহাজে ভাসতে ভাসতে যে বন্দরেই ফটিক গেছে, এডেন-মোম্বাসা-ওসাকা-সিঙ্গাপুর-লিভারপুল-রটারডাম—সব জায়গাতেই মেয়েপাড়ায় প্রথমে হানা দিয়েছে। কিন্তু কোথাও এমন পূজারিণী মার্কা বেশ্যা আগে দেখে নি।

টিয়া হেরিকেনটা জ্বালিয়ে তার পাশেই বসে ছিল। বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।'

এদিক সেদিক তাকিয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে বসল ফটিক। বলল, 'মেলাই ঠাকুর-দেবতা জড়ো করে ফেলেছ দেখছি।'

টিয়া বলল, 'তা করেছি।'

ফটিক জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার বুঝি খুব ভক্তি?'

টিয়া উত্তর দিল না।

ফটিক তাকের বই টইগুলো দেখিয়ে আবার বলল, 'ওগুলো কী বই?'

'এই রামায়ণ-মহাভারত, নাটক নভেল-টভেল।'

'তুমি যে মাইরি খুব বিদ্বেন গো—'

টিয়া চুপ করে থাকল।

ফটিক বলতে লাগল, 'আমার চোদ্দ পুরুষ একসঙ্গে অত বই দেখেনি।'

টিয়া আবছাভাবে কী বলল বোঝা গেল না।

ফটিক আবার বলল, 'তোমার মতো বিদ্বেন মেয়েমানুষ এ পাড়ায় আগে আর কখনও দেখিনি।'

'তাই নাকি?'

'বিশ্বাস কর। মা কালীর দিব্যি—'

'ঠিক আছে। মা কালীকে আর টানাটানি করতে হবে না।'

একটু চুপ করে ফটিক বলল, 'যাক গে, অন্ধকার হয়ে এল। চানটা এবার সেরে ফেলি—'

‘এই কার্তিক মাসে সন্ধেবেলায় চান করবে?’

‘কী হয় করলে?’

‘সময়টা ভাল না, ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর না বাধিয়ে বসো।’

এক পলক তাকিয়ে আচমকা জোরে জোরে গলা ছেড়ে হেসে উঠল ফটিক।

টিয়া অবাক, ‘কী হল?’

‘তুমি দেখছি বিয়ে-করা ওয়াইফদের নাকে র‍্যাদা ঘষে দেবে। বলে কিনা ঠাণ্ডা লাগবে! ভয় নেই, সারা বছর রাত্তিরে চান করার অভ্যেস আছে আমার।’

টিয়ার মুখ দেখে চট করে তার মনের কথা বুঝবার উপায় নেই। সে বলল, ‘তেল, গামছা-টামছা দেব?’

‘কিচ্ছু দরকার নেই। আমার সঙ্গেই সব আছে।’ তক্তাপোষ থেকে উঠে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের ঢাউস স্টিলের বাক্সটা খুলে ফেলল ফটিক। তার ভেতর থেকে পাজামা, সাবান, আয়না চিরুনি, বিলিতি তোয়ালে, হেয়ার-ক্রিম বার করল। তারপর শুধু তোয়ালে আর পাজামাটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেল।

এই মেয়েপাড়ার ভেতরে একটা কুয়ো আছে। বাইরে রাস্তার ধারে রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটির একটা টিউবওয়েলও রয়েছে। টিউবওয়েলের দিকে আর গেল না ফটিক। সোজা কুয়োতলায় গিয়ে সাবান মেখে ভালো করে চান করল। তারপর শুকনো পাটভাঙা পাজামা পরে টিয়ার ঘরে ফিরে এল।

ভেজা প্যান্ট-জামা সঙ্গে করে এনেছিল ফটিক। সেগুলো বাইরের দড়িতে টাঙিয়ে দিয়ে এসে টিয়া দেখল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা ধবধবে কৌটো থেকে ক্রিম বার করে মুখে মাখছে ফটিক। ক্রিম মাখা হলে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ফটিক বলল, ‘এবার তোমার সঙ্গে কথাবার্তাটা পাকা করে নেব।’

টিয়া তক্তাপোষের পায়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, ‘কিসের কথাবার্তা?’

ফটিক বলল, ‘একমাস আমার ছুটি। ছুটির দিন ক’টা তোমার কাছেই থাকছি। কিরকম কী দিতে হবে বল—’

‘কিরকম বলতে?’

‘তুমি মাইরি একেবারে নেকী।’ ঘাড় ফিরিয়ে ফটিক বলল।

টিয়ার ভুরু কুঁচকে গেল, ‘ন্যাকামোর কী করলাম?’

চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছিল। আয়না চিরুনি নামিয়ে টিয়ার কাছে এসে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল ফটিক। বলল, ‘ক্যাশ না ফেলে বিয়ে-করা হাজব্যান্ডকেই ছুঁড়িরা পাশে শুতে দেয় না। আর তুমি হলে গিয়ে আমার টেম্পোরারি বউ। ভ্যানত্যাড়া না করে বল দিকি, একমাসের জন্যে কত টাকা নেবে? এক্ষুণি ক্যাশ ডাউন করব।’

টিয়া সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকাল, 'এক মাসই যে তোমাকে আমার কাছে থাকতে দেব, সেটা ধরে নিচ্ছ কেন?'

মেজাজ চড়ে গেল ফটিকের। গলার স্বর উঁচুত তুলে বলে, 'ক্যাশ দেব, থাকতে দেবে না মানে? ব্লাডি সোয়াইন, কুত্তীকা বাচ্চা—'

টিয়া হঠাৎ রুখে দাঁড়াল। তার চোখের তারা ঝলসে উঠল যেন, 'সন্ধেবেলা শুধু শুধু খিস্তি দিচ্ছ কেন? খিস্তি খাস্তা করলে আমার ঘরে থাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি, এক্ষুণি বার করে দেব।'

ফটিক ভীষণভাবে থতিয়ে গেল। আজ প্রথম না, সতের-আঠার বছর ধরে দুনিয়ার নানা মেয়েপাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কিন্তু টিয়ার মতো আগে আর কাউকে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। হাতে ক্যাশ গুঁজে দিয়ে শুধু খিস্তি-খাস্তা কেন, চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে যা ইচ্ছে করে যাও, ছুঁড়িগুলো দাঁত বার করে হেসে হেসে গায়ে ঢলে পড়বে—এতদিন ফটিকের এ-ই ছিল অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাদের সবার থেকে রাজানগরের টিয়া মেয়েটা একেবারে আলাদা।

হঠাৎ টিয়ার কাছ থেকে দরজার দিকে চলে এল ফটিক। বাইরে গলা বাড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'অ্যাই পেনো—এই ব্লাডি হারামী—'

এর মধ্যে সন্ধে পেরিয়ে গেছে। মেয়েপাড়ার ঘরে ঘরে হেরিকেন কিংবা কেরোসিনের ডিবে জ্বলে উঠেছে। এখন কার্তিকের মাঝামাঝি এই সময়টায় রাতের দিকে, অন্ধকারের সঙ্গে হিম মিশে আবছামতো হয়ে যায়। ঝাপসা অন্ধকার উঠোনের ওধার থেকে পেনো এসে হাজির হল। শেয়ালের মতো সন্দিগ্ধ চোখে ফটিককে দেখতে দেখতে বলল, 'বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলুম, তার ভেতর আবার পেনো মাকড়াকে ডাকাডাকি কেন? আমি শালা তো কাবাবমে হাড্ডি হয়ে যাব।' কথার মধ্যে আচমকা দু-চারটে হিন্দি শব্দ ঢুকিয়ে নেওয়া পেনোর অভ্যাস। হারামীটা রগরগে হিন্দি ছবি দেখে দেখে একেবারে ঘুণ হয়ে গেছে।

পেনো টিয়ার ঘরের ধার ঘেঁষে উঠোনেই দাঁড়িয়ে ছিল। হাতের ইশারা করে সে বলল, 'আয়, ভেতরে আয়।'

'ভেতরে যাব কেন?'

'আগে আয়, তারপর বলছি—'

পেনো ভয়ে ভয়ে শুধলো, 'আবার লাথি-ফাথি হাঁকড়াবে না তো?'

ফটিক বলল, 'না রে শালা, না—'

তবু ভয়টা কাটল না। খুব সতর্কভাবে, ফটিক পা বা হাত চালাবার তাল করলেই যাতে চট করে কেটে পড়া যায়, পেনো টিয়ার ঘরের বারান্দায় উঠে এল। আর ফটিক করল কি, লাথি বা থাপ্পড়, কোনওটাই কষাল না। আলতো করে তার

লিকলিকে সরু ঘাড়টা ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। টিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'এ কার ঘরে আমায় ঢুকিয়েছিস রে পেনো?'

ফটিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে একবার ফটিক, আরেক বার টিয়ার দিকে তাকাচ্ছিল পেনো। বলল, 'কী হয়েছে?'

'বলেছিলাম ব্লাডি-সোয়াইন-কুত্তীকা বাচ্চা, তাতেই ওর গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। চামড়া মাইরি একদম গোলাপ ফুলের পাপড়ি—'

পেনো দাঁত বার করে এবং টেনে টেনে তার স্বভাবের সেই হাসিটা হাসল, 'হে—হে—'

ফটিক আবার বলল, 'আমায় বলে কিনা ঘর থেকে বার করে দেবে—'

পেনো জড়ানো গলায় আবার হেসে উঠল, 'হে—হে—' তারপর চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগের মতোই দু'জনকে দেখতে দেখতে বলতে লাগল, 'তোমাদের দেখছি প্যার-মহব্বতের ঝগড়া। আমার আর এর ভেতর থাকা কেন? নিজেরাই ফয়সালা করে নাও গুরু। আমার এখন বাজারে ছুটতে হবে—' বলে আর দাঁড়াল না, ইঁদুরের মতো সুড়ুৎ করে দরজার ভেতর দিয়ে অন্ধকার উঠোনে গিয়ে নামল।

টিয়া দু চোখে আগুন নিয়ে ফটিককে দেখছিল। এবার বলল, 'দেখ, এসব রং-তামাশা আমার ভালো লাগে না।'

ফটিক বুঝতে পারছিল, পেনোকে ডেকে আনার জন্য খুবই চটে গেছে টিয়া। সে বলল, 'আর কী কী তোমার ভালো লাগে না?'

'অনেক কিছুই—'

ফটিক এবার করল কি, টিয়ার কাছে গিয়ে তার গলা দু হাতে জড়িয়ে বলল, 'তুই মাইরি ভুল করে এ পাড়ায় চলে এসেছিল। শালী আমার সতী! ব্লাডি বাস্টার্ড।'

ব্লাডি বাস্টার্ডটা সব সময় গালাগালের জন্য বলে না ফটিক। ওটা তার কথার মাত্রা।

এক ঝটকায় ফটিকের হাত সরিয়ে দিয়ে টিয়া বলল, 'ফের, ফের খেউড় শুরু করলে! তোমাকে না তখন বারণ করে দিলাম।'

'ইচ্ছে করে বলি নি রে—' খানিকটা আপসের সুরে ফটিক বলল, 'গলার ভেতর থেকে কেমন করে যেন হড়কে বেরিয়ে এল। যাক্‌ গে, আর ঝঞ্ঝাট না করে দর-দামটা ঠিক করে ফ্যাল, এক মাসের জন্যে তোকে কিনে ফেলি।'

টিয়া কিছু বলল না, স্থির চোখে তাকিয়ে রইল শুধু।

ফটিক নিজের অজান্তেই তুই টুই শুরু করে দিয়েছিল। তা-ই চালিয়ে যেতে লাগল, 'চোখ যে তোর গোল্লা পাকিয়ে গেল। বলে ফ্যাল কত নিবি?'

টিয়া এবার বলল, 'আগে তোমায় দু-একদিন দেখি, তারপর কেনাকিনির কথা

উঠবে।'

'বুঝেছি।'

টিয়া কিছু বলল না, আগের মতোই তাকিয়ে থাকল।

ফটিক বলতে লাগল, 'আমি কেমন স্যাম্পল না দেখে বুঝি নিজেকে বেচবি না! অল রাইট—দেখেই নে তা হলে।'

টিয়া এবারও চুপ।

ফটিক বলল, 'মুখ বল্ট এঁটে, চোখে হেডলাইট জ্বেলে তাকিয়ে থাকলে কি ভালো লাগে! কাছে আয়—'

টিয়া এক মুহূর্ত কী ভাবল, তারপর পায়ে পায়ে ফটিকের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছ?'

হাত ধরে টিয়াকে পাশে বসিয়ে ঝট করে তার গালে চার পাঁচটা চুমু খেয়ে নিল ফটিক। টিয়া এবার ঝটকা মারল না, চুমু খাওয়া হলে খুব শান্ত ভাবে শাড়ির আঁচল দিয়ে গাল দুটো মুছে নিল।

ফটিক বলল, 'তুই যেন মাইরি কেমন!'

'কেমন?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

টিয়া হাসল, 'বেঠিকই বল না।'

ফটিক বলল, 'ভেবে পরে বলব।'

'আচ্ছা।'

একটা ব্যাপার আগাগোড়া লক্ষ করেছে ফটিক, সেই তখন থেকে তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে টিয়া। বলল, 'কী ব্যাপার রে, অমন করে চেয়ে আছিস?'

টিয়া বলল, 'তোমাকে দেখছি।'

'আমি কি দেখবার মতো মাল?'

'এখনও বুঝতে পারছি না। দেখি দিনকতক।'

'দেখেই যা।'

আবার কী বলতে যাচ্ছিল ফটিক, সেই সময় বাইরে পেনোর গলা শোনা গেল, 'গুরু—'

'কী বলছিস?'

'খুব জমে গেছ নাকিন?'

'জমতে আর পারছি কই, বার বার ছানা কেটে যাচ্ছে রে—' বলে চোখের কোণ দিয়ে টিয়াকে একবার দেখে নিল ফটিক।

'না জমে থাকলে পরে জোমো। এখন টিয়াকে নিয়ে একবার বাইরে এসো

দিকিন।'

'কেন?'

'মাংস-ফাংস নিয়ে এইছি। সবার ইচ্ছে মাংসটা টিয়াই রাঁধবে—'

টিয়া বেরিয়ে গেল, দেখাদেখি ফটিককেও বেরুতে হল।

টিয়া বলল, 'মাংস কোথায়?'

পেনো বলল, 'মাসির ঘরে রেখিছি।'

'ঠিক আছে, আমিই রাঁধব।'

'রগরগে করে বানাস দিদি, বাংলা মালও এনিছি। যা জমবে না!'

টিয়া বড় বড় পা ফেলে চলে গেল।

ফটিকরাও দাঁড়াল না। পাতলা অন্ধকারে পাশাপাশি যেতে যেতে পেনো চট করে একবার ফটিককে দেখে নিয়ে বলল, 'জিনিসখানা কেমন গুরু!'

পেনো কার কথা বলছে বুঝতে অসুবিধে হল না ফটিকের। বললে, 'সবে তো দেখলাম। এক্ষুণি কী করে বলব—'

পেনো আগ্রহের সুরে বলল, 'যেটুকু দেখলে তাতে কী মনে হল?'

'শালী খুব খেলবে মনে হচ্ছে।' ফটিক বলতে লাগল, 'মাঝে মাঝে স্পার্ক দ্যায়, আবার কেমন যেন ফিউজ মেরে যায়। দেখি কদ্দূর খেলে!' একটু থেমে আবার বলল, 'এ রকম জিনিস বাপের জন্মে দেখি নি।'

পেনো খিসখিসিয়ে হেসে উঠল, 'জিনিসখানা তাহলে পচন্দ হয়েছে—'

ফটিক কিছু বলল না।

পেনো আবার বলল, 'গুরু তুমি মাইরি পটকে গেছ।'

ফটিক খেঁকিয়ে উঠল, 'অ্যাই—অ্যাই শালা ব্লাডি সোয়াইন, ফটকে হোল ওয়ার্ল্ডের অনেক মেমসাহেব মাগী দেখেছে। একটা দিশি কেলে ছুঁড়ি দেখে অত সহজে সে পটকায় না।'

পেনো এবার এক কাণ্ডই করে বসল। চাপা রগড়ের গলায় খ্যাকখেঁকিয়ে গেয়ে উঠল, 'ও কালে হায় তো ক্যা হুয়া দিলবালী হায়। ও তেরে তেরে—'

ফটিক অকারনেই খেপে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল, 'বাস্টার্ড, হারামী কাঁহাকা!' বলেই অন্ধকারে লাথি হাঁকড়াল কিন্তু আগে থেকেই গন্ধ পেয়ে ঝট করে সরে গিয়েছিল পেনো।

মানদার দাওয়ায় এখন মেলা বসে গেছে। মানদা তো ছিলই, পাড়ার অন্য মেয়েরাও আছে। এমন কি কুসুমও এসেছে। খানিক আগের রাগ-টাগ আর তার নেই।

এধারে ওধারে তিন-চারটে হেরিকেন জ্বলছিল। মেয়েরা গোল হয়ে বসে কেউ আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল, কেউ পেঁয়াজ কাটছিল, কেউ বাটনা বাটছিল। চার-পাঁচজন মাংস বেছেবুছে সমান মাপে টুকরো টুকরো করে কাটছিল। টিয়াও তাদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। হাতের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখও চলছিল। কথা আর কথা। সবাই দারুণ খুশি। কথায় কথায় হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল।

আজকের এই রাতটা একেবারে আলাদা। অন্য দিন এতক্ষণে মুখে রং মেখে, চটকদার উলঙ্গ বাহার শাড়ি পরে সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। পেটের জন্য দাঁতাল-মাতাল যে-ই আসুক তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসতে হয়।

প্রতিদিনের সেই নোংরা কুৎসিত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজকের এই রাতটা যেন ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। দু-এক বছর পর পর ফটিক যেদিন এই মেয়েপাড়ায় আসে সেদিনটা সব রকম গ্লানি থেকে তাদের মুক্তি, পেটের ধান্দা থেকে ছুটি। এই দিনটা তাদের মোটামুটি একটা উৎসবেরই দিন।

ফটিককে দেখে সাড়া পড়ে গেল। মানদা তার ঘর থেকে সেই মোড়াখানা আবার বার করে এনে বলল, 'বসো বাবা, বসো—'

ফটিক বসলে তার পায়ের কাছে ঘন হয়ে বসল পেনো।

পেঁয়াজ কুচোতে কুচোতে ঘাড় ফিরিয়ে টগর বলল, 'অ্যাদ্দিন পর তুমি এলে, বড্ড ভালো লাগছে গো ভালোদাদা।'

এই মেয়েটাকে বেশ ভালো লাগে ফটিকের। পয়সা ফেলে গায়ে গায়ে দাম তোলার মতো সম্পর্ক কোনওদিনই তার সঙ্গে হয় নি। প্রথম থেকেই মেয়েটা গায়ে পড়ে দাদা ডেকেছে। যদিও ফটিক পয়লা নম্বরের লুচ্চা, মাতাল, তবু তার পক্ষে যতটা সম্ভব টগরকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। অল্প হেসে সে বলল, 'পেনো যা মাংস-ফাংস এনেছে তাতে সবার হবে তো?'

'হয়েও বেশি। কাল বাসিও খাওয়া যাবে। পেনো মুখপোড়া একেবারে বিয়ে বাড়ির বাজার করে এনেছে।'

ওধার থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল, 'কার বিয়ে লা টগরী?'

টগর একটু ভেবে নিয়ে আড়ে আড়ে টিয়াকে দেখতে দেখতে বলল, 'কার আবার, টিয়ার।'

আর একটি মেয়ে চাপা গলায় বলল, 'বিয়ে না লা, সাঙা—'

আর আচমকা লাফিয়ে উঠে পাক দিয়ে নাচতে নাচতে উলু দিতে লাগল পেনো।

মুখ বাঁকিয়ে টগর বলল, 'মরণ।'

হাসতে হাসতে মানদা বলল, 'মুখপোড়ার কাণ্ড দ্যাখো।'

ফটিক ঘাড় ধরে পেনোকে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'খুব হয়েছে মাকড়া—'

পেনো মুখটা করুণ করুণ করে বলল, 'ফুত্তি হয়েছিল, তার বারোটা বাজিয়ে দিলে ফটকেদা—'

ফটিক বলল, 'শালা তোমার ফুর্তি! এমন কোতকা হাঁকড়াব, গঙ্গার ওপারে গিয়ে পড়বি।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'তা হ্যাঁ রে ব্লাডি সোয়াইন—'

'বল গুরু—'

'মাল মাংস-টাংস এল, আমাদের মেসোকে বলে এয়েছিস?'

'মেসো, ভগ্নিপতি, জ্যাঠা—সব্বাইকে খবর দিয়ে এসিছি। দ্যাখো না, একটু পর কি রকম সুট সুট করে হাজির হয়। একে তুমি এয়েছ, তার ওপর মাল-মাংস আছে, শালারা এল বলে।'

মেসো হল সঞ্জীবনী আয়ুর্বেদ ভবনের শশী কবিরাজ—শশিভূষণ সেন ভিষকরত্ন। এই লোকটা বাড়িউলি মানদার ভালবাসার মানুষ। মাসির সঙ্গে তাকে জুড়ে মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা এবং এখানে যাদের নিয়মিত যাতায়াত তারা শশী করিবাজকে বলে মেসো।

ভগ্নিপতি হল ফোটোর দোকানের মন্মথ। মন্মথ টগরের ভালোবাসার মানুষ। টগরের সঙ্গে ফটিকের ভাইবোন সম্পর্ক। সেই সুবাদে মন্মথ হল ভগ্নিপতি।

দেশি মদের দোকানের প্রোপ্রাইটর বৃন্দাবনকে সবাই বলে জ্যাঠা, খুব সম্ভব তার ভারিক্কি ধরনের চেহারা বলে। এই লোকটা মালতী বলে মেয়েটির ভালোবাসার মানুষ। বৃন্দাবনকে জ্যাঠা বললেও মালতীকে কেউ অবশ্য জ্যাঠাইমা বলে না।

অনেক রাত্তিরে মেয়েপাড়ার বিকিকিনি বন্ধ হয়ে গেলে তিনজনে ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে যে যার মেয়েমানুষের ঘরে ঢুকে পড়ে।

ফটিক আবার কী বলতে যাচ্ছিল, খোলা সদর দরজায় মাতালের গলা শোনা গেল। একটা মধ্যবয়সী লোক টলতে টলতে এগিয়ে আসছিল, 'কোথায় গেলে গো অপ্সরীরা, ইন্দ্রপুরী আজ অন্ধকার কেন?'

লোকটাকে চেনা গেল—রাজানগরেরই এক দোকানদার। মানদা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বলল, 'আজ এখানে হবে না, অন্য জায়গায় যাও—'

লোকটা লাল চোখ মেলে জড়ানো গলায় বলল, 'রাজনগরের এই একটাই তো যাবার জায়গা। সগ্‌গ গো সগ্‌গ।'

মানদা তাকে অনেক বোঝালো কিন্তু লোকটা নড়ে না। খালি বলে, 'এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি নে।' মানদা খুব একটা চটাচটি করতে পারছিল না। হাজার হোক রোজকারের খদ্দের। তবু কড়া গলায় বলল, 'আজ যাও, কাল এসো—'

'কী বলছ চাঁদবদনী! আজকের আনন্দটা মাটি করে দিতে চাও।'

'ভাগো তো—'

'তাড়িয়ে দিলে মরে যাব মাইরি—'

'কি পিবিত্তি (প্রবৃত্তি) তোমার! বারোমাস নিত্যিদিনই তো আসছ, একটা দিন ক্ষ্যান্ত দিতে পার না?'

'পারি না রে সুধামুখী, পারি না—'

'আজ পারতে হবে।'

মাথাটা ঘাড়ের উপর ঠিক স্থির থাকছিল না। অনবরত দুলছিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সেটাকে খাড়া করবার চেষ্টা করল লোকটা। তারপর বলল, 'ব্যাপার কী, গভরমেন্ট হপ্তার দেড় দিন তোমাদের দোকানদারি বন্ধ করে দিয়েছে?'

এবার নিজের স্বরূপে দেখা দিল মানদা। চোখ পাকিয়ে কোমরে আঁচল গুঁজে নাকের নথ নেড়ে বলল, 'এবার যাবি গু-খেকোর ব্যাটা, না ঘাড় ধরে বার করে দেব?' বলেই পেছন ফিরে ডাকল, 'পেনো—'

লোকটা ঘাড় ধরবার কথায় খানিকটা ধাতস্থ হল। বলল, 'কি, এতবড় আস্পদ্ধা, বাজারের মেয়েমানুষ! আর আসব না এই ভাগাড়ে।'

'না আসবি না আসবি। মেয়েমানুষের গায়ে মাংস থাকলে তোর মতো কত শ্যাল-কুকুর এসে হাজির হবে।'

এর মধ্যে পেনো এসে পড়েছিল। মাতালটাকে সে তাড়িয়ে রাস্তায় তুলে দিয়ে একটু পরে ফিরে এল।

মানদা তাকে বলল, 'তোকে না বলেছিলাম সন্ধেবেলা সদরের কাছে বসে থাকবি, মড়াগুলোকে ঢুকতে দিবি না?'

পেনো ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'তোমরা এখানে বসে গল্প করবে, রগড় করবে, আমি শালা স্ট্যাচু হয়ে সদর দোর আগলাব!'

কথাটা ভাববার মতো। একটু চুপ করে থেকে মানদা বলল, 'তা হলে এক কাজ কর, সদর দোরে হুড়কো লাগিয়ে দে।'

দরজা বন্ধ করে পেনো তার জায়গায় ।ফরে হল। তারপর চলল নানা রকম গল্প, রগড়, আমোদ আর আতসবাজির ফুলকির মতো হাসি। ফটিকই গল্প করছিল বেশি, জাহাজের গল্প, সমুদ্রযাত্রার মজার মজার কাহিনী।

এর মধ্যে মাংস ধুয়ে-টুয়ে টিয়া উনুনে চাপিয়ে দিয়েছে। অন্য মেয়েরা হাতে হাতে তাকে সাহায্য করছিল।

এ-সবের ফাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাতালেরা এসে সদরে ধাক্কা দিচ্ছিল, কেউ কেউ আবার পাঁচিল টপকে ঢুকবার চেষ্টা করছিল। পেনো বার বার উঠে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে আসছিল। যারা পাঁচিল টপকাতে চাইছিল, লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তাদের ওধারে ফেলে দিচ্ছিল।

রান্না-বান্না চুকতে চুকতে মাতালদের ঝামেলা কমে গেল। তারও কিছুক্ষণ পর সদরে ধাক্কা পড়ল, 'দোর খোল রে।'

পেনো বলল, 'কে তুমি?'

'আমরা রে আমরা।'

গলার স্বরে বোঝা গেল শশী কবরেজরা এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পেনো দরজা খুলে দিল। শশী মন্মথ বৃন্দাবন ভেতরে ঢুকতেই আবার সদর বন্ধ করল।

শশী বলল, 'দোরে খিল দিয়ে রেখেছিস কেন?'

কারণটা এক কথায় জানিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে মানদার দাওয়ায় এসে উঠল পেনো।

শশীর বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। পরনে গলাবন্ধ ধুসো কোট আর ধুতি, কোঁচা লটপট করছে, মুখময় তিনচার দিনের কাঁচা পাকা দাড়ি, ঢিবির মতো নাকের দু'ধারে গোল গোল চোখ। মাথার জায়গায় জায়গায় চর পড়ার মতো টাক। মাথার ক্ষতিপূরণ হয়েছে অন্যভাবে। নাক-কানের ভেতর থেকে গোছায় গোছায় লোম বেরিয়ে ঝুলে আছে। রাজানগর স্টেশনের কাছে তার বাড়ি আছে, ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে জমজমাট সংসার আছে। সপ্তাহে তিন দিন বাড়িতে থাকে শশী, বাকি চারদিন মানদার জন্য বরাদ্দ। শশী মাঝে মাঝে রগড়ের গলায় বলে, 'আমার চারদিন শ্রীরাধিকের, তিনদিন চন্দ্রাবলীর।' শালা যেন সার্কাসের দড়ির খেলা জানে। একদিকে বউ, আরেক দিকে মেয়েমানুষ, তিরিশ বছর ধরে দু'দিক সামলে যাচ্ছে।

বৃন্দাবনের ছেলেমেয়ে, ঘর-সংসার কেউ নেই, কিছু নেই। সে দু-কান কাটা, সারাদিন বেচাকেনার পর বেশ রাত হলে দোকান বন্ধ করে চলে আসে মালতীর কাছে। মালতীর ঘরেই তার বাক্স বিছানা, নিজের বলতে যা কিছু সবই থাকে। 'বৃন্দাবনের বয়েস পঞ্চাশ বাহান্ন। কালো থলথলে শরীর, আমড়া আঁটির মতো বড় বড় চোখ, শুয়োরের রোঁয়ার মতো খাড়া খাড়া চুল। পরনে ধুতি, তার ওপর হাফ শার্ট।

ফোটোর দোকানের মন্মথর বয়স চল্লিশের মতো। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, কাটা কাটা মুখ, ধারালো চিবুক, ফর্সা রং। মন্মথ বেশ সৌখিন মানুষ। টেরেলিনের প্যান্ট, টেরিনের শার্ট হাঁকায় সে। চোখে দামি গগলস লাগায়, পায়ে নকশাদার চপ্পল। নদীর পারে শ্মশানে যত মড়া আসে তাদের ছবি তোলাই তার কাজ।

মন্মথরও কবিরাজের মতো বউ ছেলেমেয়ে আছে। নদীর ওপারে শ্বশুরবাড়িতে ওরা থাকে। তার ভালোবাসার মানুষ হল টগর।

প্রায়ই নদীর ওপার থেকে মন্মথর বউ এসে মন্মথকে নিয়ে যায়। কোনওদিন না আসতে পারলে টগর তার ঘরে ধরে নিয়ে আসে। মন্মথ বলে, 'আমি বাওয়া

বেওযাবিশ মাল, যে এসে ছোঁ মাবতে পাববে আমি তার। ছেলে বযেসে ঠাকমা গল্প বলত, পাখি এখন তুমি কাব? পাখি বলে, যাব হাতে তাব। আমাব হল তা-ই। যখন টগব ধবে তখন টগবেব, যখন বউ ধবতে পাবে তখন বউব—' মন্মথকে নিযে বছবেব পব বছব তাব বউ আব টগবেব ভেতব দড়ি-টানাটানি চলে আসছে।

ওদেব দেখে ঘব থেকে আবও তিনটে মোড়া বাব কবে আনল মানদা। বসতে বসতে মন্মথ বলল, 'বেশ জমিযে বসেছিস যে বে ফটকে–'

ফটিক হাসল, 'হাঁ বসেছি।'

এবপব কে কেমন আছে, কাজ কাববাব কেমন চলছে, বাজানগবেব নতুন কোনও খবব আছে কিনা, ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞেস কবল ফটিক। ওবাও জাহাজে জাহাজে দু'বছব ধবে ফটিক কোথায় কোথায় ঘুবেছে তাব খবব নিল।

এইসব এলোমেলো কথাব ফাঁকে হঠাৎ পেনো বলে উঠল, 'গল্প কবে কবেই তোমবা বাত কাবাব কবে দেবে নাকি? আমাব মাইবি বড্ড খিদে পেযে গেছে, পেটেব ভেতব শালা যেন ছুচ ফুটছে।'

সবাই প্রায একই সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢেব বাত হযে গেছে। এবাব খাওযা-দাওযাব ব্যাবোস্থা কব।'

মানদা বলল, 'ব্যাবোস্থা আব কি, বান্না তো হযেই গেছে। অ্যাই মেযেবা খাবাব জাযগা কবে ফ্যাল -'

পেনো বাজাব থেকে কলাপাতা আব মাটিব গেলাস নিযে এসেছিল। মেযেবা ঢালা বাবান্দায সাবি সাবি পাতা পেতে পাশে পাশে গেলাস বসিযে দিল। টিয়া, টগব আব মানদা বাদে অন্যবা খেতে বসে গেল। সবাই একসঙ্গে বসলে পবিবেশন কববে কে?

খেতে খেতে মন্মথ বলল, 'মাংসটা মাইবি যা বগবগে হযেছে।'

পেনো বলল, 'হবে না। কে বেঁধেছে দেখতে হবে তো—'

শশী কববেজ জিজ্ঞেস কবল, 'কে বেঁধেছে বে?'

'টিযা—'

ওধাব থেকে টগব বলল, 'বাঁধবে না কেন, ওব পেবাণে এখন কত ফুত্তি।'

খেতে খেতে মুখ বাঁকিযে কুসুম বলল, 'ফুত্তি একেবাবে গেঁজে গেঁজে তাড়ি হযে উঠেছে।'

বৃন্দাবন শুধলো, 'খাওযাচ্ছে তো ফোটকে, টিয়ার অত ফুত্তি কেন?'

পেনো বলল, 'ফটকেদাকে মাসি এবাব টিয়ার হাতে তুলে দিয়েছে যে গো জ্যাঠা। ছুটির মাসটা গুরু আমাব টিয়ার কাছে থাকবে।'

বৃন্দাবন গম্ভীর চালে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'বেশ বেশ, টিয়া আমাদের

বড় ভালো মেয়ে।'

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আরেক দফা হাসি-ঠাট্টা, অশ্লীল রসিকতা এবং নানা ধরনের কথা হতে লাগল।

ফটিকদের খাওয়া হলে টিয়ারা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। গলা পর্যন্ত খেয়েও প্রচুর মাংস বেঁচে গেল। পরের দিনের জন্যে সেগুলো ভালো করে ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখল মানদা।

ফটিক বলল, 'অ্যাদ্দিন পর এলাম। সব বার গান বাজনা হয়, এবার একটু হবে না?'

পেনো প্রবল উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, 'জরুর হোগা, আভ্‌ভি হোগা। টগর, তোর হারমোনিয়াটা বার কর।'

টগর তার ঘর থেকে একটা রিড-ভাঙা বেলো-ফেঁসে-যাওয়া পুরনো হারমোনিয়াম বার করে আনল।

পেনো টিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোরই তো আজ দিন, কড়া দেখে একখানা গেয়ে ফ্যাল। দিল তর করে দে মাইরি—'

টিয়া বলল, 'আমি গাইতে পারব না, টগর গাক।'

টগর বলল, 'উঁহু, কুসুম গাক—'

কুসুম অশ্লীল মুখভঙ্গি করে বলল, 'গানের মাথায় খ্যাংরা—'

বিরক্ত মুখে মানদা বলল, 'ছুঁড়িদের কত যে ঠ্যাকার! কাউকে গাইতে হবে না, আমি গাইছি।' বলেই হারমোনিয়ামটা টেনে বসে গেল ঃ

'ভালোবাসিবে বলে ভালবাসি নে
আমার এই রীতি তোমা বই
জানি নে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি
দেখা দিতে আসি নে।'

মানদার গলা এককালে মিষ্টিই ছিল। এখন বয়সের ভার পড়েছে সেখানে, সূক্ষ্ম কাজগুলো আর ফোটে না, সুর চড়ায় তুলতে গেলে গলা ফেঁসে যায়। তবু ভালোই গাইল সে।

ফটিক হেসে হেসে বলল, 'গানে কার মনের কথা বললে গো মাসি, আমাদের মেসোর নাকি?'

চোখের কোণে কোবরেজকে বিদ্ধ করতে করতে মুখ কোঁচকাল মানদা, 'মরণ!

মনের কথা বলবার আর লোক পেলাম না!'

শশী কবরেজ গলার ভেতর ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ করল।

পেনো ওধার থেকে বলে উঠল, 'মাসি তুমি গেয়েছ ভালো কিন্তু ওসব বস্তাপচা মাল। আজকাল আর চলে না।'

মানদা রাগ করল না। হেসে বলল, 'তা কী করব বল। আমরা তো আজকালকার লোক না। পুরনো গান ছাড়া কিছুই জানি না বাপু। সে আমলে আমরা কুসুমকুমারীর গান শুনতাম, আঙুরবালা নীহারকণার গান শুনতাম। আহা কানে যেন লেগে আছে।'

পেনো বলল, 'ওসব কুসুমকুমারী-টুমারী ছাড়ো, হিন্দি-ফিন্দি না হলে এখন আর জমে না। এই টগর, ধর না মাইরি একটা—'

টগর বলল, 'তখনই তো বললাম, গাইব না।'

'শালী তোদেব পায়ে কত তেল রগড়াব বল তো? এত করে বলছি—'

টগর আর কিছু না বলে হারমোনিয়মটা টেনে গান ধরে দিল ঃ

'দম মারো দম
বীত যায়ে হাম
বোলো সুবহ্ সাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম—
দম মারো দম—'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো পেনো। ফটিককে বলল, 'গানা হোগা, নাচা নেহী হোগা?'

ফটিক বলল, 'জরুর।'

'কার মতো নাচব—হেলেন, জয়শ্রী-টি না বিন্দু?'

ফটিক হিন্দি ছবি-টবি বিশেষ দ্যাখে না, দেখবার সুযোগই নেই। মাসের পর মাস সে দেশের বাইরে পড়ে থাকে। যে পোর্টেই তাদের জাহাজ ভেড়ে সেখানে হিন্দি-টিন্দির কারবার নেই, শুধু রগরগে হলিউডের ছবি। ন্যাংটো মেমসাহেব কিংবা বন্ড মার্কা ঝাঁঝালো দম-আটকানো কাণ্ডকারখানা। তার মানে শুধু ইংরেজির ব্যাপার। সে বলল, 'ওরা সব কারা রে?'

'উরি ব্বাস!' চোখ-মুখ গোল করে একটা মজাদার ভঙ্গি করল পেনো, 'ওরা সব গরম মসলা। হেলেন এই বয়েসেও চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক হ্যায়, বিন্দুই লাগাচ্ছি—' বলেই কোমরে হাত দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দারুণ দারুণ মজাদার ভঙ্গি করে নাচতে লাগল। তার নাচ দেখে হেসে হেসে মরে যেতে লাগল মেয়েরা। মানদা বলল, 'মুখপোড়ার মরণ!'

হাসতে হাসতে ফটিকের দম আটকে আসছিল। তার মধ্যেই সে বলতে লাগল,

'ব্লাডি সোয়াইন। কুত্তীকা বাচ্চার কারবারটা দ্যাখো! শালাকে এমন রগড়ান দেব, হাড্ডি ঢিলে হয়ে যাবে।' পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে আলতো করে সে লাথি মেরে যেতে লাগল।

টগর একটার পর একটা হিন্দি গান চালিয়ে যাচ্ছে। 'দম মার দম'-এর পর 'দিল মেরে দিওয়ানা, পেয়ার মেরে মস্তানা' ইত্যাদি।

গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় থেমে গেল টগর কিন্তু পেনো আর থামে না। আরও আধ ঘন্টা নেচে দুম করে এক সময় বসে পড়ল। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে, আধ হাত জিভ বার করে বসে বসে হাঁপাতে লাগল।

বাদবাকি সবাই হেসে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে পড়তে পেনো মানদার দিকে ফিরে বলল, 'হেসে হেসে তো ময়দা মাখা হয়ে যাচ্ছ মাসি, আসল জিনিসগুলো এবার বার কর।'

মানদা কোনও রকমে হাসিটা একটু সামলে বলল, 'কী জিনিস রে পোড়ারমুখো?'

'ভুলে গেলে!' পেনো জিভের ডগা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উচ্চারণ করল, 'সু-উ উ-ধার বোতল—'

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হল্লা শুরু হয়ে গেল, 'মাল বার কর মাসি, মাল বার কর।'

বৃন্দাবন বলল, 'ভাত খাওয়ার পর কেউ মাল খায়!'

পেনো বলল, 'তুমি আর বাগড়া দিও না মেসো। সুধা খাব, তার আবার ভাতের আগে পরে কী?'

ফটিক চেঁচিয়ে উঠল, 'যা বলেছিস পেনো! বার কর গো মাসি—'

ঘর থেকে বোতলগুলো আর মাটির খোরা বার করে আনল মানদা, পটাপট ছিপি খোলা হয়ে গেল। তারপর খোরায় ঢেলে ঢেলে সবাই চুমুক দিতে লাগল।

এক টানে তার খোরাটা আধাআধি কাবার করে পেনো বলল, 'এতক্ষণে শালা জমেছে।'

কবরেজ আর বৃন্দাবন পাশাপাশি বসে ছিল। বৃন্দাবন বলল, 'হ্যাঁ গো মেসো আজ বুধবার, আজ তো ছিরাধিকের কাচে থাকবার কথা! ঢের রাত হয়ে গেল। বাড়ি যাবে না?'

সোম, বুধ, শুক্র আর রবি, এই চারদিন শ্রীরাধিকা অর্থাৎ বিয়ে করা বউর কাছে কাটায় শশী কবরেজ। বাকি দিন ক'টা মানদার কাছে। দ্রুত একবার মানদাকে দেখে নিয়ে সে বলল, 'আজ আর বাড়ি ফিরছি না, ভাবছি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেই থেকে যাব।'

মানদা চোখ মুখ কুঁচকে বলল, 'ড্যামনার মুখে আগুন।' কবরেজ সম্বন্ধে এটাই তার প্রেমের চরম প্রকাশ।

বোতলের পর বোতল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে এবং পুরুষ, সবাইর চোখ এখন লাল টকটকে। তাদের গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। মাথা টলছে।

সবাই খাচ্ছে। একজন বাদ, সে টিয়া। এক কোণে চুপচাপ বসে ওদের লক্ষ করছিল টিয়া।

মাল খেতে বসলে আর হুঁশ থাকে না ফটিকের। কিন্তু খেতে খেতে হঠাৎ টিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অ্যাই, তুই খাচ্ছিস না যে শালী?'

টিয়া আস্তে করে বলল, 'আমি মদ খাই না—'

'মাইরি আর কি। পয়সা খরচা করে জিনিস আনালাম। না খেলেই হল!'

মানদা বলল, 'না না বাবা, ও এসব খায় না—'

'আলবত খাবে। আমার পয়সায় যত ফালতু মালেরা খাবে আর আমার টেম্পুরারি বউই শুধু খাবে না?' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ফটিক। পেনোকে বলল, 'ধর তো মাগীকে, হাঁ কবিয়ে সগ্‌গের সুধা চাখিয়ে দিই।'

অত নেশার মধ্যেও মানদার মাথা বেঠিক হয় নি। সে বলল, 'কী করছ বাবা, টিয়া এসব পচন্দ করে না।' তার গলায় টিয়া সম্পর্কে কিছুটা সম্ভ্রমেরই সুর।

কালীমার্কা খেয়ে ফটিকের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। আরক্ত চোখে মানদাকে দেখতে দেখতে সে চিৎকার করে উঠল, 'ইউ শাট আপ শালী। পেনো—'

পেনো গলা পর্যন্ত মদ গিলে দাওয়ার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল। তার চোখ জুড়ে এসেছে। অতি কষ্টে তাকিয়ে গোঙানির মতো শব্দ করে বলল, 'কে টিয়া চিনতে পারছি না গুরু। আমার শালা হয়ে গেছে।' বলেই আবার এলিয়ে পড়ল, তক্ষুণি তার দু চোখ জুড়ে গেল।

'ঠিক হ্যায়, আমিই খাওয়াচ্ছি। কাউকে দরকার নেই। শালী সতীর বাচ্চা!'

কিন্তু টিয়ার কাছে যাবার আগেই সে উঠে পড়ল এবং দ্রুত উঠোনে নেমে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে খিল আটকে দিল। এলোমেলো পায়ে দুলতে দুলতে ফটিক তার ঘরের কাছে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল, 'অ্যাই টিয়া খোল, খোল বলছি—'

টিয়া উত্তর দিল না।

ধাক্কার বদলে এবার লাথি চালাতে লাগাল ফটিক, 'ইয়ার্কি আমার ভাল লাগে না বলছি, অ্যাই শুয়ারকা বাচ্চা।' ফটিকের মধ্যে থেকে বেপরোয়া মাতাল খিস্তিবাজ নিষ্ঠুর একটা লোক বেরিয়ে আসতে লাগল যেন।

টিয়া এবারও সাড়া দিল না, দরজাও খুলল না।

ফটিক জড়িত স্বরে হল্লা করতে লাগল। অশ্লীল খিস্তি দিতে দিতে বলল, 'বাজারের মাগীর দেমাক কত! একেক শালা কিক ঝাড়ব, চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলে যাবি।' বলতে বলতে টলমল পা আর মাথা খাড়া রাখতে পারল না। হুড়মুড় করে

ভেঙে পড়তে পড়তে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। তার এই এক ব্যাপার, বেশি নেশা করে ফেললে বমি করে ভাসিয়ে দেয়।

ফটিক লক্ষ করে নি, অন্ধকারে আরেকজন তার পিছু পিছু উঠে এসেছিল। সে কুসুম। কুসুম করল কি, তাকে তুলে বলল, 'চল, আমার ঘরে। ও মাগীর পেছনে ঘুরে কী হবে?'

ফটিক আবছা গলায় বলল, 'কে বাবা তুমি?'

'আমি কুসুম।'

'কুসুম মানে জানো?'

'ফুল।'

'কী ফুল তুমি, ধুতরো না গ্যাঁদা?'

'আমি ডুমুর ফুল।'

'ফাইন বলেছিস। চল, তোর ঘরেই যাই।' কুসুমের কাঁধে ভর দিয়ে তাব ঘরে চলে গেল ফটিক। তার সারা শরীর বমিতে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। কুসুম ফটিকের মুখ-টুখ ধুইয়ে জামা-প্যান্ট ছাড়িয়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। একটু পর ফটিক ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ভোর বেলা ঘুম ভাঙলে ফটিক দেখতে পেল কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো দুই হাতে তাকে জাপটে ধরে শুয়ে আছে কুসুম। প্রথমটা ফটিক ভেবেই পেল না, সে কুসুমের ঘরে এল কী করে। পরক্ষনেই চট করে সব মনে পড়ে গেল। এক ঝটকায় কুসুমকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল সে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল।

এখনও ভালো করে সকাল হয় নি। দু-একটা ছাড়া মেয়েপাড়ায় সব ঘরেই দরজা বন্ধ। পুব দিকের লাইনবন্দি ঘরগুলোর দাওয়ায় কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে পেনো। মেয়েপাড়ার বিকিকিনি বন্ধ হলে এর-ওর দাওয়ায় শুয়ে থাকে সে।

এইমাত্র মানদার ঘর থেকে বেরিয়ে অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত কাটিয়ে বেড়ালের মতো চুপিসারে শশী কবরেজ বেরিয়ে গেল।

ফটিক কোনও দিকে তাকাল না। সোজা টিয়ার ঘরের কাছে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

এদিকে কুসুমের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে কোনও রকমে তার গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে ছুটে এল। কুসুম বলল, 'কী হল, তুমি চলে এলে যে?'

ফটিক উত্তর দেওয়া দরকার মনে করল না। সমানে টিয়াকে ডেকে যেতে লাগল।

কাল রাত্তিরে কুসুম যখন প্রায় বেহুঁশ, অসুস্থ, মাতাল ফটিককে টিয়ার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে থেকে কুড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল তখন ভেবেছিল দারুণ জিতে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন তার হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে ফটিক বেরিয়ে গেল ক্ষোভে-দুঃখে-হতাশায় এবং প্রচণ্ড রাগে কুসুমের মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে যেতে লাগল। চিলের মতো কর্কশ সরু গলায় সে চেঁচিয়ে চারদিক তোলপাড় করে ফেলল, 'কাল যখন বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছিলে তখন কে সেই নরক ঘেঁটেছিল? মুখপোড়া খচ্চরের বাচ্চা!'

ঘাড় ফিরিয়ে ফটিক খেঁকিয়ে উঠল, 'শাট আপ ব্যাস্টার্ড।' বলেই আবার ডাকতে লাগল, 'টিয়া—টিয়া—টিয়া—'

গলায় সবটুক হিংসা, আক্রোশ আর রীষ ঢেলে টেনে টেনে কুসুম বলতে লাগল, 'টিয়া! টিয়া! কাল ও মাগী ঘরেই ঢুকতে দিলে না, আবার তার পায়েই মুখ রগড়াতে যাওয়া হচ্ছে!'

কুসুমের চেঁচামেচিতে এ-ঘর সে-ঘর থেকে অন্য মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছিল, মানদাও বেরিয়ে এসেছে।

চোখমুখ কুঁচকে অত্যন্ত বিরক্ত গলায় মানদা কুসুমকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোর? সকালবেলা চিল্লিয়ে যে পাড়া মাথায় করে ফেললি।'

কুসুম গলা নামাল না, আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে এলোমেলোভাবে কাল রাত্তিরের ঘটনাটা বলল। সব শুনে ধমকে খিস্তিখাস্তা দিয়ে তাকে থামাল মানদা, তারপর মোটামুটি একটা রফা করে দিল। ঠিক হল, কাল রাত্তিরটা ঘরে রাখার জন্য কুসুম ফটিকের কাছ থেকে কিছু টাকা পাবে। খানিকক্ষণ গজ গজ করে শেষ পর্যন্ত তা-ই মেনে নিল কুসুম। যা পাওয়া যায়।

সমস্যাটার মোটামুটি ফয়সালা করে দিয়ে মানদা বলল, 'সকালবেলা আর যেন খ্যাচাখেচি চেল্লামেল্লি না শুনি কুসমি। আবার গলা চড়ালে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। যা ছুঁড়িরা, যে যার ঘরে যা—'

কুসুম ঘাড় গোঁজ করে চুপচাপ তার ঘরে চলে গেল বটে, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল না খুব খুশি হয়েছে।

এদিকে টিয়া দরজা খুলে দিয়েছিল, ফটিকের চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'এসো—'

ঘরে ঢুকে তক্তাপোষে বসতে বসতে ফটিক উত্তেজনায় এবং রাগের গলায় বলল, 'কাল আমায় ঘরে ঢুকতে দিলি না যে?'

টিয়া বলল, 'মাতালদের আমি ঢুকতে দিই না।'

'কেউ মদ খাক তুই চাস না? দুনিয়া শালী তোর মতো সতী হয়ে যাবে?'

'নিজের পয়সায় মদ খাবে, আমি আটকাবার কে? কিন্তু আমার ঘরে ঢুকে মাতলামো করবে, বমি করে ভাসিয়ে দেবে, সেটি চলবে না। সাফ কথা।'

ফটিক অবাক হয়ে যাচ্ছিল। বলল, 'মাতাল লুচ্চা বাস্টার্ড ছাড়া এ পাড়ায় ঢুকবে কে? তোর ব্যবসা চলে কী করে?'

খুব উদাসীন মুখে টিয়া বলল, 'যা চলে। আমি অতশত ভাবি না—'

'তোর কিছু হবে না টিয়া।'

টিয়া উত্তর দিল না।

একটু কি ভেবে ফটিক বলল, 'তুই তো জুতো পায়ে লোককে ঘরে ঢুকতে দিস না, খিস্তিখাস্তা পছন্দ করিস না, মাল খেলে ঘরের দোর বন্ধ করে রাখিস। আর কী কী তোর ভালো লাগে না তার একটা লিস্টি দে তো—'

টিয়া স্থির চোখে একপলক তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আগে দেখি তোমার কী কী খারাপ অভ্যেস আছে। লিস্টি দিয়ে কী হবে? এখন যাও তো চান-টান সেরে এসো। কাল বমি করে ভাসিয়েছ, সে সব গায়ে লেগে আছে। তার ওপর ওই নোংরা শাড়ি পরে আছ, আমার গা ঘিন ঘিন করছে।'

ফটিকের পরনে কুসুমের দুর্গন্ধওলা চিটচিটে শাড়ি। শাড়িটা কিভাবে তার গায়ে উঠেছে, ফটিক ভেবে পেল না। অনেক চিন্তার পর আবছাভাবে তার মনে পড়ল, কাল রাত্তিরে কুসুমের ঘরে পরে থাকতে পারে। শাড়িটা গা থেকে না নামানো পর্যন্ত তার ভালো লাগছিল না, ঘেন্নায় গায়ের চামড়া যেন কুঁচকে যাচ্ছিল।

ফটিক বলল, 'এত সকালে আমি চান করি না কিন্তু আজ করব।' পাজামা-তোয়ালে-ফোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে গেল ফটিক। কিছুক্ষণ পর ফিরে দেখল মাথায় তেল-টেল মেখে গামছা-শাড়ি-টাড়ি কাঁধে চাপিয়ে টিয়া রেডি।

ফটিক জিজ্ঞেস করল, 'তুই চান করবি নাকি?'

টিয়া মাথা নাড়ল, জানাল, রোজ সকালে চান করা তার অভ্যাস। জানিয়েই সে চলে গেল।

চান সেরে এসে টিয়া দেখল চুল-টুল আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে বিছানায় বসে আছে ফটিক। একপলক তাকে দেখে আয়না-চিরুনি নিয়ে বসল টিয়া। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলল, 'সকালে কী খাও তুমি?'

ফটিক বলল, 'কী খাই জেনে তোর লাভ?'

'বা রে, আমার কাছে থাকবে বললে না? কোন বেলা কী খাও, কী কী খেতে ভালোবাস, আমার জেনে রাখতে হবে না!'

কথাটা ভালো লাগল ফটিকের। বলল, 'খাওয়ায় আমার বাছাবাছি নেই। যা দিবি তাই খাব। তবে এখন একটু কড়া করে চা কর মাইরি।'

কাল রাত্তিরে প্রচুর বাংলা মদ খেয়েছিল ফটিক। চান করবার পর শরীরটা যদিও অনেকখানি ঝরঝরে এবং টাটকা লাগছে তবু খোয়ারি পুরোপুরি কাটে নি। কড়া চা পেলে খোয়ারির মুখে বেশ লাগবে।

দ্রুত বার কয়েক চিরুনি চালিয়ে ভেজা চুলের ডগায় একটা গিঁট দিল টিয়া, তারপর তাড়াতাড়ি তক্তাপোষের তলা থেকে একটা কেরাসিনের স্টোভ বার করে চায়ের জল চড়িয়ে দিল।

ঘরে নোমতা বিস্কুট ছিল। চা হয়ে গেলে সস্তা চিনামাটির কাপে ঢেলে ফটিককে দিল টিয়া, সেই সঙ্গে দু'খানা বিস্কুটও। নিজেও এক কাপ নিল।

চা খেতে খেতে টিয়া বলল, 'দুপুরবেলা কী রান্না বান্না হবে?'

ফটিক বলল, 'তোকে তো বলেই দিয়েছি খাওয়া দাওয়া নিয়ে আমার ঝুট ঝামেলা নেই, যা দিবি তা-ই খাব।'

টিয়া অল্প হাসল, 'লক্ষ্মী ছেলে।'

ফটিকও হেসে ফেলল, 'তা বলতে পারিস।'

একটু ইতস্তত করে খুব দ্বিধার গলায় টিয়া এবাব বলল, 'আজ পয়লা দিন তুমি আমার কাছে খাবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ঘরে চাল-ডাল ছাড়া কিচ্ছু নেই।'

'চাল-ডাল আছে তো? তা হলেই হবে। ফাইন একখানা খিচুড়ি পাকিয়ে ফ্যাল।'

'উঁহু, তা হয় না। কাকে দিয়ে যে বাজার করাই—' বলতে বলতে কি মনে পড়ে গেল টিয়ার, 'ঠিক আছে, পেনোকে পাঠাচ্ছি।'

টিয়া উঠতে যাচ্ছিল, ফটিকের হঠাৎ কি যেন খেয়াল হল। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সে বলে উঠল, 'তুই পাঠাবি মানে? পাঠাব তো আমি—'

দারুণ কুণ্ঠিতভাবে টিয়া বলল, 'খাবে বলে বাজার করে দিতে চাইছ! আমার কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছে।'

বিদ্যুৎচমকের মতো টিয়ার স্বভাবের একটা দিক ফটিকের কাছে ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গাঢ় গলায় সে বলল, 'তুই একটা ব্লাডি মেয়েছেলে, কিচ্ছু হবে না তোর। কোথায় পয়সা খিঁচে নিবি তা নয়, নিজেই আমার জন্যে খরচা করতে চাইছিস। কী করতে যে এ-লাইনে এসেছিলি!'

দ্রুত ফটিককে একবার দেখে নিয়ে টিয়া চোখ নামাল।

চা খেয়ে একটু পর স্টিলের বাক্স থেকে মোটা মানি ব্যাগ বার করে পকেটে পুরতে পুরতে বেরিয়ে গেল ফটিক।

এখন বেশ রোদ উঠে গেছে। বেলাও হয়েছে অনেকটা। এ পাড়ার বেশির ভাগ

মেয়েই চান-টান সেরে দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছে। কেউ কেউ চাল বাছছে, কেউ আনাজ কুটছে। রান্না বান্না চড়াবে, তাবই আয়োজন আর কি।

ঘণ্টা দেড় দুই আগে মানদাব ঘরের দাওয়ায় বুকেব ভেতর হাত-পা গুঁজে বসে ছিল পেনো। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। ঘুম থেকে উঠে কোথায় গেছে, কে জানে।

মানদা তাব ঘরের সামনে বসে আনাজ কুটছিল। ফটিক শুধলো, 'পেনোকে দেখেছ নাকি?'

মানদা বলল, 'পোড়ারমুখো এই তো ছিল, বাস্তায় গেছে বোধ হয়—'

মেয়েপাড়াব বাইবে এসে ফটিক দেখল, বাস্তার ওধারের দোকানপাট খুলে গেছে। তাকে দেখে চায়েব দোকান, তেলেভাজার দোকান— সব জায়গা থেকে ডাকাডাকি কবতে লাগল।

'কবে এয়েছ গো ফটকে দাদা?'

'কাল—'

'এসো এসো, চা খাও। তোমার মুখে জাহাজের গপ্প শুনি।'

'এখন না, পরে আসব।'

'পরে কখন?'

'এখন তো কিছুদিন আছিই। আসব'খন—' বলে ফটিক দোকানীদের সবাইকে জিজ্ঞেস করল, তারা পেনোকে দেখেছে কিনা। ওরা জানালো, দেখেনি।

খানিক দূরে নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধের দিকে একবার তাকাল ফটিক, একবার তাকাল শ্মশানে যাবার রাস্তাটার দিকে, যদি পেনোকে পাওয়া যায়। কিন্তু না, কোথাও নেই সে। রীতিমত বিরক্ত হয়ে ফটিক বড় রাস্তা ধরে সোজা বাজার পাড়ার দিকে চলল।

ঘণ্টাখানেক পর নতুন একটা থলে বোঝাই করে তরি-তরকারি মাছ-মিষ্টি নিয়ে যখন সে ফিরে এল, দেখতে পেল, বৃন্দাবনের বাংলা মদের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চির ওপর বসে আছে পেনো। ফটিককে দেখে সে লাফিয়ে উঠল, 'উরি ব্বাস, গুরু করেছ কী!' বলেই দৌড়ে এসে থলেটা ফটিকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁক করে দেখতে দেখতে বলল, 'ইলিশ মাছ, ফুলকপি, আলু, পোনা মাছ, বাঁধাকপি, জলপাই, সন্দেশের বাক্স—মরে যাব ফটকেদা, আমি শালা স্রেফ মরে যাব। দুপুরে যা একখানা খ্যাঁট হবে না! এখন আর চা-ফা দিয়ে পেট বোঝাই করছি না, গুদোম খালি করে রাখছি। চল গুরু—' এক হ্যাঁচকায় থলেটা কাঁধের ওপর তুলে ফটিকের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল পেনো।

ফটিক বলল, 'সক্কালবেলা উঠে কোথায় গিয়েচিলি রে মাকড়া? বাজারে

পাঠাবার জন্যে কত খুঁজলুম!'

'নদীর পারে গিয়েছিলাম—'

কথা বলতে বলতে ওরা মেয়েপাড়ায় ঢুকে পড়ল। টিয়া এত মাছ-টাছ দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, 'এ কী করেছ, এত কে খাবে?'

পেনো বলল, 'খাবার লোকের আবার অভাব! জম্পেস করে মাছ-ফাছগুলো তৈরি কর দিকি টিয়া। আমি ততক্ষণ মেসোর একটা কাজ করে দিয়ে আসি।'

পেনো চলে গেল। মেয়ে পাড়ার দালালি ছাড়াও কবরেজ, বৃন্দাবন আর মন্মথর কিছু কিছু ফাই-ফরমাশ খাটে সে। তাতে চা-জলখাবার আর মাঝেমধ্যে বাংলা মালের খরচাটা উঠে যায়।

টিয়া মাছ-টাছ কেটে চাল-ডাল ধুয়ে রান্না চাপিয়ে দিল। তার রাঁধবার জায়গা ঘরের সামনের দাওয়াটার একধারে। খানিক দূরে একটা কাঠের জলচৌকির ওপর জমিয়ে বসে গল্প করতে লাগল ফটিক। গল্প করা ছাড়া এখন আর তার কাজই বা কী।

ফটিক বলল, 'একটা ব্যাপারে আমি খুব অবাক হয়ে গেছি টিয়া।'

টিয়া উনুনে-চাপানো কড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অবাক কেন?'

'লাইফে এই ফার্স্ট নিজের হাতে বাজার করলাম আমি।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই।' ফটিক বলতে লাগল, 'জাহাজে জাহাজে ঘুরি। আমার যা কাজ সেটুকু করে ফেলতে পারলেই ব্যস আর ভাবনা নেই। কোনও পোর্টে জাহাজ ভিড়লেই মাসখানেকের আটা-ময়দা-মাংস-মাখন কিনে রাখলেই হল, কেনবার জন্যে আলাদা লোক আছে। রাঁধবার জন্যেও আলাদা লোক, খেতে দেবার জন্যেও। খিদে পেলেই মুখের কাছে খাবার এসে যায়।'

'জাহাজে কদ্দিন কাজ করছ?'

'ষোল সতের বচ্ছর।'

'তার আগে কোতায় থাকতে?'

'এই রাজানগরেই।'

ঘাড় ঘুরিয়ে টিয়া বলল, 'এখানে আসবার পর মাসির কাছে তোমার কথা শুনেছি।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। তখন থেকেই তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করত।'

ফটিক বলল, 'সত্যি!'

টিয়া বলল, 'মা কালীর দিব্যি, বিশ্বাস কর।'

একটা মেয়ে তাকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে, কথাটা দারুণ ভালো লাগল ফটিকের। সে বলল, 'বিশ্বাস করলাম।'

'তোমার কথা জানতেও ইচ্ছে করত।'

'আমার আবার কী কথা?'

'তোমার কে কে আছে, জাহাজে জাহাজে কেমন করে তোমার দিন কাটে—এই সব আর কী—'

'সেসব শুনবার মতো নয়। তোর কথা বল শুনি—'

টিয়া বলল, 'আমার কথা যেন কত শুনবার মতো! এই শরীর বেচে খাই। এখানকার আর পাঁচটা মেয়ের জীবন যেমন, আমারও তার থেকে আলাদা কিছু নয়।'

'উঁহু—'

'কী?'

'না বললেই হবে, তুই সবার থেকে আলাদা। মেয়েমানুষ আমি কম ঘাঁটিনি, কিন্তু তোর মতো আর কাউকে তো দেখলাম না।'

প্রশংসায় টিয়া লজ্জা পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে কড়ায় মাছ চাপিয়ে দিল।

ফটিক আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ওধারের একটা ঘর থেকে কুসুম এল। ফটিককে বলল, 'কি গো, একেবারে ফুর্তির জোয়ারে যে গা ছেড়ে বসে আছ। তা বেশ করেছ। কিন্তু আমার টাকাটার কী হবে?'

ফটিক ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'কিসের টাকা তোর?'

'বাঃ বাঃ, বেশ! একটা গোটা রাত আমায় জড়িয়ে ধরে কাটালে, তার দামটা দেবে না? মাসি তখন কী বলে দিলে?'

মানিব্যাগ থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে ছুঁড়ে দিল ফটিক। বলল, 'যা মাগী, ভাগ এখন—'

অশ্লীল মুখভঙ্গি করল কুসুম। তারপর টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে ঈর্ষাকাতর লোভী চোখে টিয়ার রান্নার রাজসূয় আয়োজন দেখতে দেখতে চলে গেল।

ফটিক বলল, 'তুই তো আমাকে খাওয়াবি বলে পয়সা খরচা করে বাজার করতে চেয়েছিলি। আর কুসুম দ্যাখ কেমন করে পাওনা আদায় করে নিল।'

টিয়া বলল, 'যার যেমন স্বভাব!'

শুধু কুসুমই না, লুব্ধ বেড়ালের মতো এ-পাড়ার অন্য মেয়েরাও মাঝে মাঝেই এসে ঘুরে যেতে লাগল।

একটি মেয়ে, নাম তার অম্বা, বলল, 'কী রাঁধছিস লা টিয়া?'

টিয়া বলল, 'দ্যাখ না লোকটা কী কাণ্ড করে বসে আছে! রাজ্যির বাজার করে এনেছে। মাছ-মাংস, কপির ডালনা—সব মিলিয়ে আট-দশখানা তো রাঁধতেই হবে।'

জবা বলল, 'বেশ বেশ। রাঁধ, মন ঢেলে রাঁধ। ভালো বাবু পেয়েছিস।' কথা সে বলছিল ঠিকই, কিন্তু তার চোখদুটো মাছের আঁশের মতো চকচক করছিল।

টিয়া আদরের গলায় বলল, 'এই জবা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস না, চা করি, খা।'

জবা বলল, 'না ভাই, এখন আর বসব না। রান্না চড়াতে হবে।' বলে আর দাঁড়াল না। উঠোনে নেমে চলে গেল।

যারা জবার মতো চালাক-চতুর তারা এসে সহজভাবেই কথাবার্তা বলল। যা কিছু ঈর্ষা আর লোভ শুধু তাদের চোখেই দপ দপ করতে লাগল।

কিন্তু যারা কুসুমের মতো, তাদের চাউনিতে কথাবার্তায় হিংসে আগুনের ফুলকি হয়ে ঝরতে লাগল। তাদের কেউ বলল, 'ভাগ্যি একখানা করেছিস টিয়া, তাই এমন খদ্দের জুটল। আর আমাদের কপাল দ্যাখ, এক্কেবারে ভাঙা। যাক গে, ক'টা দিন ভাল খাবি, ভাল পরবি।'

টিয়া কিছু বলে না। মেয়েগুলো হিংসেয় পুড়ে পুড়ে আর বকে বকে ক্লান্ত হয়ে একসময় চলে যায়।

ওরা চলে গেলে ফটিক বিরক্ত গলায় চেঁচিয়ে বলে, 'ব্লাডি ব্যাস্টার্ড কুত্তীর দল।'

টিয়া সহানুভূতির সুরে বলে, 'ওদের গালাগাল দিও না। বড্ড গরিব ওরা—'

ফটিক চাপা স্বরে গজ গজ করতে থাকে।

রান্নার ফাঁকে বার দুই চা করে ফটিককে দিল টিয়া। ইলিশ মাছের ডিম হয়েছিল, চায়ের সঙ্গে সেই ডিমও ভেজে দিল।

চা খেতে খেতে ফটিক বলতে লাগল, 'সোয়াইনগুলো ভেগেছে। এবার তোর কথা শুরু কর—'

'বললামই তো, আমার কথা শুনবার মতো নয়। যাচ্ছে তাই।'

'তা-ই শুনব।'

'এখন থাক, পরে শুনো।'

পেনো বলে গিয়েছিল, দুপুরে এসে খাবে। রান্নাবান্নার পর টিয়ারা অনেকক্ষণ বসে থাকল তার জন্য। তবুও সে যখন এল না, ফটিক বলল, 'আর কতক্ষণ বসে থাকব! আমরা খেয়ে নিই, পেনোর ভাগেরটা রেখে দে। ও এলে খাবে।'

'ওর স্বভাবই এই। কখনো ঠিক সময়ে আসবে না।' বলতে বলতে ঘরের মেঝেতে একটা ফুলকাটা আসন পেতে দিয়ে বড় কাঁসার থালায় ভাত সাজিয়ে দিল

টিয়া, তার চারধারে গোল করে অনেকগুলো বাটি সাজাল।

ফটিক বলল, 'আমি একলা বসব নাকি, তুইও নিয়ে বোস। একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাই।'

'তুমি আগে খাও না, আমি পরে বসছি।'

'না— না—'

'দূর—' টিয়া লাজুক হাসল, 'পুরুষ মানুষের সঙ্গে বসে আমি খেতে পারব না।'

আসনে বসতে বসতে টিয়াব গালটা টিপে দিল ফটিক, 'তুই একটা রাবিশ, বিয়ে-করা মাগদেরও নাকে র‍্যাদা ঘষে দিতে পারিস।'

টিয়া এবার আর কিছু বলল না, মুখ নিচু করে আবার হাসল।

খেতে বসে প্রায় আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল ফটিক, ভঙ্গিটার মধ্যে রীতিমতো খুশি, বিস্ময় আর উচ্ছ্বাস মেশানো। সে বলল, 'রান্নার সময় আমি তো তোর কাছেই বসে ছিলাম, কখন এতসব রাঁধলি রে?'

টিয়া খুব নরম গলায় বলল, 'কাছে বসে ছিলে, দেখ নি?'

ফটিক বলতে লাগল, 'মাছভাজা, আলুভাজা, কপির তরকারি, মাছের ঝাল, ঝোল, চাটনি! তুই মাইরি আজ আমাকে মেরেই ফেলবি।'

টিয়া বলল, 'কথা না বলে এখন খাও তো।'

খেতে খেতে ফটিক বলল, 'ফাস কেলাস তোর রান্নার হাত। বড় বড় হোটেলের বাবুর্চিদের কান কেটে নিতে পারিস।' বলতে বলতে গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল, 'জানিস টিয়া, আজ আমার একজনের কথা মনে পড়ছে।'

টিয়া আগ্রহের সুরে বলল, 'কার?'

এই সময় বাড়িউলি মানদা একবাটি মাংস নিয়ে এল, কাল রাতের সেই বাসি মাংস। ফটিক তাকে বলল, 'আবার এসব আনতে গেলে কেন?'

টিয়া বলল, 'মাংসটা তুমি নিয়ে যাও মাসি। আমি অনেক রান্না বান্না করেছি, তা-ই খেয়েই শেষ করতে পারব না।'

মানদা বলল, 'যতই রাঁধিস, বাসি মাংসের সোয়াদই আলাদা।' একরকম জোর করেই মাংসের বাটিটা দিয়ে সে চলে গেল।

আগের কথার খেই ধরে টিয়া বলল, 'তখন কার কথা যেন মনে পড়েছে বলছিলে?'

একটু চুপ করে থেকে ফটিক বলল, 'আমার মা'র, সেই কোন ছেলেবেলায় এই রকম কাছে বসে মা আমাকে খাওয়াত। একটু একটু মনে পড়ে।'

'কেন, বড় হবার পর মা আর খাওয়ায় নি?'

'[illegible] আর মাকে পেলাম কোথায়?'

'কেন, কী হয়েছিল?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল ফটিক। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই ছেলেবেলাটা আচমকা তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। দুঃখ-ক্ষোভ-রাগ এবং আবেগ, সব একাকার হয়ে অগুনতি ঢেউ তার মুখের উপর দিয়ে খেলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর উদাসীন সুরে ফটিক বলল, 'সে কথা শুনে কী আর হবে?'

টিয়া আড়ে আড়ে একবার ফটিককে দেখে নিয়ে বলল, 'তোমার কথা বড় জানতে ইচ্ছে করে।'

ফটিক কী বলতে যাচ্ছিল, পেনো সেই সময় এসে হাজির। বাইরের বারান্দা থেকে চট করে একপলক ঘরের ভেতরটা দেখে বলল, 'আমাকে ফেলেই বসে গেছ গুরু—'

ফটিক বলল, 'ক'টা বাজে হুঁশ আছে রে মাকড়া?'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে পেনো বলল, 'একটু লেট হয়ে গেল ফটকেদা—' বলেই নানা রকম সুখাদ্যে বোঝাই পাত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রথমে ঝুঁকে গন্ধ শুঁকল। তারপর দারুণ খুশি আর দারুণ বিস্ময়ের গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'উরি ব্বাস, করেছিস কী টিয়া! আজ যা টানব না, স্রেফ শালা ফাঁসির খাওয়া। দে ভাই, খেতে দে।' চেঁচাতে চেঁচাতে খালি মেঝেতে বসে পড়ল।

খেতে খেতে হাজার রকম হাসির কথা, রগড়ের গল্প করতে লাগল পেনো। হাসি আর গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল তার। এক ধারে টিয়া, আরেক ধারে ফটিক। চোখের মণিদুটো একবার ডাইনে, তারপরেই বাঁয়ে নিয়ে দু'জনকে দেখতে লাগল পেনো। আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

টিয়া তাকে লক্ষ করছিল। বলল, 'কী দেখছিস?'

'তোদের দেখছি। একটা কথা বলব মাইরি?'

'বল না—'

'হে-হে কথাটা হল—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা থেমে গেল পেনো। তারপর খুব মজা করে খানিক আগের মতো হাসতে লাগল।

টিয়া বলল, 'আহা, হেসেই যে মরলি। কথাটা বল—'

হাসতে হাসতেই পেনো বলল, 'ফটকেদা যে ক'দিন আছে, তোকে আর নাম ধরে ডাকব না।'

'কী বলবি তা হলে?'

'বৌদি।'

টিয়া ঠোঁট টিপে বলল, 'পোড়ারমুখো।'

পেনো বলল, 'তোকে বৌদি না বললে ফটকেদার পেসটিজ পাংচার হয়ে যাবে

না?'

বসে বসেই ঠ্যাং চালালো ফটিক, 'ব্লাডি কুত্তা কাঁহিকা—'

সত্যিসত্যিই দারুণ খাওয়া খেল পেনো। তার নিজের ভাষায় ফাঁসির খাওয়া। তারপর আর হেঁটে যাবার মতো অবস্থা রইল না, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কোনওরকমে আঁচিয়েই কুসুমের ঘরের সামনের বারান্দাটায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

এদিকে আঁচিয়ে এসেই টিয়ার বিছানায় উঠল ফটিক। বালিশে ভর দিয়ে আধশোয়ার মতো করে বসে সিগারেট ধরাল। তাকে কয়েক কুচি সুপরি আর লবঙ্গ দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজে খেয়ে বাসন-কোসন ধুয়ে মেঝের একধারে বসল টিয়া। জানালা দিয়ে হেমন্তের মরা হলুদ রোদ আসছিল। সেই রোদে পিঠময় চুল ছড়িয়ে শুকোতে শুকোতে বলল, 'এবার তোমার কথা বল। তখন পেনো এসে গেল, কথাটা আর শোনা হল না।'

ফটিক বলল, 'তোদের মেয়েদের এই এক কারবার। একটা কিছু ধরলে আর ছাড়তে চাস না। হাজাব বার বলছি আমার লাইফের কথা শুনলে ভালো লাগবে না। যাক গে, এতই যখন ইচ্ছে, শোন তা হলে—'

ফটিকের ছেলেবেলার কথা, বাবার কথা, সেই মারোয়াড়ির বাচ্চার সঙ্গে মা'র বেরিয়ে যাবার কথা, তারপর জাহাজে যাবার আগে পর্যন্ত দারুণ কষ্টকর দিনগুলোর ইতিহাস শুনতে শুনতে চোখ ছলছল করছিল টিয়ার, গলার কাছটায় ব্যথা-ব্যথা লাগছিল, ঢোক গিলতে পারছিল না সে। আস্তে করে একসময় বলল, 'ছেলেবেলায় তোমার তো খুব কষ্টে কেটেছে।'

ফটিক হাসল, 'তা একটু কেটেছে।' বলতে গিয়েই আচমকা তার নজর গিয়ে পড়ল টিয়ার মুখের ওপর। এক মুহূর্ত থমকে থেকে অনেকখানি ঝুঁকে সে বলল, 'এ কি রে, তোর চোখে জল নাকি? তুই ব্লাডি একটা যাচ্ছেতাই।'

টিয়া কিছু বলল না।

ফটিক আবার বলল, 'অ্যাই মাইরি, কাছে আয়। অদ্দূরে বসে থাকলে কথা বলতে ভালো লাগে!'

নিঃশব্দে উঠে এসে তক্তাপোষের এক কোণে বসল টিয়া। ফটিক বলল, 'তোর মনটা তো ভারি নরম রে—' বলেই হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে আনল।

টিয়া এতক্ষণে কথা বলল, 'আচ্ছা, এখন তো তোমার জাহাজে জাহাজে কাজ?'

'হ্যাঁ।'

'নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয় তো?'

'তা তো ঘুরতেই হয়।' ফটিক হাসল।

'আচ্ছা—' টিয়া জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজে জাহাজে এই যে ঘোরো, বড় বড় সমুদ্দুরের ওপর দিয়ে যেতে হয়, না?'

'হুঁ। প্যাসিফিক, আটলান্টিক, রেড সি, ব্ল্যাক সি, নর্থ সি—সেই সব সমুদ্দুরের পার কূল নেই রে টিয়া। দু-মাইল তিন মাইল জুড়ে এককেটা ঢেউ। সে তুই ভাবতে পারবি না। এককেটা ব্লাডি ব্যাস্টার্ড সি পেবিয়ে কোনও পোর্টে পৌঁছতে পৌঁছতে মাসের পর মাস কেটে যায়।'

টিয়া বলল, 'আমাব খুব দূর দেশে যেতে ইচ্ছে হয়। যদি পারতাম যেতে—'

ফটিক বলার জন্যই বলল, 'ঠিক আছে ছুটি ফুরোলে এবার তোকে নিয়ে সমুদ্দুরে ভাসব।'

টিয়া হাসল। তারপর কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ফটিক আবার বলল, 'আমাব কথা আর না, এবার তোর কথা বল।'

'আমার আবার কী কথা?'

'ল্যাও ঠ্যালা—' ফটিক বলতে লাগল, 'তোকে দেখেশুনে এ লাইনেব মেয়ে মনে হয় না। এখানে এলি কী করে?'

টিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি এ লাইনেরই মেয়ে।'

'ধুর—'

'কী ধুর?'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

টিয়া হাসল, 'আমাকে দেখে এ-লাইনের মেয়ে বলে কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। আমিই না, আমার মায়েরও এই ব্যবসাই ছিল।'

ফটিক বলল, 'তুই মাইরি আমার মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছিস।'

টিয়ার মুখে বিষাদের হাসি ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ পর আবছা গলায় সে বলল, 'মা যা-ই থাক, তার সাধ ছিল অন্যরকম।'

পলকহীন টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ফটিক। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কিরকম?'

'মা'র বড্ড ইচ্ছে ছিল আমি যেন এ নরকে না থাকি। কিন্তু কী করব, আমার কপাল।'

এবার নকল বিরক্তি ফুটল ফটিকের চোখেমুখে। সে বলল, 'আধখ্যাঁচড়া না বলে গোড়া থেকেই শুরু কর না—' অর্থাৎ টিয়ার জীবনের আগাগোড়া ইতিহাসটাই জানতে চায় ফটিক।

গুছিয়ে গাছিয়ে টিয়া নিজের সম্পর্কে যা বলল তা এই রকম :

রাজ নগরের এই মেয়েপাড়াটার মতোই বজবজের কাছে আরেক মেয়েপাড়ায় তার জন্ম। একটু বড় হবার পর মা আর তাকে সেখানে রাখেনি, একে-ওকে ধরে কলকাতার কাছাকাছি একটা সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানে দিয়ে এসেছিল। প্রতিষ্ঠানটা মোটামুটি আশ্রমের মতো। অল্প খরচ-টরচ দিলে সেখানে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের রাখা হত, লেখাপড়া থেকে শুরু করে হাতের কাজটাজ শেখানো হত।

মা'র হয়তো ইচ্ছা ছিল, তার জীবনটা তো নরকেই কেটে গেছে, মেয়েটা অন্তত বাঁচুক। লেখাপড়া আর হাতের কাজ শিখে টিয়া যদি কোনওদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, এই জঘন্য নরকের জীবন তাকে ছুঁতে পারবে না। মেয়েটা বেঁচে যাবে। মা তার নিজের মতো করে টিয়ার কথা ভেবেছিল। তাকে বেশ্যাপাড়ার নাগালের বাইরে একটা সুস্থ ভদ্র রকমের ভবিষ্যৎ দিতে চেয়েছিল।

টিয়ার মনে আছে, পাঁচ-ছ বছর সেই আশ্রমটায় ছিল সে, ক্লাস ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল। মা তার শরীর বিক্রির সামান্য আয় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মাসের পয়লা সপ্তাহে আশ্রমের খরচ পাঠিয়ে দিত।

হয়তো মা যা চেয়েছিল তাই হত। তেমনি করে লেখাপড়া কিংবা হাতের কাজ শিখতে পারলে বেশ্যাপাড়ার নরক হাত বাড়িয়ে তাকে কোনওদিনই ধরতে পারত না। কিন্তু কিছুই হল না। আশ্রমে আসার ছ'বছর পর দুম করে বারকয়েক রক্তবমি করে মা মরে গেল। তখন কে আর আশ্রমে পড়ার খরচ চালায় তার? অসহায় ছেলেমানুষ টিয়া চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বজবজের মেয়েপাড়ায় ফিরে গিয়েছিল এবং শুধু বেঁচে থাকার জন্য মা'র মতো রোজ রাত্তিরে নিজেকে নিয়ে বিকিকিনি শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু পাঁচ-ছ বছরের আশ্রমজীবন এবং কিছু লেখাপড়া টিয়ার রুচি এবং মানসিক গড়ন তৈরি করে দিয়েছিল। যাকে-তাকে সে তার ঘরে ঢুকতে দিত না। মাতাল জোচ্চোর ফেরেব্বাজদের সে ঘৃণা করে।

বজবজে বছর চারেক কাটিয়ে এখানে-ওখানে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত মাসকয়েক আগে এই রাজানগরে এসেছে টিয়া। মেয়েপাড়ার এই জঘন্য কুৎসিত নরকের মাঝখানে নিজের রুচি আর আত্মসম্মানবোধ দিয়ে সে আলাদা একটা দ্বীপ তৈরি করে রেখেছে।

টিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই ফটিক চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্লাডি ব্লাস্টার্ড আর বলিস না। দু'দিনের জন্যে ফুর্তি করতে এসে এসব কষ্টের কথা ভাল্লাগে না। যত ঝুটঝামেলা। কষ্টের কথা বেশি শুনলে আমার ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে যায়। তার চেয়ে আয়, কাছে আয়—' বলেই টিয়াকে জাপটে ধরে গাল কামড়ে দিল। খানিকক্ষণ উন্মত্তের মতো আদর করে আবার বলল, 'তোকে জড়িয়ে ধরে বড়

আরাম রে, যেন শালা মাখন—বাটার। আর কাল রাত্তিরে একটা কেঠো ফ্যাসা মাছ ধরে যেন শুয়েছিলাম।'

'ফ্যাসা মাছ!'

'হ্যাঁ রে, ওই যে কুসমি। শালীর শরীরে মাংসের চাইতে কাঁটা বেশি, জড়িয়ে ধরলে গায়ে ফোটে।' বলে টিয়াকে আবার বুকে পিষে, গালে গাল ঘষে, নাক কামড়ে দারুণ খ্যাপামি শুরু করে দিল ফটিক। একটু আগে কষ্টের কথায় আবহাওয়াটা ভ্যাপসা, স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছিল। ফটিকের ভেতর থেকে একটা দুর্দান্ত, বেপরোয়া, পয়সা-দিয়ে-ফুর্তি-করতে আসা লোক বেরিয়ে এসে সেই আবহাওয়াটাকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে টিযার ঘরের বাইরে বার করে দিল।

সেই বিকেল পর্যন্ত ওরা শুয়ে থাকল। তারপর জানালা থেকে যখন হেমন্তেব রোদ সরে গেল, বাতাস দ্রুত জুড়িয়ে যেতে লাগল সেই সময় টিয়া বলল, 'ছাড়ো, এবার উঠি।'

ফটিক বলল, 'থাক না আরেকটু।'

'না-না, একটু পর সন্ধে হয়ে যাবে। গা ধোয়া আছে, চুল বাঁধা আছে—'

ফটিক ছেড়ে দিল।

টিয়া গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, কেরোসিন স্টোভে চা বসিয়ে দিল। ফটিক বিছানাতেই চিত হয়ে শুয়ে থাকল। তার উঠতে ইচ্ছা করছিল না, খুব আলস্য লাগছিল।

চা খাবার পর শরীরটা ঝরঝরে হল। বিছানায় বসে হাই তুলে পটপট করে বারকয়েক তুড়ি দিল ফটিক। তারপর বলল, 'এখন কী করবি টিয়া?'

টিয়া বলল, 'কী আর করব!'

একটু ভেবে ফটিক বলল, 'এই সন্ধেবেলা ঘরের ভেতর বসে থাকতে আর ভাল্লাগছে না। অনেকদিন সিনেমা-টিনেমা দেখি না, চল একটা দেখে আসি।'

খুব একটা অনিচ্ছা নেই টিয়ার। এই বদ্ধ ঘরে আবছা অন্ধকারে বসে থাকতে তারও খুব ভালো লাগছিল না, বেশ আগ্রহের গলায় টিয়া বলল, 'চল।'

'কী পিকচার দেখবি?'

'ইন্দ্রাণী টকিজে নতুন বই এসছে, সবাই বলছে খুব ভালো হয়েছে।'

'চল ইন্দ্রাণী টকিজেই যাই।'

টিয়া শাড়ি পাল্টে সেজেগুজে নিল। ফটিক ট্রাউজারের ওপর লম্বা লম্বা ডোরা-দেওয়া কলারওলা দামি গেঞ্জি এবং জ্যাকেট চাপাল। তারপর ঘরে তালা ঝুলিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল।

এখন আর রোদ নেই। ঠিক সন্ধে হয় নি, তবে চারধার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

একটু পরেই এ-পাড়ায় বিকিকিনির বাজার বসে যাবে। এখন চারদিকে তারই আয়োজন চলছে। মেয়েরা কেউ কেউ সাজছে, কারও কারও সাজা হয়ে গেছে। অন্ধকারটা নামার শুধু অপেক্ষা, সবাই তখন দল বেঁধে সদরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

টিয়াদের দেখে ওরা মুখ তুলে তাকাল। কেউ কেউ হাসল, হিংসেয় কারও বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল।

মানদা তার ঘরের দাওয়ায় পানের ডাবা নিয়ে বসে ছিল। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চললে বাবা?'

ফটিক বলল, 'সিনেমা দেখতে।'

'যাও বাবা, যাও। বাজার পাড়ার সিনেমা হলে একটা ঠাকুর দেবতার বই এসেছে—ভক্ত পেল্লাদ। আমায় একদিন দেখিয়ে দিও—'

'আচ্ছা—'

ফটিকরা এগিয়ে গেল। পেছন থেকে মানদা অনেকটা নিজের মনেই বলল, 'দু'টিকে যা মানিয়েচে, যেন হরগৌরী।'

ওধারে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে চুল বাঁধতে বাঁধতে হিংসেয় চিরুনি চালিয়ে কুসুম এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। চাপা বিষাক্ত গলায় বলল, 'হরগৌরী! মাসি চোখের মাথা খেয়ে বসেছে।'

টগর শুনতে পেয়েছিল। বলল, 'হরগৌরী নইলে কী?'

'প্যাঁচা-পেঁচী।'

মেয়েপাড়ার বাইরে বড় রাস্তায় আসতেই দেখা গেল ওধারের দোকানপাটগুলোতে আলো জ্বলছে। ওখানে এখন বেশ ভিড়, বিশেষ করে তেলেভাজা এবং চাটের দোকানগুলোতে আর বৃন্দাবনের দিশি মদের দোকানে। পেনোকেও ওখানে দেখা গেল। সে মেয়েপাড়ার জন্য খদ্দের জোগাড় করছে। কিভাবে নাকের ডগায় টোপ ঝোলাতে হয় তার টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছিল, 'একদম ডাঁসা ছুঁড়ি। ফুলকচিও আছে, ষোল-সতের-আঠের, যে বয়সের চাও দাদা—' ইত্যাদি।

সবাই ব্যস্ত, তাই কেউ ফটিকদের লক্ষ করল না। রাস্তা দিয়ে খানিকটা যাবার পর সাইকেল রিকশা পাওয়া গেল। ফটিক আর টিয়া সেটায় উঠে বসল।

ইভনিং শো-তে সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে একটু আগের দেখা ছবিটা নিয়ে ওরা আলোচনা করছিল।

টিয়া বলল, 'ছ'মাস পর সিনেমা দেখলাম, খুব ভাল লাগল। অর্জুন কুমার যা

করেছে না!'

ফটিক বলল, 'হিরোইন ছুঁড়িটাও ফাইন করেছে।' একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'বাজানগরে আর কী কী বাংলা পিকচার হচ্ছে রে?'

কোন কোন হলে কী কী ছবি হচ্ছে টিয়া জানাল।

ফটিক বলল, 'একবাব জাহাজে উঠলে দেড় দু বছরের আগে তো আর ফেরা হয় না। ভাবছি তুই আর আমি রোজ একটা করে বাংলা সিনেমা দেখব।'

টিয়া বলল, 'আচ্ছা—'

কথায় কথায় ওরা মেয়েপাড়ার কাছাকাছি চলে এসেছিল। ডানধারে তেলেভাজা, চাট আর বাংলা মালের সেই দোকানগুলোতে গ্যাসের আলো জ্বলছে আর সেই আলোগুলোকে ঘিবে ভনভনে মাছির মতো মাতালদের ভিড়।

বৃন্দাবনেব দোকানের সামনে একটা বেঞ্চির ওপর বসে ছিল পেনো। ফটিকরা সিনেমা যখন দেখতে যায় তখন পেনোর চোখে পড়েনি, এবার কিন্তু সে ওদের দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে উঠে দাঁড়াল, উরি ব্বাস, গুরু যে—' বলতে বলতেই ছুটে এল, 'টিয়া—থুড়ি, বৌদিকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?'

ফটিক বলল, 'সিনেমা দেখতে।'

'কী বই?'

ছবিটার নাম বলল ফটিক।

পেনো বলল, 'তিনবার দেখেছি। শালা টেরিফিক জিনিস।' নায়ক-নায়িকার নাম করে বলল, 'দু'জনে যা লড়েছে গুরু—'

ফটিক হাসল।

বাংলা মালের দোকানের ভেতর থেকে বৃন্দাবনও ওদের দেখতে পেয়েছিল। তার গায়েই মন্মথর ফোটো তোলার দোকান। মন্মথ আর বৃন্দাবন ডাকাডাকি শুরু করে দিল, 'এই ফটকে, এদিকে আয়—'

সকালবেলা বাজারে যাবার সময়ও ওরা ডেকেছিল। এবার আর এড়ানো গেল না। গলা তুলে সে বলল, 'যাচ্ছি।' তারপর টিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'তুই তোর ঘরে যা। আমি ওদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে আসছি।'

'আচ্ছা—' টিয়া চলে গেল। আর পেনোকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে মন্মথর ফোটোর দোকানে এল ফটিক।

মন্মথর হাতে এখন কোনও কাজ নেই। সারাদিনের বেশির ভাগ সময় কাজ থাকেও না। রাজানগরের সৌখিন বাজারপাড়া পেরিয়ে ক্বচিৎ কখনো কেউ তার কাছে ফোটো তোলাতে আসে। মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা তেমন তেমন বাবু পাকড়াতে পারলে মাঝে মধ্যে জোড়ে এসে ছবি তুলিয়ে যায় কিংবা মন্মথকে

মেয়েপাড়ায় ডাকিয়ে বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে যুগল-মিলনের ছবি তোলায়। তাছাড়া কাছেই শ্মশান, দিনে কম করে পনের কুড়িটা মড়া আসে। তাদের ছবি তুলতে হয়। তবে সবার না। জীবনের পরপারে যারা চলে যাচ্ছে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সবার তো আর শেষযাত্রার ছবি তুলে রাখার মতো ক্ষমতা বা ইচ্ছা থাকে না। গড়ে দৈনিক সাত-আটটা মড়ার ছবি তোলে মন্মথ। ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে প্রিয়জনেরা ঘিরে বসে তাদের ফোটো তোলায়। এ ছাড়া প্রায়ই কোনও বিয়ে বা অন্নপ্রাশনের বাড়িতে মন্মথর ডাক পড়ে। মোটামুটি এই হল মন্মথর জীবিকা।

ওর সঙ্গে গল্প করতে করতেই হরিধ্বনি দিয়ে একটা মড়া এসে গেল। মড়া নিয়ে যারা এসেছিল তাদের একজন এসে খবর দিল, ফোটো তুলতে হবে। তাড়াতাড়ি ক্যামেরা আর ক্যামেরা বসাবার স্ট্যান্ড কাঁধে ঝুলিয়ে তার সঙ্গে ছুটল মন্মথ। যাবার সময় বলে গেল, একটু পরেই সে ফিরে আসছে। ফটিক যেন চলে না যায়। এই সময়টা সে যেন বৃন্দাবনের দোকানে বসে গল্প-টল্প করে।

ফটিক বলল, 'ঠিক হ্যায়।' পেনোকে নিয়ে সে বৃন্দাবনের বাংলা মালের দোকানে এসে বসল।

ছোট একটা তক্তাপোষের ওপর কোলের কাছে ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছে বৃন্দাবন। তার পেছন দিকে ধুলোপড়া পুরনো আলমারিতে সারি সারি কালীমার্কা বোতল সাজানো রয়েছে।

বৃন্দাবনের দোকানের সামনের দিকে অনেকগুলো বেঞ্চ পাতা, সেখানে তিন-চারটে লোক শালপাতার ঠোঙায় চাট নিয়ে মাটির ভাঁড়ে দিশি মদ খাচ্ছিল। দোকানের একটা ছোকরা তাদের অর্ডারমাফিক মদ এনে এনে দিচ্ছিল।

বৃন্দাবন শুধলো, 'এবার রাজানগরে এসে কেমন লাগছে রে ফটকে?'

ফটিক বলল, 'অন্য বার যেমন লাগে।'

'উঁহু—'

'উঁহু কী?'

হেসে খ্যাসখেসে কেশো গলায় বৃন্দাবন বলল, 'টিয়ার সঙ্গে বেশ ভালোই জমে গেছিস দেখছি।'

পেনো বলল, 'জমে একেবারে কুলপি মালাই। গুরু বেশ রসে-বশেই আছে গো জ্যাঠা।'

ফটিক আদরের ভঙ্গিতে পেনোর ঘাড়ে আলতো একটা চড় কষিয়ে দিল।

বৃন্দাবন বলল, 'তা অনেকদিন পর এলি, একটু মালফাল খা—'

চট করে রাত্তিরের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল ফটিকের। মাল খেয়ে হল্লা-টল্লা একেবারেই পছন্দ করে না টিয়া। চুর মাতাল হয়ে গেলে আজ আবার ঝামেলা বাধিয়ে

দেবে। ফটিক দোনামোনা করতে লাগল।

পেনো ফটিককে লক্ষ করছিল, তার মনোভাব বুঝতেও পারছিল। গালের ভেতরটা চিবোতে চিবোতে বলল, 'বৌদির কথা ভাবছ নাকিন ফটকেদা? বিয়ে-করা বউকেও লোকে এত ভয় পায় না।'

ফটিকের রূঢ় উদ্ধত স্বভাবে কোথায় যেন খোঁচা লাগল। হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল সে, 'অ্যাই শালা খচড়া, আমি ভয় করি? দে, মাল বার কর—'

'এই তো মরদকা বাত, হাতিকা দাঁত।'

যথারীতি পেনোর দিকে পা চালালো ফটিক, তার আগেই বেঞ্চি থেকে চট করে সরে গেছে পেনো।

একটু পরেই ফটিকের চোখ লাল টকটকে হয়ে গেল, গলার স্বর এল জড়িয়ে। আস্ত একটা কালীমার্কা বোতল সাবাড় করে পেনোর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে যখন সে মেয়েপাড়ায় ফিরে এল, ঘরে ঘরে রসের হাট বসে গেছে। কোনও ঘর থেকে মাতালের জড়িত স্বর ভেসে আসছিল, কোথাও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের আসর বসেছে, কোথাও উদ্দাম হাসাহাসি চলছে, কোথাও বা প্রচণ্ড হল্লা।

পেনোও দু-চার ভাঁড় চড়িয়েছিল। হাত-পা-মাথা তারও টলছিল। ফটিককে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে গান শুনে তার মেজাজ এসে গেল। ডান হাতে তুড়ি দিয়ে দিয়ে চেরা গলায় সে গাইতে শুরু করল ঃ

'ও যানেওয়ালে বালোমা—
লৌটকে আ, লৌটকে আ—'

ফটিক তার বুজে আসা চোখ খুলবার চেষ্টা করে বলল, 'কে গাইছে রে?'

পেনো গোঙানির মতো শব্দ করে বলল, 'আশা ভোঁসলে—'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

লম্বা উঠোন পেরিয়ে ওরা টিয়ার ঘরের সামনে এসে পড়ল। টিয়া তার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের এক পলক দেখেই চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তক্ষুণি ঘরের ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ফটিক বাইরে থেকে ডাকতে লাগল, 'টিয়া—অ্যাই টিয়া—'

টিয়া সাড়া দিল না।

পেনো ডাকল, 'বৌদি—বৌদি—'

টিয়া নিরুত্তর।

এবার ফটিক এলোমেলোভাবে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করে দিল, 'ডার্লিং, মাই ডার্লিং—দরজা খোল মাইরি—'

পেনো বলল, 'খোল দিদি, নইলে গুরু মরে যাবে।'

ফটিক বলে যাচ্ছিল, 'হ্যাঁ, মরে যাবে। নির্ঘাৎ মরে যাবে। কোনও শালা তাকে বাঁচাতে পারবে না।'

টিয়া ভেতর থেকে এতক্ষণে কথা বলল, 'কালই তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, মাতাল হয়ে আমার কাছে আসবে না।'

পুরো এক বোতল কালী-মার্কা ফটিকের মধ্যে রয়েছে। সেই ঝাঁঝালো উগ্র তরল এবার দারুণ উত্তাপ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করল। দরজায় আট-দশটা লাথি হাঁকিয়ে সে বলল, 'অ্যাই প্রস্টিটিউটকি বাচ্চী, খোল দরজা—আভ্ভি। শালীর বেশ্যাপাড়ায় গীতাপাঠ!'

টিয়া চুপ।

ফটিক আবার বলল, 'শালা পয়সা খরচা করে ফুর্তি করতে এসেছি।'

টিয়া বলল, 'তোমার কাছ থেকে এখনও একটা পয়সা নিইনি কিন্তু—'

আরও কিছুক্ষণ হল্লাবাজি করে দরজার কাছে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ফটিক।

তারপরও পেনো খানিকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে জড়ানো গলায় টিয়াকে ডাকল। সাড়া না পেয়ে ফটিকের দিকে ফিরে বলল, 'গুরু যে এখেনেই লাট খেয়ে পড়ে রইলে! ও মাগী তো দোর খুলছে না, এখন কী করবে?'

ফটিক কিছু বলল কিন্তু বোঝা গেল না। তার গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

পেনো আবার বলল, 'আমিও মাইরি আর দাঁড়াতে পারছি না। মাথাটা লাট্টু হয়ে যাচ্ছে, এবার স্রেফ লটকে পড়ে যাব। তুমি আজ রাতটা বারান্দার দেয়াল জড়িয়ে শুয়ে থাকো। আমি হড়কে যাচ্ছি!'

পেনো ঝুঁকে ফটিকের থুতনি ধরে একটু আদর করল। ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, 'টা-টা, কাল ফির মিলেঙ্গে।' বলেই টলতে টলতে উঠোনে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

না ফটিক, না পেনো— ওরা কেউ লক্ষ করে নি অন্ধকারে কুসুম তার ঘর থেকে বিড়ালীর মতো জ্বলজ্বলে চোখে ওদের দেখছিল। পেনো চলে যেতেই সে বেরিয়ে এল। সোজা ফটিকের কাছে গিয়ে টানাটানি করে তাকে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

অনেক কষ্টে চোখের পাতা ফাঁক করে ফটিক জড়ানো অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে রে?'

কুসুম বলল, 'যাকে তুমি দেখতে পারো না, আমি সে-ই গো। আমি তোমার দু-চোখের বিষ।'

গলার ভেতর ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ করল ফটিক।

কুসুম আবার বলল, 'তোমার যে চোখের মণি সে তো মুখের ওপর দোর বন্ধ

করে দিল। সারা রাত্তির বাইরে হিমের ভেতর পড়ে থাকবে, আর আমি মাগী ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমুবো, তা হয় না। তুমি আমায় দেখতে না পারলে কী হবে, তোমার জন্যে আমার পেরাণে টান আছে গো, টান আছে।'

ফটিক তার কথা কতটা শুনল আর কতটা শুনল না, সে-ই জানে। ঘরের চারধারে ঘোলাটে চোখে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'এটা তো টিয়ার ঘর না।'

'এতক্ষণ বুঝলে টিয়ার ঘরে আসো নি! আমার মরণ।'

'এটা কার ঘর রে?'

'আমার গো আমার, আমি কুসুম।'

আঙুলের ডগায় কুসুমের থুতনিটা তুলে ধরে টলতে টলতে ফটিক বলল, 'ইয়েস, কুসুমই তো—সেই কাঁটাওলা ফ্যাসা মাছ। অলরাইট ফ্যাসা মাছই সই। টিয়াকো নেহী মাংতা।' কুসুমকে ছেড়ে দিয়ে ঘাড়-টাড় গুঁজে ফটিক তার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা নেশা-টেশা ছুটে গেলে ফটিক টিয়ার ঘরে চলে এল। এই নিয়ে সেদিনের মতো কুসুম আবার কুৎসিত চিৎকারে গোটা মেয়েপাড়াটা কিছুক্ষণ সরগরম করে রাখল। তারপর একটা রাত নিজের ঘরে রাখার দাম হিসেবে ফটিকের কাছ থেকে দশটা টাকা আদায় করে তবে চুপ করল এবং নিজের ঘরে চলে গেল।

এই সকালবেলা ফটিক একেবারে অন্য মানুষ। কাল রাত্রে যে নেশায় চুর হয়ে টিয়ার ঘরের সামনে হল্লা করেছিল তার সঙ্গে এই ফটিকের আদৌ কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাল রাতের ব্যাপারটার জন্য খানিকটা অনুতপ্তও সে। অপরাধীর মতো মুখ করে হাত কচলাতে কচলাতে হাসল, 'বুঝলি মাইরি, আমার কোনও দোষ ছিল না। ওই পেনো আর বেন্দাবন গ্যাস দিয়ে দিয়ে আমাকে মাল খাইয়ে দিলে।'

টিয়া উত্তর দিল না।

ফটিক আবার বলল, 'শালারা এমন খচ্চর, আমার কোনও কথা শুনল না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, অত করে বলছে, আচ্ছা এক ভাঁড় খাই। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ইন দি নেম অফ গড, মাল খেতে বসলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। এক ভাঁড়ের পর দু ভাঁড় খেলাম, দু ভাঁড়ের পর তিন ভাঁড়। এই করে গোটা বোতল ফাঁক হয়ে গেল।'

টিয়া এবারও চুপ।

ফটিক বলতে লাগল, 'এই নাক মুলচি কান মুলচি, আর যদি ওই মাকড়াদের

পাল্লায় পড়ে মাল খাই, তখন তুই আমাকে যা ইচ্ছে বলিস।'

টিয়া একটা কথাও বলল না, শুধু বড় বড় চোখে পলকহীন তাকিয়ে থাকল।

ফটিক আরও খানিকক্ষণ বকে গেল, 'এই লাস্ট—শালারা আবার যদি মাল খাওয়াতে আসে এমন কোতকা মারব যে লাইফে ভুলবে না।'

এরপর চান-টান সেরে চা খেয়ে কালকের মতো বাজারে চলে গেল।

দেখতে দেখতে ক'টা দিন কেটে যায়। আর দিনগুলো এভাবে কাটে ফটিকের। সকালে উঠে চান-টান সেরে চা খাবার-দাবার খেয়ে বাজারে চলে যায় সে। সেখান থেকে ফিরে আরেক কাপ চা খায়। তারপর কোনও কোনও দিন টিয়া যখন রান্না চাপায় তার ঘাড়ের কাছে বসে গল্প কবে। নইলে ওই সময়টা বৃন্দাবন কি মন্মথর দোকানে কিংবা শশীর কবিরাজখানায় গিয়ে আড্ডা মারে। দুপুরবেলা ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে টিয়াকে নিয়ে শুয়ে পড়ে, টানা একটি ঘুম লাগিয়ে বিকেলে উঠে আবার চা খায়। মেয়েপাড়ার ঘরে ঘরে যখন সাজগোজের ধুম পড়ে সেই সময় টিয়াকে সঙ্গে করে ফটিক কোনও দিন যায় সিনেমায়, কোনও দিন গঙ্গায় নৌকো ভাড়া করে বেড়ায়। কোনও কোনও দিন ভোরবেলা সোজা ওরা চলে যায় কলকাতায়। সারাদিন হৈ চৈ করে, হোটেলে খেয়ে লাস্ট ট্রেনে ফিরে এসে দেখে মেয়েপাড়া ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে আছে।

এদিকে অন্য মেয়েদের, বিশেষ করে কুসুমের মনে প্রথম দিকে যে হিংসেটা ছিল এখন আর সেটা তত স্পষ্ট নয়। টিয়ার সৌভাগ্যকে মোটামুটি তারা স্বীকার করে নিয়েছে। যার যেমন ভাগ্য, তার ওপর তো কারও হাত নেই। কুসুম এবং অন্য হিংসুটে মেয়েরা তাদের নিজেদের ধরনে যতটা সম্ভব ইদানীং টিয়াদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। গল্প করে, টিয়া আর ফটিকের সম্পর্ক নিয়ে ঠাট্টা-টাট্টাও করে। টিয়া ভালো কিছু রাঁধলে সিলভারের বাটিতে বাটিতে ওদের ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

এই সবের মধ্যেও মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায়। ফটিকের রক্তের মধ্যে আঠার-বিশ বছর ধরে যে নেশা আর বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা মিশে রয়েছে, একেক দিন সেগুলো মাথা চাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন নেশায় চুর হয়ে টিয়ার বন্ধ ঘরের দরজার সামনে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে সে। যেদিন কুসুমের ঘরে খদ্দের থাকে না, ফটিককে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। আর যেদিন খদ্দের থাকে সারারাত হিমের মধ্যে টিয়ার ঘরের বারান্দায় পড়ে থাকতে হয় ফটিককে।

আমোদ করতে, মজা লুটতে যারা সন্ধের পর এই মেয়েপাড়ায় আসে, মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে মারামারিও বাধিয়ে দেয় ফটিক। আজও সেরকম একটা ঘটনা

ঘটল।

আজ বিকেলে টিয়াকে নিয়ে আর বেড়াতে বেরোয় নি ফটিক। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সে গিয়েছিল পঞ্চাননতলায় তাদের সেই পুরনো বাড়ি দেখতে। পেনো যা বলেছিল ঠিক তাই। তাদের বাড়িটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। দরজা-জানালা কিচ্ছু নেই—কারা খুলে নিয়ে চলে গেছে। ভাঙাচোরা টিনের চাল, ঘুণে-ধরা খুঁটি, বাঁশ, ইতস্তত ছড়ানো।

খানিকক্ষণ খুব নিরাসক্তভাবে তাদের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখল ফটিক। তারপর উদ্দেশ্যহীনের মতো রাজানগরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যখন সে মেয়েপাড়ায় ফিরে এল তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

মেয়েপাড়ায় এখন, এই সন্ধের অন্ধকারে একটা দারুণ মজার ব্যাপার চলছে। সেই সঙ্গে খানিকটা অস্বস্তিরও।

একটা মধ্যবয়সী বাবুমার্কা লোক টলতে টলতে মেয়েপাড়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। গালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তার জুলপি, কলপ-দেওয়া চুল সযত্নে মাথার ডান দিকে হেলিয়ে দেওয়া, চোখ ঢুলুঢুলু এবং আরক্ত। গাল ভাঙা এবং চোখের তলায় শ্যাওলার মতো কালচে ছোপ। ফিনফিনে কুঁচনো ধুতি সামনের দিকে লুটোচ্ছে, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির তলায় সোনার হার দেখা যায়। এক পলকেই বোঝা যায় লোকটা পয়লা নম্বরের লম্পট।

তার সঙ্গে সঙ্গে মানদা এবং পেনোও যাচ্ছিল। আর দু'ধারের ঘরগুলো থেকে টগর কুসুম জবা ময়নারা জ্বলজ্বলে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সমানে ডাকাডাকি করছিল, 'আমার ঘরে আসুন কুণ্ডুবাবু, আমার ঘরে—'

কেউ বলছিল, 'অনেক দিন পর এবার এলেন। আমার কাছে রাত না কাটালে গলায় দড়ি দেব মাইরি।' কেউ বলছিল, 'সেবার বলে গিয়েছিলেন, পরে যখন আসবেন আমার কাছে থাকবেন।' কেউ বলছিল, 'আপনার আশায় কতকাল ধরে দিন গুনছি গো কুণ্ডুমাশায়, আসুন আসুন—'

যাকে উদ্দেশ্য করে এসব বলা সে কিন্তু কারও কথাই শুনছিল না। মাথা নাড়তে নাড়তে আর প্রবল বেগে দু'দিকে দু'হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে সমানে বলে যাচ্ছে, 'তুমলোগকা নেহী চাহিয়ে। যত সব ভাগাড়ের কেন্নো। সে কোথায়?'

মেয়েগুলো মুখ বাঁকাল। ওরা বুঝতে পারছিল কুণ্ডুমশাই নামধারী ওই পয়সাওলা বদমাস লোকটা তাদের ঘরে রাত কাটাবে না। তাই তীব্র হতাশায় এবং রাগে চাপা গলায় ওরা গজ গজ করছিল, 'মড়াখেগো খচ্চর, শকুনে তোকে খুবলে খুবলে খাক।'

পেনো লোকটার গায়ে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে শুধলো, 'কার কথা

বলছেন কুণ্ডুমাশায়?'

কুণ্ডু জড়ানো গলায় গোঙানির মতো শব্দ করে বলল, 'সেই যে রে সেই ছুঁড়িটা, টিয়া যার নাম। গোঁফ গজাবার আগে থেকে প্রস কোয়ার্টারে যাওয়া-আসা করছি কিন্তু বেশ্যাপাড়ায় অমন জিনিস আর চোখে পড়েনি।'

পেনো গলার ভেতর অস্পষ্ট আওয়াজ করল।

কুণ্ডু আবার বলল, 'প্রথম যেদিন দেখলাম সেদিন থেকেই মাগীটা আমার চোখের তারা হয়ে গেছে রে—'

পেনো বলল, 'চোখের তারা এখন চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গেছে।'

কুণ্ডু খুব সম্ভব তার কথা শুনতে পায় নি। নিজের ঝোঁকেই সে বলে যেতে লাগল, 'এ পাড়ায়, এই শালা ভাগাড়ের মধ্যে ছুঁড়িটার থাকবার মানে হয় না। এবার একটা মতলব নিয়ে তোমাদের এখানে এসেছি মাসি—'

মাসি অর্থাৎ মানদা ছিল পেনোর ঠিক পেছনেই। গলা বাড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী মতলব?'

'টিয়াকে আমি এ জায়গা থেকে নিয়ে যাব।'

'কুথায়?'

কুণ্ডু বলল, 'ওই নদীর ওপারে—' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আবছা অন্ধকারে নদীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল, 'ওখানে আমার কাঠগোলা আছে, তার গায়ে দোতলা বাড়ি করিয়েছি একখানা। টিয়াকে নিয়ে সেখানে পতিষ্ঠে করব মাসি—'

লোকটার প্রচুর পয়সা। স্বনামে-বেনামে তার কয়েক শো বিঘে জমিজমা। তা ছাড়া দু-দুটো ব্রিক ফিল্ডও আছে। আর আছে সুদের কারবার।

মানদা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পেনো হঠাৎ বলে ফেলল, 'ও তাল ছাড়ুন কুণ্ডুমাশায়।'

কপাল কুঁচকে গেল কুণ্ডুর, ঢুলু ঢুলু আরক্ত চোখ অতি কষ্টে খুলে সে বলল, 'কী বলছিস, অ্যাই শালা পেনো?'

'বলছি টিয়াকে পাবেন না।'

'পাবো না!' কুণ্ডু অবাক।

'না—' পেনো সোজা কুণ্ডুর চোখের ভেতরে তাকাল।

'কেন?'

'টিয়া আগে থেকেই 'বুকড' হয়ে গেছে। ওকে আর পাওয়া যাবে না।'

পেনোর কথায় কুণ্ডুর রক্তে উত্তাপ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হল। দাঁত খিঁচিয়ে সে বলল, 'মাইরি আর কি, 'বুকড' হয়ে গেলেই হল!' একটা অকথ্য খিস্তি দিয়ে আবার বলল, 'এ কি অন্যের বিয়ে-করা ইস্তিরি যে পাওয়া যাবে না। পয়সা ছড়ালে বারো-

ভাতারি মাগীদের আবার পাব না! চল শালা, দেখি পাই কিনা—'

পেনো বলল, 'টিয়াকে বাদ দ্যান কুণ্ডুমাশাই। পাড়ায় অন্য মেয়ে আছে, যাকে ইচ্ছে পচন্দ করুন—'

'চোপ খচ্চরের বাচ্চা। আমি শালা এক বগ্‌গা একরোখা লোক, যাকে ভেবে এসেছি তাকেই চাই। নইলে রক্তারক্তি হয়ে যাবে।'

'কেন ঝুটঝামেলা করছেন মাইরি। কতবার বলছি, অন্য লোক টিয়াকে 'বুক' করেছে তবু কানে নিচ্ছেন না? শেষে একটা ঝঞ্ঝাট হবে। পয়সাওলা লোক আপনি, সবাই আপনাকে চেনে। শেষমেষ বেইজ্জৎ হয়ে যাবেন। তার চাইতে যা বলছি করুন। জবা আছে, টগর আছে, কুসুম আছে —সবাই ফেরেশ (ফ্রেশ) জিনিস দাদা, একেবারে ফুলকচি। গুড বয় হয়ে ওদের কারও ঘরে ঢুকে পড়ুন। ফুর্ত্তি করুন, ফাত্তা করুন, বেন্দাবনেব দোকান থেকে মাল-ফাল আনিয়ে আমাদেরও একটু-আধটু ভাগ দিন—'

পেনোর কথা শেষ হবার আগেই কুণ্ডু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'শাট আপ শালা, শুয়োবের বাচ্চা। আমি আর কাউকে চাই না, স্রেফ টিয়াকে চাই। পাঁচশ, হাজার, যা লাগে কুছ্ পরোয়া নেই। মালের ঘোরে ঠাওর করতে পারছি না। টিয়ার ঘর কোনটা রে, দেখিয়ে দে—' বলেই ঘুরে টলতে টলতে আবার এগুতে লাগল।

পেনো পেছন থেকে সমানে চেঁচামেচি করতে লাগল, 'অ্যাই কুণ্ডুমাশায়, আপনি দাদা একটা গড়বড় বাধিয়ে বসবেন। সাপের গত্তে কেন যে ন্যাজ ঢোকাতে শখ হচ্ছে!'

পেনোর প্রতিটি কথার ফাঁকে একবার করে ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল কুণ্ডু, 'চোপ শালা, চোপ। জন্ম কেটে গেল মাগীপাড়ায়, এই বয়েসে আমাকে সাপের গত্ত দেখাচ্ছে!'

দুবে, মেযেপাড়ার সদর দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুণ্ডুর ব্যাপারটা দেখছিল ফটিক। দেখছিল প্রায় পলকহীন। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি সে, এবার লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা কুণ্ডুর কাছে গিয়ে গলার কাছটা টিপে ধরল, 'ব্লাডি সোয়াইন, ব্যাস্টার্ডকি বাচ্চা—তোমার অনেক টাকা হয়েছে শালা—'

জাহাজের বয়লারে কয়লা-দেওয়া শক্ত হাত ফটিকের। কুণ্ডুর চোখ আর আলজিভ প্রায় বেরিয়ে আসছিল, তারই মধ্যে গোঙানির মতো শব্দ করে সে বলল, 'তুই কে রে গু-খেকোর ব্যাটা?'

'তোর বাপ। নিকালো, ইঁহাসে আভ্‌ভি নিকালো। নইলে আই উইল কিল ইউ—লাইফ বিলকুল খতম করে দেব।'

কুণ্ডুর গালের কষ বেয়ে গ্যাঁজলা বেরিয়ে আসছিল। পেনো, মানদা এবং অন্য

মেয়েরা টানাটানি করে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে কিছুটা সুস্থ হবার পর কুণ্ডু রুখে দাঁড়াল। ফটিকের দিকে তেড়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমার গায়ে হাত দিয়েছিস! আমি যদি এক বাপের ব্যাটা হই, হারামীর বাচ্চা তোকে দেখে নেব!' উত্তেজনায় রাগে তার শরীব বেঁকে যাচ্ছিল। কুণ্ডু অবশ্য ফটিকেব খুব কাছে যেতে পারছিল না, কেননা পেনো পেছন থেকে তার কোমরটা জাপ্টে ধরে রেখেছে।

ফটিক তাচ্ছিল্যেব সুরে বলল, 'যা-যা, দেখানেবালে! হোল ওয়ার্ল্ড ঘুরে এলাম, কেউ পারল না, এখন তুই দেখাবি! মারব এমন লাথ, হাড্ডি ঢিলে হয়ে যাবে।'

আরও কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করল কুণ্ডু। তারপর দম ফুরিয়ে হাত-পা ভেঙে ঘাড় গুঁজে পড়ে গেল। তক্ষুণি পেনো পাঁজাকোলে করে তুলে তাকে কুসুমের ঘরে দিয়ে এল।

পরের দিন সকালে মেয়েপাড়ার সবাই এবং ফটিক লক্ষ করল পেনো আঠা দিয়ে এক টুকরো কাগজ টিয়ার ঘরের দরজায় সেঁটে দিচ্ছে। তার ওপর আঁকাবাঁকা হরফে ভুল বানানে লেখা রয়েছে 'ইহা গেরস্ত ঘর, রশিকজনের এখানে প্রবেশ নিসেধ।'

মেয়েরা ঘাড় বাঁকিয়ে হাসল। বলল, 'পেনোটা খচ্চরের ধাড়ি।'

মানদা বলল, 'মুখপোড়ার মরণ!'

লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফটিকের দারুণ মজা লেগে গেল। খুব একচোট হেসে পেনোর দিকে পা ছুঁড়ল সে, 'গেরস্ত ঘর! ব্লাডি কুত্তা কাঁহিকা—'

কার্তিক মাস শেষ হয়ে এল। আজকাল বিকেল থেকেই হিম পড়তে শুরু করে। গাঢ় কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা হয়ে যায়।

হাওয়ায় এখন টান ধরেছে। উত্তুরে বাতাস ইদানীং আরো শুষ্ক এবং রসকষহীন। গাছের পাতা সজীবতা আর লাবণ্য হারিয়ে খসখসে হয়ে যাচ্ছে। হাতে-পায়ে এর মধ্যেই খড়ি পড়তে শুরু করেছে, ঠোঁট ফাটছে। শীত যে আসছে, চারপাশে তারই ভূমিকা।

কার্তিকের শেষাশেষি এবার ভাইফোঁটার তারিখ পড়েছে।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চান-টান সেরে বিছানায় বসে চা খাচ্ছিল ফটিক, মেঝেতে বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে টিয়া, (আজকাল টিয়ার জন্য একখানা করে বাংলা খরব-কাগজ রাখে ফটিক), এই সময় টগর এল।

কাগজটা একধারে নামিয়ে রেখে টিয়া বলল, 'এসো টগরদিদি, এসো। বসো—'

টগর টিয়ার পাশেই বসে পড়ল।

টিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ও কি, ও কি—খালি মেজেতেই বসে পড়লে যে! দাঁড়াও, তোমায় একখানা আসন পেতে দিই।'

টিয়া উঠতে যাচ্ছিল, তার কাঁধে একটা হাত রেখে ফের বসিয়ে দিতে দিতে টগর বলল, 'আসন দরকার নেই, তুই বোস তো—'

টিয়া বলল, 'তারপর টগরদিদি, পথ ভুল করে নাকি গো?'

'আহা, আমি বুজি তোর ঘরে আসি না—'

'কত আসো তা আমার জানা আছে। এ বছরে ক'দিন এসেছে হাত গুনে বলতে পারি।'

টগর হেসে ফেলল, 'কম আসি, তা আমি মেনে নিচ্ছি বাবা। হাত আর গুনতে হবে না।'

টিয়া বলল, 'ঠিক আছে গুনছি না। একটু বোসো, চা করি—'

'না-না, চা আর করতে হবে না।'

'তাই কখনো হয়! আমরা চা খাচ্ছি আর তুমি খালি মুখে বসে থাকবে! তা ছাড়া অ্যাদ্দিন পর এলে।'

টগর হাসতে লাগল, 'তোকে নিয়ে আর পারা যায় না ছুঁড়ি—'

তক্তাপোষের ওপর থেকে ফটিক বলল, 'সত্যিই ওকে নিয়ে পারা যায় না। ওর আদর-যত্নের ঠ্যালায় আমি গেছি।' বলল বটে, তবে ফটিকের চোখমুখ দেখে মনে হল, সুখের নদীতে ভাসছে।

টিয়া হাসতে হাসতে তক্তাপোষের তলা থেকে কেরোসিনের স্টোভ বার করে কেটলিতে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। তারপর টগরের কাছে ফিরে এসে বলল, 'এখন বল এই সক্কালবেলা হটাৎ কী মনে করে?'

টগর বলল, 'ভালোদাদার সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল—'

ফটিক বলল, 'কী কথা রে টগর?'

টগর বলল, 'কাল ক'তারিখ বলতে পার?'

মেয়েটা কী বলতে চায় ঠিক বুঝতে না পেরে ফটিক শুধলো, 'কেন, কালকের তারিখ দিয়ে কী হবে?'

'বলই না—'

মনে মনে হিসেব করে ফটিক বলল, 'আজ দশই নভেম্বর, তা হলে কাল এগারই—'

টগর জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু—উঁহু—'

'উঁহু কী?'

'ইংরিজি তারিখের কথা তোমায় কে শুদোচ্ছে? আমি বলছিলাম বাংলা তারিখের কথা—'

'এই সেরেছে! ওই ব্লাডি বাংলা তারিখ ফারিখের খবর আমি রাখি না।'

টগর হেসে হেসে বলল, 'দাদা আমার একেবারে সায়েব।'

টিয়া চোখের কোণ দিয়ে একপলক ফটিককে দেখে নিয়ে আস্তে করে বলল, 'শুধু গালাগাল দেবার বেলায়।'

টগর বলল, 'কাল হল বাংলা কার্ত্তিক মাসের পঁচিশ তারিখ। কাল কী পরব আছে বল তো?'

ফটিক জিজ্ঞেস করল, 'কী পরব?'

'ভাই ফোঁটা গো, ভাইফোঁটা—'

'তাই নাকি!'

'হুঁ। কাল তোমায় আমি ফোঁটা দেব।'

'নিশ্চয়ই দিবি।' ফটিক বলতে লাগল, 'আগেও তো আমাকে দিয়েছিস।'

এর আগে যে যেবার কার্তিক মাসে ফটিক এই রাজানগরে ছিল, টগর তাকে ভাইফোঁটা দিয়েছে। সে বলল, 'পত্যেক বছরই তো তোমার কপালে ফোঁটা দেবার ইচ্ছে ভালোদাদা কিন্তু সব বার তোমাকে পাই কোথায়?'

'কী করব বল, আমার জাহাজের চাকরি। কোন বছর কোথায় ভেসে বেড়াতে হবে তার কি কিছু ঠিক থাকে! তোর হাতে সব বছরই ফোঁটা নিতে ইচ্ছে করে রে—'

'এই যে কথাটা বললে, আমার হাতে ফোঁটা নিতে ইচ্ছে করে, এতেই আমার পেরাণটা জুড়িয়ে গেল ভালোদাদা যা পাপিষ্ঠ আমি, যে নরকে দিনরাত ডুবে আছি! তোমায় ফোঁটা দিতে পারলে বড় ভালো লাগে গো ভালোদাদা। মনে হয় শরীরটা পবিত্তির হয়ে গেল।' বলতে বলতে গলার স্বর ভারি হয়ে আসছিল টগরের।

তার কথাগুলো ফটিকের প্রাণের গভীরে কোনও একটা নরম জায়গা ছুঁয়ে গিয়েছিল। গাঢ় গলায় সে বলল, 'আমি একটা বাস্টার্ডের বাচ্চা, হোল লাইফ নরকের মধ্যেই পড়ে আছি রে। তোর ফোঁটা পেলে আমিও পবিত্তির হয়ে যাই। একেবারে হোলি ম্যান।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে চা হয়ে গিয়েছিল। একটা কলাই-করা গেলাসে চা ছেঁকে টগরকে দিল টিয়া। আলতো করে গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে টগর বলল, 'কাল আমার ঘরে টিয়া আর তুমি খাবে ভালোদাদা।'

টিয়া বলল, 'না—'

টগর ক্ষোভের গলায় বলল, 'না কেন।'

'কাল তুমি আমার এখানে খাবে। আর এখানেই তোমার ভালোদাদাকে ফোঁটা দেবে।'

ফটিক বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই ভাল। টিয়া ঠিকই বলেছে। কাল সকালবেলা এখানে চলে আসবি।'

টগরের ক্ষোভ যাচ্ছিল না। সে বলল, 'আমি গরিব বলে বুঝি আমার ওখানে খাবে না?'

ফটিক সস্নেহে বলল, 'দূর বোকা মেয়ে, অন্য অন্য বার তো তুই-ই খাওয়াস। ভাইফোঁটার দিনে একবার বুঝি আমার বোনটাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে না?'

আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম। শরীর বেচে ক'টা টাকাই বা রোজগার টগরের। তার থেকেই ভবিষ্যতের জন্য দু-চারটে পয়সা জমিয়ে রাখতে হয়। তাদের যা জীবন, একটু বয়েস হলে, গায়ের চামড়া কিঞ্চিৎ ঢিলে হলে কেউ ফিরেও তাকাবে না, তখন শরীরে যতই দোকান সাজাও, বিকিকিনি এক কানাকড়িও না। শেষ বয়সের জন্য টগর যা সঞ্চয় করে রেখেছে, ফটিক চায় না তা থেকে মেয়েটা ঝোঁকের মাথায় খরচ-টরচ করে ফেলুক।

টগর কি বলতে যাচ্ছিল, ফটিক আবার তাকে বলল, 'কাল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই এখানে চলে আসবি। সারাদিন আমাদের কাছে থাকবি।'

টিয়া বলল, 'এসো কিন্তু টগরদিদি। দু'জনে মিলে রাঁধাবাড়া করব।'

টগরের চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। সে বলল, 'আসব রে আসব। এমন আদর করে কেউ কোনোদিন আমারে কাছে ডাকে নি।' তারপর আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে টগর চলে গেল।

ফটিক এবার টিয়াকে বলল, 'ভাইফোঁটার জন্যে ভালো রান্নাবান্না যখন হচ্ছেই তখন পাড়ার অন্য মেয়েগুলোকেও খেতে বলি। আমরা খাব আর মেয়েগুলো মুখ শুকিয়ে থাকবে, এ আমার ভালো লাগবে না।'

টিয়া বলল, 'সে তো ঠিক কথাই।'

'তা হলে চ সবাইকে ইনভাইট করে আসি।'

ওরা শুধু পাড়ার মেয়েদেরই খেতে বলল না, ঘুরে ঘুরে পেনো বৃন্দাবন মন্মথ আর শশী কবিরাজকেও নেমন্তন্ন করে এল।

পরের দিন সকালবেলাতেই এ পাড়ার মেয়েরা এসে হাজির। মানদা-কুসুম-পাখি-জবা—সবাই আনাজ কেটে, বাটনা বেটে, মাছ কেটে, মাংস ধুয়ে টগর আর টিয়ার রান্নাবান্নায় সাহায্য করল।

ঠিক দুপুরবেলা পাঁজিতে সময় মিলিয়ে টগর ফটিককে ফোঁটা দিল।

'আমার ভাইকে দিলাম ফোঁটা,
যমের দোরে পড়ল কাঁটা।'

টিয়া এই সময় গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজাতে লাগল, অন্য মেয়েরা সরু ফিনফিনে জিভ নেড়ে ঘন ঘন উলু দিতে লাগল।

ফোঁটা দিয়ে টগর গলায় আঁচল জড়িয়ে ফটিককে প্রণাম করল। তারপর তার হাতে একখানা ধুতি আর সন্দেশের বাক্স দিল।

ফটিকও আগে ভাগেই চারখানা শাড়ি, নতুন ব্লাউজ, সায়া, জুতো, স্নো-পাউডার, আলতা কিনে রেখেছিল। টগরের হাতে সেগুলো তুলে দিল, সেই সঙ্গে নগদ পঁচিশটা টাকা।

তারপর খাওয়া-দাওয়া। খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকেলের দিকে টগর বলল, 'আজ আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না গো ভালোদাদা। থাকলেই তো সন্ধেবেলা ভাগাড়ের শকুনগুলো খুবলে খেতে আসবে। ভাইফোঁটার দিনে আমি নরক ঘাঁটতে পারব না। তুমি আমায় কোথাও নিয়ে চল না—'

'কোথায় যাবি?'

'যেখানে তোমার ইচ্ছে। শুধু একটা দিনের জন্যে এই নরককুণ্ডু থেকে আমায় বার করে নিয়ে যাও।'

'ঠিক আছে, চল ইভনিং শো-তে একটা সিনেমা দেখে আসি।'

সন্ধের আগে আগে টগর আর টিয়াকে নিয়ে রাজানগরের মেয়েপাড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ফটিক।

ভাইফোঁটার পর থেকে হাসি খুশি এবং আনন্দে দিনগুলো চমৎকার কেটে যাচ্ছে।

মোট কথা ফটিকের চল্লিশ বছরের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল এলোমেলো জীবনের কোথাও হয়তো আবছাভাবে একটা শান্ত মধুর স্নেহসিক্ত ঘরের লোভ ছিল। এবার রাজানগরে আসার পর টিয়া যেন সেই লোভটাকে মনের ভেতর থেকে বার করে উসকে দিচ্ছে। দুনিয়ার নানা বন্দরে ঘুরে ঘুরে কম করে হাজার খানেক মেয়ে কি আর সে ঘাঁটে নি? তাদের হল 'ফেল কড়ি মাখো তেল'-এর কারবার। আগে পয়সা, তারপর যত পার গায়ের গন্ধ শোঁকো।

কিন্তু টিয়া মেয়েটা একেবারে আলাদা ধাতের, ফটিকের সব খ্যাপামি আর মত্ততা সে দ্রুত জুড়িয়ে দিচ্ছে।

অনেকদিন পর এবার রাজানগরে এসে খুব ভালো লাগছে ফটিকের। সেই যে

প্রথম দিন বাস থেকে নামবার পর পেনো বলেছিল, 'টিয়া মেয়েটা দারুণ,' কথাটা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা সত্যি। এমন মেয়ে জীবনে কখনও দেখে নি ফটিক।

একদিন মাঝ-রাত্তিরে মেয়েপাড়ায় বেচাকেনা শেষ হলে চারদিক যখন নিঝুম হয়ে আসছে সেই সময় মানদার ঘরের দাওয়ায় বসে পেনো মাউথ অর্গ্যান বাজাচ্ছিল। মাঝে মাঝে খেয়াল হলে হিপ পকেট থেকে ওটা বার করে বাজায় সে।

অঘ্রান মাসের গোড়ায় এই মধ্য রাতে আকাশে রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠেছে। কুয়াশা আর হিমে চারদিক ঝাপসামতো। অল্প অল্প হাওয়াও দিচ্ছে নদীর দিক থেকে। নিস্তব্ধ হেমন্ত রাত্রির পটে পেনোর মাউথ অর্গ্যানের সুরটা যেন এই জঘন্য কুৎসিত মেয়েপাড়ায় স্বপ্ন নামিয়ে আনছিল।

আর সেই সময় টিয়ার ঘরের তক্তাপোষে পাশাপাশি শুয়ে টিয়া আর ফটিক কথা বলছিল।

ফটিক বলছে, 'এই রাজানগরে আমার জন্ম। কুড়ি বাইশ বছর বয়েস পর্যন্ত এখানেই থেকেছি। তারপর জাহাজে চাকরি নিয়ে কতবার এখানে এলাম, কতবার এখানে থেকে গেলাম তার ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু কোনও বারই জায়গাটাকে এত ভালো লাগে নি।'

টিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

বুকের ভেতর টিয়াকে ঘন করে জড়িয়ে ধরে ফটিক বলল, 'তোর জন্যে।'

'আহা—'

'আহা না রে, সত্যি।'

একটু চুপ। তারপর কী চিন্তা করে টিয়া বলল, 'কতদিন ভেবেছি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব, পারি নি।'

'কী কথা রে?' ফটিক টিয়ার মুখের দিকে তাকাল।

টিয়া বলল, 'তোমরা যে জলে জলে ঘোরো তাতে ভয় করে না?'

'কিসের ভয়?'

'জাহাজে ডুবেও তো যেতে পারে।'

ফটিক বলল, 'পারেই তো। মাঝে মাঝে যায়ও—' কোন কোন তারিখে কোন কোন লাইনের জাহাজ কোন সমুদ্রে, কোন উপসাগরে, কোন গালফ বা ক্রিকে ঝড়ের মুখে পড়ে কিংবা ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ডুবে গেছে গড় গড় করে তার লম্বা তালিকা দিয়ে গেল ফটিক।

আবছা উদ্বেগের গলায় টিয়া বলল, 'তা হলে বাপু তোমার আর জাহাজে গিয়ে

দরকার নেই। জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে কে যায়!'

ফটিক হাসল, কিছু বলল না।

টিয়া খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা বলব?'

'কী?'

'জলে না ভেসে এখানেই একটা কাজকর্ম জোগাড় করে নেওয়া যায় না?'

ফটিক হাসতে লাগল।

টিয়া শুধলো, 'হাসছ যে?'

টিয়ার গালদুটো আদর করে টিপে দিয়ে ফটিক বলল, 'তুই বড্ড ভীতু—'

টিয়া বলল, 'তা তুমি যাই বল, এবার আর তোমার জাহাজে যাওয়া চলবে না।'

ফটিক আবার হাসতে লাগল।

আগের দিন রাত্তিরে ফটিক হেসেছিল ঠিকই কিন্তু টিয়ার কথাটা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি। পরদিন দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে আর শুলো না, বেরিয়ে পড়ল।

এই রাজানগরে কল-কারখানা তো আর কম নেই। কাচকল, চটকল, কাগজকল, স্টিল রোলিং মিল, ফাউন্ড্রি—কলকাতা থেকে পনের-কুড়ি মাইল দূরে এই ছোট্ট শহরটা কারখানায় কারখানায় বোঝাই।

প্রথমে সে গেল একটা চটকলে। সেখানে বাইরে একটা বোর্ডে লেখা আছে ঃ নো ভ্যাকান্সি। অর্থাৎ এখানে চাকরি-বাকরির আশা নেই।

চটকল ছেড়ে ফটিক এবার গেল একটা রঙের কারখানায়। ফ্যাক্টরির সুপারভাইজার গোছের একটা লোককে ধরে ফটিক বলল, 'স্যার একটা খোঁজ দিতে পারেন?'

'কী?' ভুরু কুঁচকে গেল সুপারভাইজারের।

'এই কারখানায় চাকরি-টাকরি খালি আছে?'

'চাকরি!' লোকটা এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হয় শব্দটা জীবনে এই প্রথম শুনল।

অত্যন্ত বিনীতভাবে ফটিক বলল, 'হ্যাঁ, মানে আমার একটা কাজ দরকার—'

শরীরের গোপন অংশে আচমকা পোকা-টোকা কামড়ালে যেমন হয়, সুপারভাইজার প্রায় তেমনি লাফিয়ে উঠল। মুখটা ছুঁচলো করে বলল, 'না-না, চাকরি-বাকরি এখানে নেই।'

'কোথায় পাওয়া যেতে পারে জানেন—'

'রাস্তায় গাদা গাদা পড়ে আছে, টুক করে কুড়িয়ে নিলেই হল। যত্তো সব—'

যদিও সম্ভব নয়, তবুও ফটিকের ইচ্ছা করছিল, লোকটার ঘাড়ে দশ-বারোটা

লাথি কষিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ঘাড় গোঁজ করে সে বেরিয়ে এল।

পেইন্টের কারখানা থেকে বেরিয়ে একটা স্টিল রোলিং মিলে চলে এল ফটিক।

এখানে এসে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারল না, গেটের কাছেই দারোয়ান তাকে আটকালো। ফটিকেব পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে-সুস্থে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিধার যাতা?'

ফটিক বলল, 'অন্দর।'

'কিসকো মাংতা?'

'ম্যানেজার সাবকো।'

বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মতো উল্টো পাল্টা জেরা শুরু করে দিল দারোয়ানটা, 'ম্যানেজার সাবকা সাথ কিয়া কাম?'

বলবে কি বলবে না করেও শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল ফটিক, 'একটা নৌকরি চাই।'

প্রকাণ্ড গোঁফওলা ভোজপুরী দারোয়ান প্রায় আঁতকে উঠল, 'নৌকরি! আরে বাপ রে বাপ—'

'কী হল!'

'নৌকরি কাঁহা! এহী কারখানামে তো আগেলা মাহিনামে 'রিটেচমেন' (রিট্রেঞ্চমেন্ট) হোগি।'

'রিটেচমেন? সে আবার কী?'

'ছাঁটাই।'

এখানেও আশা ছেড়ে দিয়ে আরও দু-তিনটে কারখানায় ঘুরল ফটিক। কোথাও কর্মচারিদের মাথায় ছাঁটাইয়েব খাঁড়া ঝুলছে, কোথাও লক-আউটের নোটিশ লাগানো, কোথাও বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'নো ভ্যাকান্সি'।

সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে মেয়েপাড়ায় ফেরার পর টিয়া শুধলো, 'গোটা দিনটা কোথায় কাটিয়ে এলে গো?'

ফটিক উত্তর দিল না। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'এক কাপ চা কর তো টিয়া। ব্লাডি ড্যাম টায়ার্ড।'

টিয়া তক্ষুণি আর কিছু বলল না। তাড়াতাড়ি কেরোসিনের স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। খানিক পর চা ছেঁকে কাপে ঢেলে ফটিককে দিতে দিতে বলল, 'কই বললে না তো সারাদিন কোথায় ছিলে?'

চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে ফটিক বলল, 'গিয়েছিলাম এক জায়গায়।'

'কোন জায়গায়?'

'সে আছে।'

'আহা, জায়গার যেন নাম নেই?'

অল্প হেসে ফটিক বলল, 'রোম বার্লিন যাই নি রে বাবা, এই রাজানগরেই ছিলাম। ক'টা কারখানায় ঘুরে এলাম।'

টিয়া অবাক, 'কারখানায় আবার কী করতে গিয়েছিলে!'

'রগড় দেখতে।'

'আহা, রগড় দেখতে আবার কে কারখানায় যায়! বল না, কেন গিয়েছিলে?'

'তুই বল দেখি—' ফটিক মজা করতে লাগল।

টিয়া বলল, 'আমি কী করে বলব। আমি কি হাত গুনতে জানি?'

'পারলি না যখন, আমিই বলি—' চা শেষ করে ফটিক বলল, 'চাকরি খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

'চাকরি!' কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না টিয়া।

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। সেদিন বললি না এখানেই একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিতে।'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল টিয়া, আনন্দে আশায় তার চোখের তারা চকচক করছিল। তাড়াতাড়ি তক্তাপোষের কাছে চলে এল সে। গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'চাকরি হল?'

ফটিক বলল, 'ঘোরাঘুরিই সার। হল এই—' বলে দু হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে লাগল।

মুখটা মলিন হয়ে গেল টিয়ার, 'চাকরি পেলে না তা হলে?'

'আ রে বোকা মেয়ে, অমনি মন খারাপ হয়ে গেল!' হাত বাড়িয়ে টিয়াকে খুব কাছে টেনে নিয়ে এল ফটিক। বলল, 'এক দিনেই কি চাকরি হয় রে, যা বাজার! বার বার যেতে হবে। তারপর দেখি লাকে কী আছে।'

'একটু ভালো করে চেষ্টা করো, নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পেয়ে যাবে। এত কাজ জানো, এত দেশ দেখেছ, তোমার যদি চাকরি না হয়, আর কার হবে!'

টিয়াকে বুকের ভেতর আরও ঘন করে টেনে ফটিক বলল, 'আমারও সেই বিশ্বাস আছে রে—'

পরের দিন আবার কারখানায় কারখানায় ঘুরল ফটিক, তার পরের দিনও। এবং তারও পরের দিন। তারপর থেকে নিয়মিত। শুধু রাজানগরেই না, আশেপাশে যত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন আছে এবং যে-সব জায়গায় যত ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি আছে, সর্বত্র হানা দিল। কিন্তু কোথাও একশো দেড়শো টাকার একটা চাকরি জোটাতে পারল না।

এদিকে ছুটি ফুরিয়ে গেছে। তারপরও বারো-চোদ্দ দিন পার হতে চলল।

ফটিক এখানে এসেই দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছিল। এখন হাতে একটা পয়সাও নেই।

টিয়া যে এই মেয়েপাড়ায় থাকে তার জন্য মানদাকে রোজ ঘরভাড়া দিতে হয়। ফটিক আসার পর তার কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয় নি সে, ফটিক অবশ্য অনেক বারই দিতে চেয়েছে।

বাড়িউলি দু-তিন দিন ভাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল, 'কী ব্যাপার লা টিয়া, ভাড়া দিচ্ছিস না—'

টিয়া চুপ করে রইল।

বাড়িউলি আবার বলল, 'ভাড়ার কথাটা ভুলে গেছিস নাকি?'

কাচুমাচু মুখে টিয়া বলল, 'না না, ভুলব কেন? আজ পারছি না মাসি, শিগগিরই দিয়ে দেব।'

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করল বাড়িউলি মানদা, তারপর বলল, 'বুজিস তো, তোদের কাছি থেকে খুদকুঁড়ো নিয়ে তবেই আমার চলে।'

'তুমি ভেবো না, আমি ঠিক দিয়ে দেব।'

মানদা চলে গেল।

আরও দু'দিন পর ভাড়া-টাড়া না পেয়ে মানদা আবার তাগাদায় এল, 'কী হল রে মেয়ে, গরিবের ক'টা পয়সা দিয়ে দে—'

টিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, 'তোমার পয়সা মার যাবে না মাসি, ঠিক দিয়ে দেব। অ্যাদ্দিন আছি, কোনও দিন ভাড়া দিতে দেরি করেছি?'

'না তো—'

'পয়সা নিয়ে তোমার সঙ্গে গোলমাল হয়েচে?'

মানদা বলল, 'কক্ষনো না। আমিও তো তাই বলি, রোজকার পয়সা রোজ যে গুনে দেয়, ভাডার জন্যে যার সঙ্গে কোনওদিন খেচাখেচি করতে হয় না সে এইরকম টালবাহানা করছে কেন?'

টিয়া উত্তর দিল না।

মানদা কি ভেবে আবার বলল, 'তা হ্যাঁ রে ছুঁড়ি, একটা কথা তোকে শুদবো?'

টিয়া মুখ তুলল, 'কী?'

'ফটিক টাকা পয়সা দিচ্ছে তো?' মানদা সোজাসুজি টিয়ার চোখের ভেতর তাকাল।

টিয়া বিব্রতভাবে বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, দ্যায় বৈকি, নইলে সংসার চলছে কী করে?'

মানদা টিয়ার কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল না। চাপা নিচু গলায় গভীর পরামর্শ দেবার মতো করে বলল, 'একেবারে গা ছেড়ে দিস না টিয়া। ওরা আসে ফুর্ত্তি করতে,

মজা লুটতে। যত পারিস ফটকের কাছ থেকে দুয়ে নে। আখের বলে তো একটা কথা আছে।'

টিয়া কিছু বলল না, মানদার দিকে এক পলক তাকিয়েই দ্রুত মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

মানদা আরও কিছুক্ষণ জ্ঞানের কথা বলে সেদিন চলে গেল। কিন্তু দিনকয়েক পর আবার ভাড়ার তাগাদায় এল। তারপর থেকে রোজ। চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে তাগাদার সঙ্গে গালাগালও শুরু হল। টিয়া মুখ বুজে সহ্য করতে লাগল।

পঞ্চাশ বছরের জীবনে মানদা অনেক দেখেছে, জীবন সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। তাগাদা দিতে দিতে সে বুঝল, রোগটা অন্য জায়গায়। কিছুদিন পর টিয়াকে ছেড়ে আসল জায়গায় ঘা দিল। সোজা ফটিকের কাছে গিয়ে বলল, 'কুড়ি দিন টিয়া ভাড়া দিচ্ছে না, তুমি দাও—'

তার গলার স্বরে চমকে উঠল ফটিক। বলল, 'দিয়ে দেব মাসি, দিয়ে দেব—'

'দিয়ে দেব না, কবে দেবে সেই তারিখটা জানতে চাই।'

'আমার হাতে নেই, জোগাড় করে দিয়ে দেব।'

রূঢ় কর্কশ গলায় মানদা আবার যা বলল তা এই রকম ঃ পিরীতের পানসি ঢের চালানো হয়েছে, মাগ-ভাতারী খেলা যথেষ্ট হয়েছে, এখন দয়া করে মেয়েপাড়া ছেড়ে বিদেয় হও, টিয়াকে ব্যবসা পত্তর করতে দাও, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে অকথ্য খিস্তি, খেউড় এবং চিৎকার।

মানদার এই নতুন চেহারাটা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল ফটিক। সেই মানদা যাকে সে মাসি ডাকে, যার মুখ থেকে সুধা ছাড়া আর কিছু কোনওদিন ঝরে নি, সেই স্নেহপ্রবণ ভালোমানুষ মেয়েমানুষটি আর নেই। তার ভেতর থেকে রাজানগরের মেয়েপাড়ার জবরদস্ত খিস্তিবাজ এবং অত্যন্ত স্বার্থপর ঝগড়াটি বাড়িউলি বেরিয়ে এসেছে।

ফটিক বুঝতে পারছিল যতক্ষণ পয়সা ততক্ষণই খাতির। সে বলল, 'চিল্লিও না, সাতদিনের ভেতর তোমার সব পয়সা আমি মিটিয়ে দেব। যাও, এখন ভেগে পড়। ব্লাডি সোয়াইন—'

মানদা বলল, 'ঠিক আছে। সাতদিন ঠোঁটে ঠোঁট টিপে থাকব। তারপর যদি টাকা না পাই কেষ্টবুলি কাকে বলে দেখিয়ে ছাড়ব।'

কিন্তু সাতদিনের ভেতর যখন কোনও ব্যবস্থা হল না, মানদা চেঁচিয়ে খিস্তি করে মেয়েপাড়ার ভিত কাঁপিয়ে ছাড়ল। ফটিক একটা কথাও বলল না। একদৃষ্টে, পলকহীন তাকিয়ে থাকল শুধু। তারপর ঘরে ঢুকে তার সখের ট্রানজিস্টর আর রিস্টওয়াচটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সন্ধেবেলা রেডিও আর ঘড়িটড়ি বেচে ফিরে এসে ফটিক দেখল, টিয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে চুলে-কলপ-লাগানো, গিলে করা পাঞ্জাবি-ধুতি-পাম্প-শুতে সাজা মধ্যবয়সী এক বাবুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানদা। ঠিক দাঁড়িয়ে নেই, মানদা সমানে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'দোর খোল নচ্ছার মাগী, দোর খোল। সতীগিরি ফলানো হচ্ছে! আমার টাকা আদায় করবই—'

ফটিক কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে মাসি? দরজা ধাক্কাচ্ছ কেন?'

তার গলা পেয়েই দরজা খুলে বেরিয়ে এল টিয়া। সেই বাবুটিকে দেখিয়ে ব্যাকুলভাবে বলল, 'পয়সা আদায় করবার জন্য মাসি ওই লোকটাকে আমার ঘরে ঢোকাতে চাইছে।'

হঠাৎ কী হয়ে গেল ফটিকের, শরীরের সব রক্ত মাথায় গিয়ে চড়ল যেন, হিতাহিত জ্ঞান আর তার রইল না। ফুর্তি লুটতে আসা মাঝবয়সী বাবুটিকে উন্মাদের মতো মারতে মারতে নাক মুখ থেঁতলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে পাড়ার বাইরে বার করে দিয়ে এল।

এদিকে চিলের মতো তীক্ষ্ণ সরু গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আর ফটিকের বাপ-মা-চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে গলার শির ছিঁড়ে ফেলছিল মানদা, 'ওরে গু-খেকোর ব্যাটা, ওরে খচ্চর হাড়হাবাতে, এত বড় আস্পদ্দা তোর—আমার খদ্দেরের গায়ে হাত তুলিস, বেরো—এক্ষুণি বেরিয়ে যা—'

ফটিক গর্জে উঠল, 'চোপ মাগী, ব্লাডি ব্যাস্টার্ডকি বাচ্চা, আবার চেঁচালে গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলব। এই নে তোর টাকা—' পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে মানদার মুখে ছুঁড়ে মারল। তারপর টিয়াকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

ফটিক তখনই ঠিক করে ফেলল, জাহাজেই তাকে চলে যেতে হবে।

দিন চারেক পর।

সুটকেশ বিছানা-টিছানা গোছানো হয়ে গেছে। আজই ফটিক খিদিরপুর ডকে গিয়ে ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজে উঠবে।

সকাল থেকেই কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে টিয়া। ফটিকেরও খুব খারাপ লাগছিল। ভারি ধরা-ধরা গলায় কতবার যে বলেছে, 'অ্যাই মাইরি কাঁদিস না। তুই কাঁদলে আমার যাওয়াই হবে না।'

টিয়া উত্তর দেয় নি। তার কান্নাটা আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে শুধু।

ফটিক আবার বলেছে, 'এই যে যাচ্ছি, এই-ই লাস্ট। দেখিস ছ'মাসের ভেতর ফিরে আসব। তখন আর এই নরকে তোকে রাখব না।'

টিয়া ঝাপসা গলায় কিছু একটা বলল কিন্তু শোনা গেল না।

ফটিক বলতে লাগল, 'এবারও যেতাম না। কিন্তু কী করব বল? এত ঘুরলাম, কোথাও একটা চাকরি-টাকরি জুটল না, তা ছাড়া হাতেও ক্যাশ-ফ্যাশ নেই। টাকা-পয়সা থাকলেও না হয় কথা ছিল, জাহাজের চাকরিতে গোলি মেরে দিতাম।'

টিয়া বলল, 'একবার জাহাজে উঠলে কি আমার কথা মনে থাকবে?'

'থাকবে রে থাকবে। বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন, ফ্রেন্ডস—সবাইকেই ভুলতে পারি কিন্তু হোল লাইফে তোকে ভোলা সম্ভব না রে।' ফটিক বলতে লাগল 'এবার যে আসব, চাকরি-বাকরি না পেলেও আর যাচ্ছি না। দরকার হলে এই রাজানগরে একটা দোকান-ফোকান খুলে বসব। কিন্তু আর শালা জলে যাব না।'

হাতের পিঠে ঘন ঘন চোখের জল মুছতে মুছতে রান্নাবান্না করল টিয়া, জাহাজে ফটিকের খাবার জন্য লুচি-তরকারি করে দিল।

জাহাজ ছাড়বে সেই রাত্তিরে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রেডিও আর ঘড়ি বেচা টাকার যেটুকু বাকি ছিল তার সবটাই টিয়াকে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ। আমি জাহাজে উঠে মাসে মাসে তোকে টাকা পাঠাব। একটা কথা, সাবধানমতো থাকবি। কোনও কুত্তার বাচ্চাকে সন্ধেবেলা ঘরে ঢোকাবি না।'

'আচ্ছা—' আস্তে করে মাথা নাড়ল টিয়া।

গাঢ় গভীর গলায় ফটিক বলল, 'ছ মাস এখানে কাটিয়ে গেলাম। তোকে ছেড়ে যেতে ব্লাডি মনটা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে কী বলব!'

টিয়া ফোঁপাতে লাগল।

তাকে একটা চুমু খেয়ে ফটিক দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'পেনো—'

পেনো বাইরেই ছিল, ছুটে এল। বলল, 'কী গুরু?'

'সাইকেল রিকশা ডেকে এনেছিস?'

'ইয়েস বস। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

একটু ভেবে ফটিক এবার বলল, 'টিয়া রইল, তুই ওকে দেখিস পেনো।'

পেনো কাঁধ পর্যন্ত মাথা হেলিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই দেখব গুরু, আমি শালা লক্ষ্মণ যদ্দিন বেঁচে আছি বৌদির জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'এবার মালপত্তরগুলো নিয়ে সাইকেল-রিকশায় তোল—'

আগেই ফটিকের বিছানাপত্তর এবং সুটকেশ-টুটকেশ গুছিয়ে রেখেছিল টিয়া। ঝট করে সেগুলো কাঁধে তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল পেনো। তার পেছনে ফটিক আর টিয়াও বেরুল। উঠোন পেরিয়ে ওরা সদরের দিকে যেতে লাগল।

ফটিক চলে যাচ্ছে। খবরটা মেয়েপাড়ায় আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। দু'ধারের ঘরগুলো থেকে টগর-জবা-কুসুমরা বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে

লাগল। সবারই মন খুব খারাপ। এমন কি মানদাও বেরিয়ে এসেছে। ফটিকের ঘন হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'বাবা ফটিক, তোমাকে রাগের মাথায় অনেক খারাপ কথা বলিছি, আমার ওপর রাগ করে থেকো না।'

ফটিক বলল, 'না-না, রাগ আমি কারও ওপর পুষে রাখি না। তা ছাড়া তুমি আমার মায়ের মতো, আমিও তো ভাল কথা তোমায বলিনি, খিস্তিখেউড় করেছি। কাঁচা ড্রেনের মতো মুখ আমার।'

মানদা বলল, 'সে যাক গে, জাহাজে খুব সাবধানে থাকবে। ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে। শরীলটি যদি যায়, সবই গেল।'

ফটিক বলল, 'টিয়াকে তুমি দেখো মাসি, ওর যার্তে কষ্টটষ্ট না হয় নজর রেখো—'

'রাখব রে পাগলা, রাখব—'

সদরে এসে মেয়েরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফটিক আর পেনো বড় রাস্তায় যেখানে সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চলে গেল।

রিকশায় উঠে একবার মেয়েপাড়ার সদর দরজাটার দিকে তাকাল ফটিক। টিয়া দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

সেই যে ফটিক চলে গেল তার মাসখানেক বাদে টিয়ার নামে একশো টাকার মনি-অর্ডার এল। সেই সঙ্গে একখানা চিঠি। ফটিক লিখেছে তারা এখন জাপানে আছে। ওখান থেকে মালপত্র তুলে সিঙ্গাপুর আসবে, সিঙ্গাপুর থেকে এডেন হয়ে সোজা ইউরোপে। ইউরোপ থেকে আমেরিকার চার পাঁচটা পোর্ট ঘুরে দেশে ফিরতে ফিরতে আরও মাস সাতেক লেগে যাবে।

ফটিক আরও লিখেছে, টিয়া যেন তার জন্য না ভাবে, সে খুব ভালো আছে। শুধু দিনরাত টিয়ার কথাই মনে পড়ে। বিশেষ করে রাত্তিরে। সেই সময়টা এত একা-একা লাগে যে লিখে বোঝানো যায় না। মনটা তখন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।

ফটিক জানিয়েছে, আগে আগে কোনও পোর্টে জাহাজ ভিড়লে সে প্রথমেই গিয়ে হাজির হত মেয়েপাড়ায়। যতদিন পোর্টে জাহাজ থাকত ততদিন রোজ একবার করে বেশ্যাপাড়ায় তার হানা দেওয়া চাই-ই। নইলে পেটের ভাত হজম হত না। কিন্তু এবার আর সে সব মেয়েদের ঘাঁটতে ভাল লাগে না। টিয়াকে দেখবার পর ব্লাডি তার মনটাই গেছে বদলে। রাজানগরে এবারে ক'টা মাস যে আনন্দ যে সুখ সে পেয়ে এসেছে, পোর্টে পোর্টে কটা চেহারার 'ফেল কড়ি মাখো তেল'-মার্কা ঢলানি ছুঁড়িদের সাধ্য কি তা দেয়। আজকাল ওসব ছুকরিদের দেখলে থুতু ফেলতে ইচ্ছে করে। পোর্টের মেয়েদের ছাড়লেও মদটা এখনও ছাড়তে পারে নি, ওটা ছাড়া

যাবেও না। পেটে খানিকটা উগ্র জ্বলন্ত তরল পদার্থ না থাকলে দেড়শো ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে জাহাজের বয়লারে কয়লা দেওয়া যায় না।

তা ছাড়া দুনিয়ার নোনা দরিয়ায় দরিয়ায় ঘুরতে হলে নিয়মিত মদটি দরকার। নইলে হাড়ে জং ধরে যাবে।

মানদা, টগর, পেনো, কুসুম ইত্যাদি কে কেমন আছে জানতে চেয়েছে ফটিক। অবশ্য তাকে জানাবার যে উপায় নেই, সে-কথাও লিখেছে। কেননা কখন তারা কোথায় থাকবে—পোর্ট কিংবা সমুদ্রে, তা বলা মুশকিল। কাজেই টিয়া চিঠি লিখলেও সে পাবে না।

চিঠির শেষের দিকে সে লিখেছে, টিয়া যেন সাবধানমতো থাকে। কোনও বাগার সোয়াইনকে ঘরে না ঢোকায়।

মাত্র তো ক'টা মাস, তার পরেই ফটিক ফিরে আসছে। এবার যে আসবে আর সমুদ্রে যাবে না। জাহজের চাকরি সে ছেড়ে দেবে। টিয়া যেন তার প্রাণভরা ভালোবাসা নেয়, ইত্যাদি।

চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার যে টিয়া পড়ল, ঠিক-ঠিকানা নেই। তার কি ভালো যে লাগছে, কি ভালো যে লাগছে!

টাকা আর চিঠি আসার খবর পেয়ে এ-পাড়ার অন্য মেয়েরা একজন দু'জন করে টিয়ার ঘরে আসতে লাগল। এমন কি মানদাও এল।

মানদা শুধলো, 'ফটিক কত টাকা পাঠিয়েছে লা টিয়া?'

টিয়া বলল, 'এক শো।'

'ভালো, ভালো। ছোঁড়ার হাতটা খোলা, মনটাও খারাপ না। তা ছাড়া তোকে ভালোও বেসে ফেলেছে।'

টিয়া উত্তর দিল না।

মানদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিও নাকি পাটিয়েছে ফটিক?'

টিয়া আস্তে করে মাথা নাড়ল।

'কী লিখেছে?'

ফটিক যা-যা লিখেছে, সংক্ষেপে বলে গেল টিয়া।

সব শুনে মানদা বলল, 'ফটকে তা হলে আমাদের ভুলে যায় নি!'

'মা-মাসিকে কেউ ভোলে নাকি?' টিয়া হাসল।

মানদাও হাসল, 'তা যা বলেছিস।'

টগর বলল, 'সাত-আট মাস পর ভালোদাদা আসছে, আর সমুদ্দুরে যাবে না। আমার কি ভালো যে লাগছে!'

জবা টিয়াকে বলল, 'কপাল একটা করে এসেছিলি টিয়া। আমাদের যা ভাগ্যি,

ওরকম একটা মানুষ জুটলে বেঁচে যেতাম।'

ময়না বলল, 'যা বলেছিস! আমাদের কপালে যত মড়াখেগো ভাগাড়ের শকুন এসে জোটে।'

একেকটি মেয়ে একেক রকম মন্তব্য করতে লাগল। শুধু কুসুমই ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে থাকল। হিংসের তার খসখসে ভাঙাচোরা কালো মুখটা পুড়ে যেতে লাগল।

দুপুরবেলা মেয়েগুলো এসেছিল। গল্পে গল্পে বিকেল কাবার করে সন্ধের মুখে মুখে তারা উঠল।

সেই যে মানি-অর্ডারে টাকা এল, তারপর থেকে নিয়মিত ফি মাসে আসতে লাগল। প্রতিমাসেই গোড়ার দিকে টাকাটা আসে, সেই সঙ্গে আসে একখানা করে চিঠি।

ফটিকের চিঠির বয়ানগুলো সব চিঠিতেই প্রায় একরকম। জাহাজে জাহাজে আর ভালো লাগছে না, টিয়ার জন্য মন খুব খারাপ হয়ে আছে, যত তাড়াতাড়ি পারে সে দেশে ফিরে আসবে।

ফটিকের কাছ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে বাংলাদেশের এই কারখানা-শহরের মেয়েপাড়ায় বসে আশায় আর আনন্দে বুক কাঁপতে থাকে টিয়ার। মুখের ওপর দিয়ে থির থির করে সুখের ঢেউ বয়ে যায়।

ফটিকের পাঠানো টাকা আর চিঠি নিয়ে কী যে সে করবে ভেবে পায় না। একবার সেগুলো গালে ঘষে, একবার কপালে ঠেকায়, একবার ঠোঁটে।

চিঠি আর টাকা এলেই এ-পাড়ার মেয়েরা ছুটে আসে। ফটিক এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, কবে দেশে ফিরবে, ফিরেই তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে কি না, কোথায় তারা ঘর-সংসার পাতবে, ইত্যাদি হাজার রকম খোঁজখবর নেয়। তার সৌভাগ্যে বেশির ভাগ মেয়েরই মুখ মলিন হয়ে যায়। শুধু টগরই যা খুশি হয়। সে বলে, 'তোর জন্যে আমার ভাইটার মতিগতি ফিরেছে, ঘর-সংসারী হতে চাইছে। কী তুকই যে করেছিস!'

টিয়া উত্তর দেয় না, খালি হাসে।

হেমন্তের শেষাশেষি ফটিক জাহাজে উঠেছিল। দেখতে দেখতে চারটে মাস কেটে গেল। পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র পার হয়ে এখন বৈশাখ মাস পড়ে গেছে। সূর্যটা আকাশের গায়ে সারাদিন গন গন করতে থাকে। গাছপালা পুড়ে পুড়ে ধূসর বর্ণ হয়ে যাচ্ছে। উঁচু রাস্তার ওধারে নদীটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। সকাল-বিকেল তবু কিছু পাখি চোখে পড়ে, কিন্তু দুপুরবেলা আকাশ একেবারে ফাঁকা। রাস্তাঘাটও

সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে যায়। তখন রাস্তায় না লোকজন, না সাইকেল রিকশা-টিকশা। সব কোথায় যে উধাও হয়ে যায়! রাতের দিকটাও খুব আরামের না। তখন নদীর ওধার থেকে অল্প অল্প হাওয়া ছাড়ে ঠিকই কিন্তু সারাদিনের উত্তপ্ত মাটি থেকে গরম ভাপ উঠে আসতে থাকে।

ঋতুচক্রে যতই পরিবর্তন আসুক, গ্রীষ্মের আগুনে মাঠ-ঘাট বৃক্ষ-লতা জ্বলে জ্বলে যতই খাক হোক, মানুষের প্রবৃত্তি কিন্তু বদলায় না। সন্ধের আলো জ্বলতে না জ্বলতেই মেয়েপাড়ায় আসর জমে উঠতে শুরু করে। মাতাল আর লম্পটরা কেন্নোর মতো বুকে হেঁটে হেঁটে ঠিক এখানে এসে হাজির হয়। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-হেমন্ত এই একটা নিয়মের শুধু পরিবর্তন নেই।

পেনো সেই যে কাগজে 'গেরস্ত ঘর' কথাটা লিখে টিয়ার ঘরের দরজায় সেঁটে দিয়েছিল সেটা এখনও আছে। যারা মেয়েপাড়ায় ফুর্তি লুটতে আসে তারা এতদিনে জেনে গেছে ওই ঘরটায় প্রবেশ নিষেধ। পেনোর গণ্ডি কেটে-দেওয়া নিষিদ্ধ এলাকাটা তারা মাতাল অবস্থাতেও খুব সতর্কভাবে এড়িয়ে চলে।

পৌষ থেকে চৈত্র, পর পর চার মাস ফটিকের মানি অর্ডার এল। কিন্তু বৈশাখ পডবার পর দশ বারো দিন কাটল কিন্তু এখনও টাকা আসার নাম নেই।

দেখতে দেখতে বৈশাখ মাস কেটে গেল। তারপর জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে আষাঢ়ও যায় যায়। কিন্তু না আসে ফটিকের মানি অর্ডার, না একটা চিঠি। এ ক'টা মাস টিয়ার কী কষ্টে যে কাটছে সে-ই শুধু জানে।

দু-তিন মাস যে টাকাপয়সা চিঠিপত্র আসছে না, এ-খবরটা মেয়েপাড়ায় জানাজানি হয়ে গেছে।

সেই বৈশাখ মাস থেকে টগর কুসুমরা প্রায় রোজই টিয়ার ঘরে হানা দিচ্ছে। আর জিজ্ঞেস, করছে, 'হ্যাঁ লো টিয়া, কিছু খবর-টবর এল?'

মুখ নিচু করে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে টিয়া, 'না।'

টগর বলে, 'দ্যাখ আর ক'দিন—'

মানদা বলে, 'দ্যাখ দ্যাখ করে তো তিন মাস কেটে গেল।'

জবা বলে, 'কত দূর দেশে গেছে ফটকেদা, সেখান থেকে টাকা পাটাতেও তো সময় লাগে।'

কুসুম যে এত হিংসুক, টিয়ার জন্য সহানুভূতিতে তার মনও সিক্ত হয়। ভরসা দেবার মতো করে বলে, 'ভাবিস না, শিগগিরই চিঠি এসে যাবে।'

ফটিকের কী হল, তার একটা খবর-টবর যে নেবে তারও কোনও উপায় নেই। এত বড় পৃথিবীর কোন সমুদ্রে সে ভাসছে, কে জানে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা

অসম্ভব। দুর্ভাবনায় অস্থিরতায় দিন কাটতে থাকে টিয়ার।

দু-তিন মাস পেরুবার পর মানদা কিন্তু মুখ বুজে থাকলো না, ভাড়ার জন্য তাগাদা দিতে শুরু করল। মানি অর্ডার আসা বন্ধ হবার পর সে আর ভাড়া-টাড়া দিতে পারেনি।

টিয়া কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'আর ক'টা দিন ধৈর্য ধর মাসি। ও টাকা পাটালেই তোমাকে দিয়ে দেব।'

'ফটকে আর টাকা পাটাবে না।'

'এ তুমি কী বলছ মাসি! অত দূর দেশে গেছে, হয়তো কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে।'

'আমার কি মনে হয় জানিস?'

'কী?'

মানদা বলল, 'মুখপোড়া তোকে হয়তো ভুলেই গেছে টিয়া—'

টিয়া চমকে উঠল, কিছু বলল না। চোখদুটো তার করুণ, ভারাক্রান্ত হয়ে থাকল।

মানদা আবার বলল, 'ছোঁড়াকে তো জানি। জাহাজে জাহাজে হাজার জায়গায় ঘুরে ডবকা ডবকা মেমসাহেব পাচ্ছে, তোর কথা কি এখন আর তার মনে আছে!'

টিয়া ব্যাকুলভাবে বলল, 'না গো মাসি, সে সে-রকম মানুষ না।

'তুই আর ক'দিন ওকে দেখেছিস, ফটকেকে ওর সেই জোয়ান বয়েস থেকে চিনি। জাহাজে যাবার পর ও যে চার মাস টাকা পাঠিয়েছে এ-ই ঢের। আর ও টাকা পাটাবে না। তোর পেছনে টাকা লাগিয়ে ফটকের কী লাভ বল—'

টিয়া উত্তর দিল না।

মানদা বলতে লাগল, 'বয়েস তো কম হল না, এই মেয়েপাড়ায় দেখলামও অনেক। ফটকের মতো চুলকুনি অনেকেরই ওটে। ভালোবাসার কথা বলে, ঘর-সংসারের কথা বলে, তারপর চোখের আড়ালে গেলেই ভুলে যায়। এই সব ছোঁড়া-ছোকরাদের স্বভাব বড্ড খারাপ।'

টিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এখন আমি কী করব মাসি?'

মানদা বলল, 'আমার কথা যদি শুনিস তা হলে বলব, আখের নষ্ট করিস না। তোকে রাখার জন্যে কত বড় বড় পয়সাওলা লোক চারপাশে ছোঁক ছোঁক করছে। তুই একবার মুখ ফুটে হ্যাঁ বল না, রানীর হালে থাকতে পারবি।'

টিয়া ঝাপসা গলায় কিছু একটা বলল, বোঝো গেল না।

মানদা কী ভেবে এবার বলল, 'ঠিক আছে, তোকে এক্ষুণি কিছু করতে বলছি না। ছোঁড়াটার ওপর যখন মন পড়ে গেছে, দ্যাখ আর ক'দিন—'

আরও একটা মাস কাটল। কিন্তু এখনও ফটিকের কোনও খবর নেই।

এই একটা মাস পর মানদা এসে একদিন দুপুরবেলা টিয়ার ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসল। বলল, 'ফটকের আশা তুই ছাড় টিয়া। ও আর তোর খবরও নেবে না, টাকাও পাঠাবে না।'

মুখ নিচু করে মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগল টিয়া।

মানদা বলতে লাগল, 'আয়নায় নিজের চেহারাটা আজকাল দেখিস? পয়সার অভাবে আধ পেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেছিস। এভাবে চললে ক'দিন আর বাঁচবি? আমি কী বলি শোন—'

টিয়া চোখ তুলে তাকাল।

মানদা বলল, 'ছোঁড়াকে তুই ভুলে যা। কুণ্ডুমাশায়কে তোর মনে আছে?'

টিয়া শুধলো, 'কে সুরথ কুণ্ডু?'

'ওই যে রে যার কাঠগোলা টোলা আচে। তোর জন্যে ফটিক যাকে খুব ঠেঙিয়েছিল—'

টিয়া বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'সে আমার কাছে লোক পাটাচ্ছে, এই তো পরশু দিনও পাটিয়েছিল—

'কেন?'

'কুণ্ডু তোকে রাখতে চায়। নদীর ওপারে দোতলা একখানা বাড়ি তোকে লিখে দেবে সে, তাছাড়া চাকর বাকর, রান্নার লোক দেবে, মাসে মাসে হাত খরচা পাবি তিনশো টাকা করে। ভেবে দ্যাখ—'

চিন্তা করার শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল টিয়ার। সে বলল, 'আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না মাসি।'

মানদা বলল, 'ভেবে আর দরকাব নেই। তোর ভাবনা চিন্তাগুলো এখন আমার ওপর ছেড়ে দে। আমি বলি কি কুণ্ডুবাবুর কাছে তুই চলে যা, দুধে ভাতে থাকবি।'

'তুমি যা ভালো বোঝো তাই কর।'

দিন কয়েক পর এক দুপুরে কুণ্ডুর দু'জন লোক এল টিয়াকে নদীর ওপারে নিয়ে যেতে। একটা বড় বাহারে নৌকো নিয়ে এসেছে তারা। নদী পেরুলেই কুণ্ডুর কাঠগোলা, তার গা ঘেঁষে নতুন একখানা দোতলা বাড়িতে টিয়ার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এখন সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে। নদীর পার, ওধারের দোকানপাট, সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড—চারদিক ঝিম মেরে রয়েছে।

এই গরমের দুপুরটায় মেয়েপাড়ায় কিন্তু ঢিলেঢালা ঝিম-মারা ভাব নেই। টগর-কুসুম-জবা-মানদা থেকে শুরু করে পেনো পর্যন্ত সবাই টিয়ার ঘরের দরজায় হুমড়ি

খেয়ে আছে। ঘরের ভেতর টিয়া তার মালপত্র বেঁধে ছেঁদে আয়নার সামনে সাজতে বসেছিল। চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধা আগেই হয়ে গেছে, কমলা রঙের মাদ্রাজি সিল্কের শাড়িও সে পরে নিয়েছে। এখন চোখে লম্বা করে কাজলের টান দিচ্ছে। সাজছিল ঠিকই, কিন্তু টিয়ার মুখ ভাবলেশশূন্য— দেখে মনে হয়, মরা মানুষের মুখ।

টিয়াকে যারা নিতে এসেছে, কুণ্ডুমাশায়ের সেই লোকদুটো মেয়েপাড়ার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাক এলেই মালপত্র সমেত টিয়াকে নিয়ে নৌকোয় তুলবে। টিয়ার ঘরের বারান্দায় মেয়েপাড়ার মেয়েগুলো চাপা গলায় ফিস ফিস করছিল।

টগর বলছিল, 'এর নাম আবার সুখ! খাবে পরবে অবিশ্যি ভালো। কিন্তু কী আশা করেছিল মেয়েটা, ভালোদাদার সঙ্গে ঘর বাঁধবে, সংসারী হবে। কী চেয়েছিল আর কী হল! আমার বড় কষ্ট হচ্ছে টিয়াটার জন্যে।'

মানদা বলল, 'যা চেয়েছিল তা যখন পেল না তখন এ-ই ভালো।'

পেনো বলল, 'গুরুর যে শ্লা কী হল! ভেবেছিলাম ফটকেদা ঘর সংসার করলে মেয়েপাড়া ছেড়ে তার কাছে গিয়ে উঠব। পেটের জন্যে একটা বিজনেস-ফিজনেস লাগিয়ে দেব। তা শ্লা কিছু হল না—'

ঠিক এই সময় সদর দরজার দিক থেকে ডাক-পিওনের গলা ভেসে এল, 'টিয়ারানী দাসী আছে? টিয়ারানী দাসী—'

টিয়া শুনতে পেয়েছিল, সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদিকে ডাকতে ডাকতে পিওনটা টিয়ার ঘরের কাছে চলে এসেছে।

টিয়া সাগ্রহে বলল, 'আমি টিয়ারানী দাসী। চিঠি এসেছে?'

পিওন মাথা নাড়ল, 'না। টাকা এসেছে, অনেক টাকা—'

'কে পাঠিয়েছে?'

'একটা জাহাজ কোম্পানির অফিস থেকে এসেছে।'

'কত টাকা?'

'পঁচিশ হাজার।'

'পঁচিশ হাজার!' ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল টিয়া, 'কিন্তু এত টাকা—'

ইনসিওর-করা একটা লম্বা খাম টিয়ার হাতে দিয়ে চিরকুটে সই করে দিতে বলল পিওনটা। কাঁপা হাতে সই বসিয়ে খামটা খুলতেই গোছা গোছা নোট বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গে ইংরেজিতে টাইপ করা জাহাজি কোম্পানির একটা চিঠি।

টিয়া বলল, 'আমি তো ইংরেজি পড়তে পারি না, চিঠিতে কী লেখা আছে?'

পিওনটা লেখা পড়া জানা ছেলে। সে চিঠি পড়ে মানে বুঝিয়ে দিল, এই টাকাগুলো ফটিকের। এবার ফটিক যে জাহাজে গিয়েছিল সেটা ভূমধ্য সাগরের কাছে মাস চারেক আগে ডুবি হয়ে যায়। জাহাজ ডুবিতে তিরিশ জন ক্রুর সঙ্গে ফটিক

নিখোঁজ হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও জাহাজ কোম্পানি তার সন্ধান পায় নি। কাজেই অনুমান করা হচ্ছে ফটিক আর জীবিত নেই।

জাহাজে উঠবার আগে এবার ফটিক তার প্রভিডেণ্ট ফান্ড আর গ্রাচুইটির সব টাকা টিয়ার নাম লিখে দিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তার যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, সব টাকা পাবে টিয়া।

ফটিকের ইচ্ছা এবং ব্যবস্থা অনুযায়ী তার প্রাপ্য সমস্ত টাকা কোম্পানি টিয়ারানী দাসীর নামে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

টাকা আর চিঠি বুকে চেপে ধরে নিজের ঘরে ছুটে এল টিয়া। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে সারা দুপুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ধীরে ধীরে তার ঘরের দরজা থেকে ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল।

গোটা দুপুরটা কেঁদে বিকেল বেলা উঠে পেনোকে ডাকল টিয়া। বলল, 'একটা রিকশা ডেকে নিয়ে আয় তো—'

পেনো জিজ্ঞেস করল, 'রিকশা দিয়ে কী হবে?'

'ডেকেই আন না—'

পেনো রিকশা ডেকে আনলে একটা টিনের বাক্স হাতে ঝুলিয়ে টিয়া বেরিয়ে পড়ল।

মেয়েপাড়ার অন্য মেয়েরা এ-বারান্দায় সে-বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। মানদা হামানদিস্তায় পান ছেঁচতে ছেঁচতে কুণ্ডুমাশায়ের সেই লোকদুটোর সঙ্গে কী কথা বলছিল। টিয়াকে দেখে মানদা চমকে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছিস টিয়া?'

টিয়া আবছা গলায় বলল, 'চলে যাচ্ছি, আর আসব না?'

'কিন্তু কুণ্ডুমাশা যে লোক পাটিয়েছে, তাদের কী হবে?'

'তাদের ফিরে যেতে বল—' বলতে বলতে এগিয়ে যেতে লাগল টিয়া।

মানদা হামানদিস্তা ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'কোথায় যাবি?'

'দেখি কোথায় যাই—' চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টিয়া। অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'সে বলেছিল ফিরে এসে আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবে। নিজে সে এল না, কিন্তু নিজের প্রাণটা দিয়ে আমার বাঁচবার পথ করে দিয়ে গেছে। এমন করে আমার কথা আর কেউ কোনওদিন ভাবেনি গো, কেউ ভাবে নি।' বলে আবার চলতে শুরু করল।

এধার-ওধার থেকে কুসুম পদ্ম টগর মানদা, সবাই দেখল রাজানগরের মেয়েপাড়া ছেড়ে **চলে যাচ্ছে টিয়া।**